নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির স্বরূপ

বেগম শারমিনুর নাহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির স্বরূপ

এম ফিল

অভিসন্দর্ভ

বেগম শারমিনুর নাহার

জানুয়ারি

২০১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বেগম শারমিনুর নাহার-কর্তৃক উপস্থাপিত ***নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির স্বরূপ*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ডক্টর মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির স্বরূপ শীর্ষক এম ফিল গবেষণা এবং অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্যে আমি ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে নিবন্ধনভুক্ত হই। প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ করে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে আমি গবেষণাকর্ম শুরু করি। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানান সংকটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে অভিসন্দর্ভ-রচনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এরপর আমি ছয় মাস সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে কতৃপক্ষ তা মঞ্জুর করেন।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার শিক্ষক, অধ্যাপক ডক্টর মোঃ সিরাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। তাঁর অকৃত্রিম প্রেরণা, তাগিদ এবং দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব সময় সাহস যুগিয়েছে। অভিসন্দর্ভটির বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন। তাঁর আন্তরিক তাগিদ, অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশনা আমার পাঠ-পরিধিকে সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাহচর্য আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি।

অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন আমার মা। তার নিবিড় সান্নিধ্য, প্রেরণা আমার চলার পাথেয়। অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ। দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন-এর সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভাগীয় প্রধান কবি মজিদ মাহমুদ-এর নানা পরামর্শ, আলোচনা আমার কাজকে সহায়তা করেছে। সহপাঠী ও বন্ধু মোমিনুর রসুল, মুনিরা সুলতানা, বিদ্যুৎ সরকার–এই তিনজনের নিকট থেকে যে সহমর্মিতা পেয়েছি তা দুর্লভ। গ্রন্থ প্রদানের মাধ্যমে আমার কর্মকে সহজ করে দিয়েছেন কবি হানিফ রাশেদীন, রাহেল রাজিব, জাভেদ হুসেন ও মনোজ দে। এছাড়া আমার ছোট ভাই ও বড় বোন গবেষণা কর্মটি শেষ করার তাগিদ দিয়ে সব সময় আমাকে উৎসাহিত করেছে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে আমাকে একান্ত সহযোগিতা করেছে অন্তরঙ্গতম মোঃ রোকন-উজ-জামান। তাঁর অনুপ্রেরণা, ধৈর্য্য, ত্যাগ আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সমাজতান্ত্রিক আর্কাইভ, বাংলা বিভাগের সেমিনার কক্ষ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকতা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বিশ শতকের মধ্যপর্যায়ের বাংলা উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) সৃষ্টিশীল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর জীবনসৃষ্টির সম্ভাবনাকে অলঙ্করণ করেছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবানই নন, সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটে। রূপে ও রসে, ভাবনায় ও বেদনায় বিচিত্র তাঁর শিল্পলোক। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটনভূমিতে তাঁর বিকাশ। সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে সেসময় ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজি-মুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা; সারা বাংলায় নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে বসে মুনাফাশিকারি মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধিলগ্নে যেন নরক গুলজার। অশিব-অসুন্দরের বিরুদ্ধে জনমানসে উদ্দীপ্ত এই ক্রোধই এ যুগের মুখ্য স্থায়ীভাব। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস এরই বাস্তব চিত্রায়ণ।

'যুগান্তর' পার্টির সঙ্গে যুক্ত ও সদস্য না হয়েও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আদর্শিক ঐক্যে আবদ্ধ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *মন্দ্রমুখর*, *মহানন্দা*, *শিলালিপি*, *সূর্যসারথি*, *তিমির তীর্থ*, *উপনিবেশ* ও *নির্জন শিখর* উপন্যাসগুলোতে রাজনৈতিক বিশ্বাস-সংশয় ও জিজ্ঞাসার নানামাত্রা ও স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর উপন্যাসে বুদ্ধিজীবীদের জীবনালেখ্য সন্ধানের প্রয়াস বিবেচনায় কয়েকটি সূত্র গুরুত্ববহ। যেমন : উপনিবেশিকতা যে আমাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে কী ব্যাপক প্রভাব শিকড়ায়িত করেছে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন সাতচল্লিশ-উত্তর বুদ্ধিজীবীরা তেমন গভীরভাবে অনুধাবন করেননি। তাছাড়া ওইসব বুদ্ধিজীবী তাঁদের মননচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বীকৃতির জন্য শাসককুলীয় ভাবাদর্শে বদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন 'Intellectual Satellites of the Metropolitan intellectual world.' সাতচল্লিশ পর্বেও তাঁরা এ ব্যর্থতারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। 'এ কারণেই establishment-এর বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরও মননের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে বসলেন। নাগরিক আত্মকেন্দ্রিকতা, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা শিথিল বিরোধপূর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার ফলে তাঁরা তাঁদের কাজে-কর্মে বাস্তবতায় পরিচয় দিতে পারলেন না।' (দ্রষ্টব্য : শ্রীরঞ্জু নাগ, *বুদ্ধিজীবীদের কাল শেষ হল*, 'কম্পাস', ৩ এপ্রিল ১৯৭১)

এ পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহের গুরুত্ব ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক। বাংলাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও আবেগী মনোভঙ্গির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গিক ঐতিহাসিক রূপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তাৎপর্যময় দিক। তেমনিই বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের তথা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও তাঁর উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত।

আমরা লক্ষ করেছি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জীবনমহিমা ও জীবনসংগ্রাম বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন দারুণভাবে উপেক্ষিত। রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহের রাজনৈতিক মতাদর্শ, সমকালীন মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক, পর্যালোচনা মানব সম্পর্কের যোগসূত্র স্থাপন করবে বলে আমরা আশা করি। এ বিবেচনায় আমরা এম.ফিল-এর গবেষণার বিষয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির স্বরূপ নির্ধারণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিত ১-৪০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মানস স্বরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১-৭১

বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি

তৃতীয় অধ্যায় ৭২-৭৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : উপনিবেশ ৭৮-১০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তিমির-তীর্থ ১১০-১২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মন্দ্র-মুখর ১২৪-১৩৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সূর্য-সারথি ১৩৫-১৪৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিলালিপি ১৪৬-১৫৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মহানন্দা ১৫৯-১৬৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নির্জন শিখর ১৬৭-১৭৮

উপসংহার ১৭৯-১৮৪

পরিশিষ্ট ১৮৫-১৯০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মানস স্বরূপ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিমানস গঠিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে। সাধারণত মানুষের চিন্তা কোনো নিরবলম্ব বিমূর্ত আদর্শ নয়, যে ব্যক্তি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ের বাস্তবতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তার চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সামাজিক জীব হিসেবে যেমন সে কোনো না কোনো সমাজে বসবাস করে তেমনি সমাজের বিভিন্ন ঘটনা আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে। আর শিল্প হলো ব্যক্তির সেই চিন্তারই প্রতিফলন। কথাসাহিত্য কেবল ব্যক্তি নয়, শ্রেণি-সম্প্রদায়সহ সামগ্রিক জাতিসত্তার মননকে মূর্ত করে তোলে। প্রত্যক্ষত পারিবারিক উত্তরাধিকার ও সময়সম্পৃক্ত আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পীসত্তা মানসিকতার প্রতিভূ হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক মানুষ একান্ত নিজস্ব জগৎ-দ্বন্দ্ব সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের আলো ছড়ায়। ব্যক্তির চেতনার মিথস্ক্রিয়া, চেতনাস্রোতের স্বনির্মিত রূপকল্পই মুলত উপন্যাস এবং সাহিত্য। সুতরাং কোনো ঔপন্যাসিকের চেতনালোকের গৌরব, মহত্ত্ব ও ব্যতিক্রমিতার সঙ্গে জৈবিক ঐক্য সম্পর্কিত। তাই সঙ্গত কারণেই কোনো ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্ম বিবেচনার পূর্বে, সেই ব্যক্তির প্রাণচঞ্চল নির্যাসটুকু আবিষ্কার ও তার নিরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন।' কারণ 'ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক নন, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নন, তিনি অস্তিত্বসন্ধানী।'[১] উপন্যাসের এই গহনতা, ব্যক্তিসত্তাকে অনুধাবন করবার চেষ্টাকেই আধুনিক উপন্যাসের মূল সুর বলে মনে করেন অনেকেই। অস্তিত্ব অনুসন্ধানী শিল্পীর মনন, সময় ও ইতিহাস অনুসন্ধান প্রচেষ্টা থেকেই সৃষ্টিকর্মের মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। নতুবা সেই সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন অপূর্ণ থেকে যায়, আংশিক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই কোনো কথাশিল্পীর সৃষ্টিকর্ম বিবেচনায় তাঁর সময়, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি, যা শিল্পীর মননকে বুঝতে সহায়ক হবে এবং সেই প্রতিফলনে তাঁর কর্মকেও মূল্যায়ন যথাযথ হবে।

বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে যাঁর পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা, 'সুনন্দ' ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন–তাঁরই পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র জৈবনিক লেখক সরোজ দত্তের মতে–

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২৭ জানুয়ারি ১৯১৭, ১৪ মাঘ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, সরস্বতী পূজার দিন বা তার পরদিন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার নলচিরার বাসুদেব পাড়ায়। নারায়ণ

> গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডিঙ্গিতে, তার মাতুলালয়ে। তাঁর বাবার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মায়ের নাম বিন্ধ্যবাসিনী দেবী।'[২]

'নারায়ণ' ঔপন্যাসিকের প্রকৃত নাম নয়। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে তাঁর নাম ছিল 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'। নারায়ণ নামটি সম্ভবত তাঁর দিদিমার রাখা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হবার পরেই নারায়ণ নামটি ব্যবহার করতে থাকেন। বিশেষত প্রকাশিত সাহিত্য কর্মের শুরু থেকেই আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামটি ব্যবহৃত হতে দেখি। কেন তিনি নাম বদলালেন তার কোনো কারণ সম্ভবত কোথাও তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। তবে এই বিষয়ে বলতে গিয়ে 'রোশনাই' নামক একটি কিশোর মাসিক পত্রিকায় মনোজিত বসু তাঁর 'টেনিদার মুখ থেকে শোনা' শীর্ষক স্মৃতিচারণে জানিয়েছিলেন–'বিখ্যাত স্বর্ণলতা (যা থেকে সরলা নাটক) গ্রন্থের সুবিখ্যাত লেখকের নামও ছিল 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'। পাছে সেই নামের সঙ্গে গুলিয়ে যায় এই ভেবে তিনি 'তারকনাথ' বদলে 'নারায়ণ' রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ শৈবদেবতার বদলে বৈষ্ণব দেবতা। তারপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে চলতি নাম নারাণ গাঙ্গুলী।'[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রমথনাথ ও বিন্ধ্যাবাসিনীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। দুই অগ্রজের অতিবাল্যকালেই মৃত্যু হয়। মৃত অগ্রজদের নাম জানা যায় না। অপর দুই অগ্রজের নাম যথাক্রমে 'নিখিলনাথ' ও 'শেখরনাথ'। বোনদের মধ্যে সতীরাণী, ননীবালা ও পটুঁরাণী। নারায়ণ ছোটবেলা থেকেই খামখেয়ালি, অবিন্যস্ত ছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু ব্যোমকেশের স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়; ব্যোমকেশ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দেন:

> 'আমার বাবা পুলিশ বিভাগে চাকুরি করতেন। তার বদলী সূত্রেই আমরা দিনাজপুরে আসি এবং সেখানেই নারায়ণের সঙ্গে পরিচয় হয়। দিনাজপুরে আসার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। প্রথম দিনই-প্রথম বেঞ্চের দেওয়ালের দিকে বসা একটি নিরীহ ক্ষীণজীবী ছেলের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। অতি সাধারণ-আধময়লা মোটা খদ্দরের বোতামহীন সাদা পাঞ্জাবী ও ততোধিক মোটা খদ্দরের ধুতি পরিহিত ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ, রবি ঠাকুরের মত নাক আর অবিন্যস্ত একমাথা কালো চুল। রোজ স্কুলে যাবার পথে দেখেছি–পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি এবং কাঁধে পাঞ্জাবী নিয়ে, ঝাঁটার কাঠির মত সোজা সোজা পাতলা একমাথা চুল–প্রকৃতঅর্থে যথার্থ গৌরবর্ণ ছেলেটি বই এর বোঝা হাতে নিয়ে আপন মনে স্কুলে চলেছে–পেছনে দাদা শেখর। কোনদিন বা শেখর ও সহপাঠী বা বন্ধুস্থানীয় শৈলেশ, শৈলজা। স্কুলে পৌঁছবার পর দেখা গেল নাড়ুর বুকে চেপে ধরা বইয়ের বেশ কয়েকটি বন্ধুদের দখলে চলে গেছে।'[৪]

এটা ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা যখন ব্যোমকেশ তাঁকে দেখেছেন, কারণ এসময়ে নারায়ণ দিনাজপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন।

নারায়ণে এই অবিন্যস্ততা তখন তাঁর গার্হস্থ্য পরিবেশের ফল। আট বছর বয়সেই নারায়ণের মাতৃবিয়োগ হয়। তখনকার পারিবারিক অবস্থার একটি খণ্ড চিত্র থেকে এই অবস্থা আরো ভালোভাবে পাওয়া যায়–

> 'ওঁর মা যখন মারা যান, তখন ওঁর আট বছর ছিল। ওঁরা সবাই তখন দিনাজপুর টাউনে থাকত। তার পাশের বাড়িতেই মেজদির বিয়ে হয়েছিল, তিনি ও বুড়িঠাকুর মা-ই দেখাশুনা করতেন। সেজদিও বড় হয়ে উঠেছিল, তিনিও ছোট ভাইদের দেখতেন। মেজদিও চার বছরের মধ্যে বিধবা হন আর ঠাকুর মা মারা যান। পরে সেজদির বিয়ে হয়ে যায়। মেজদির বিয়ের একমাসের মধ্যেই ওঁর মা মারা যান। ওঁর মা মারা যাবার পর থেকেই ওঁর বাবার চাকরি যায় ও সোনার সংসার ভেঙ্গে যায়।'[৫]

পারিবারিক এই পরিস্থিতিকে একটু বিশ্লেষণ করলে নারায়ণের মানসিক অবস্থার এইটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এক. নারায়ণের আট বছরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালের কোনো এক সময়ে তাঁর মা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী মারা যান। দুই. মায়ের মৃত্যুর মাসখানেক আগে মেজদির (ননীবালা) বিয়ে হয় এবং (১৯২৮-২৯) তিনি স্বামীকে হারান। এই একই সময়কালের মধ্যে (১৯২৫- ২৮/২৯) ঠাকুমা পরলোকগমন করেন। আবার এরই মধ্যে সেজদির (পুটুরাণী) বিয়ে হয়। এই ঘটনাগুলো পরস্পর মনে রাখলে আমরা কিশোর নারায়ণের মানসিক অবস্থা সহজেই বুঝতে পারি। ব্যোমকেশের দেখা ছন্দহীন নারায়ণের অবস্থাও বোঝা যায়। পরবর্তীকালে ভাই শেখরই নারায়ণের প্রধানতম অবলম্বন, যদিও তিনি নারায়ণের চেয়ে 'এক বছর কয়েক মাসের বড়।'[৬]

পারিবারিকভাবেই নারায়ণের পড়াশুনা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ছিলো। কারণ তাঁর বড় দুই ভাইয়েরই লেখার অভ্যেস ছিল, এমনকি পিতারও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে মেজদা বিহারে বসবাস করতেন 'সেখানে তিনি নাকি হিন্দি কাগজে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি লিখে বিশেষ নাম করেছিলেন।'[৭] পিতা প্রমথনাথ সরাসরি কোনো রাজনীতি করতেন না। তাছাড়া তিনি তদানীন্তন সরকারের অধীনে পুলিশ বিভাগের কর্মচারি ছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য বেদনাবোধ তাঁর স্বাভাবিক ছিল।

পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন নাজীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ অর্থাৎ দারোগা, ঠিক সেই সময়ে নারায়ণের জন্ম হয়। পিতার চাকুরিসূত্রে তাঁর ছেলেবেলা কাটে নাজীপুরে। শৈশবের সেই গ্রামজীবন, নদ-নদী, ভূ-প্রকৃতি, বিস্তৃত মাঠ আর বহু বিচিত্র মানুষ নারায়ণকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে সহায়তা

করেছে, যা পরবর্তীকালে সাহিত্যে তিনি সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। শৈশবে নারায়ণ উত্তর বাংলার আত্রাই নদীতে ঘুরে বেরিয়েছেন, খেলাধুলা করেছেন বকুল, কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ-শিমুলের শোভামণ্ডিত মাঠে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক ছাত্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন–নাজীপুরে ছিল এক শ্মশান কালির মন্দির। আর ছিল আলেয়া দীঘি। রাতের বেলায় সেই শ্মশান কালির আবছা ভয়ে আর আলেয়া দীঘির ছমছমানিতে বালক তারকনাথের বুক যেমন ছমছম করত, তেমনি আবার বাগানের চাঁপাফুলের স্নিগ্ধ গন্ধটুক যখন নাকে যেতো, তখন ভয়ের বদলে আনন্দে বিভোর হতেন। সেই বালক বয়স থেকেই স্যার ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক। বোধ করি, তারই বলে গোড়ায় তিনি কবি হয়ে উঠেছিলেন।'[৮]

নারায়ণের মানসিকতায় শৈশবের কবি প্রবণতা ছাড়াও আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় তা হলো–রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানাশোনা। বাবার পুলিশে চাকুরির সুবাদে তাদের বাড়িতে একটি রাজনৈতিক আবহ ছিল। নারায়ণের শৈশবকাল অর্থাৎ উনিশ শতকের একেবারে গোঁড়ার দিকে সারা ভারতবর্ষ দখল করে রেখেছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোহবিস্তারের পর্বে–সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন দখলদারিত্বের মাধ্যমে আপন গর্ভে আত্মস্থ করে রেখেছিল। যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী দখলবাজ প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত। আর সেই সময়েই গড়ে উঠছিল মধ্যবিত্তশ্রেণি। যাদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল ইয়োরোপ কেন্দ্রিকতা এবং পাশাপাশি তৎকালীন শাসক শ্রেণির সুবিধা। এই মধ্যবিত্ত সব মিলিয়ে সন্ধিক্ষণ পর্বের যোগসূত্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান জারি রেখেছিল। কিন্তু বিশ শতক এই মধ্যবিত্তের মধ্যে একধরনের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয়। শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে নিজস্ব চেতনাবোধ অর্জিত হয়। যেটাই ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার রূপ নেয়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে যে অহংবোধ ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা জাগ্রত হয় তা শুধুমাত্র সংকীর্ণ হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চেতনায় আবদ্ধ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) ধর্মাত্মার সন্ধান অনেকাংশে ভারতসন্তানেরই আত্মিক প্রেরণা। তবু ব্যক্তিসচেতনতা ও নিজস্ব শিক্ষার করায়াত্তে মধ্যবিত্তের আত্মসচেতনতা জাগ্রত হয়। এই আত্মসচেতনতাই শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবোধে উন্নীত হয়। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক চক্রের ষড়যন্ত্র অবলোকনের সুযোগ পায় বাঙালি। সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে সম্ভাবনাময় অখণ্ড বাঙালির অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার এ-প্রয়াস রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়; তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় স্বদেশীআন্দোলন। এ আন্দোলনে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'বন্দেমাতরম' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'আমার সোনার বাংলা'; 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কেবল রাজনৈতিক ঐক্য নয়, জাতীয় ঐতিহ্য-উৎসে-ফেরার আহ্বানও বটে। ১৯০৬ সালে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে স্বদেশী-আন্দোলনকেন্দ্রিক সমাবেশে ধ্বনিত হয় স্বদেশী-আদর্শভিত্তিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়–স্বদেশীশিক্ষার প্রতিই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ছিল অগ্রসর। এ সময় বিদেশি পণ্যবর্জন আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলায় জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথ অনেকাংশে উন্মোচিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক দাবি ও প্রেরণা নতুন শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সমকালে চটকল, লোহা ও কয়লাখনির শ্রমিকসংখ্যার পরিবর্ধনে তার সমর্থন পাওয়া যায়। এই ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে মধ্যবিত্তের উজ্জীবন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি নিহিত। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে এ উজ্জীবন-বাস্তবতা আরো প্রসারিত হয়েছে মুলত ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের প্রতারণার কারণে। যুদ্ধকালে অধিকতর শান্তিপূর্ণ ভারতীয় উপনিবেশকে উৎপাদন সহায়ক অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র।'[৯] মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন বিকশিত হতে থাকে নানা মাত্রায়। 'বাঙালির সংগ্রামী মানসিকতার কারণে ১৯১২ সালে 'বঙ্গভঙ্গ আইন' বাতিল হলেও 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল বিল'-১৯০৯ ঘোষণা এবং ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে শাসক চক্রের সুদূরপ্রসারী ভেদবুদ্ধি ও প্রতারণা-কৌশল বাস্তবায়নের সূচনা হয়। এ প্রতারণার ফলাফল প্রত্যক্ষ করার জন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।'[১০]

চাকুরি সূত্রে পিতা নাজীপুরে দারোগা আর নারায়ণের স্কুল জীবনের শুরু এখানেই। ছেলেবেলার সেই নাজীপুর লেখকের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। লেখকের সাহিত্যিক জীবনেও তার মূল্য অনেক। এ বিষয়ে *শিলালিপি* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬) উপন্যাসটি উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্থল। এখানে ঔপন্যাসিক তাঁর শৈশবকাল চিত্রায়ণ করেছেন। লক্ষণীয় যে উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে "বাবার স্মৃতির উদ্দেশে"। শৈশবে পিতার স্মৃতি তাঁর মনে গেঁথে ছিল এবং এই উপন্যাসে তিনি একজন আদর্শ দারোগার চরিত্রও চিত্রিত করেছেন, যা তাঁর বাবার কথা মনে রেখেই প্রণীত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা নাজীপুরের যে স্কুলে অতিবাহিত হয়েছে সে সম্বন্ধে বিচিত্র ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে *শিলালিপি*র নায়ক রঞ্জুর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে, অবশ্য তা পরোক্ষভাবে– 'ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। পাড়াগাঁয়ের এমন স্কুলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতি-নীতিতে

শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত। সাড়ে সাত থেকে সাড়ে বত্রিশ টাকা পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতনের পরিধি। তাই মাইনে আদায় করতে না পারলে তাঁরা ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি কলাটা মূলোটা যা পারেন সংগ্রহ করেন। তাতেও যখন পেট ভরে না, তখন বঞ্চিত জীবন সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু অভিযোগ এবং বিদ্বেষ তার পুরোপুরি শোধ তুলবার চেষ্টা করে থাকেন ততোধিক দুভার্গ্য ছাত্রদের ওপর দিয়ে।'[১১]

নাজিরপুরেই পিতা প্রমথনাথের পদোন্নতি হয়। পিতার পদোন্নতির কারণে তারা দিনাজপুর শহরে চলে এলেন। তখন থেকে অনেকটাই স্থায়ীভাবে দিনাজপুরের বাসিন্দা হলেন তাঁরা। এটা *শিলালিপি* উপন্যাসেও আছে–

> 'নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন। চাকুরিতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার-ইন-চার্জ হলেন তিনি।'[১২]

দিনাজপুর স্কুলেই কিশোর তারকনাথের শিক্ষা চলতে থাকে। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ফরিদপুর কলেজে পড়বার জন্য যান। সরোজ দত্ত জানিয়েছেন–

> 'দিনাজপুরের জেলা স্কুল থেকে, নারায়ণ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৩৩ সালে। বাংলায় পেয়েছিলেন ৮৪ নম্বর। কৃতী ছাত্র নারায়ণ এরপর আই.এ. পড়বার জন্যে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর প্রথম অবস্থান স্থল মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। মন্মথনাথ ছিলেন নারায়ণের সম্পর্কিত অগ্রজ, সরকারি কর্মচারী কিন্তু অবিলম্বেই নারায়ণকে চলে যেতে হয়েছিল মন্মথনাথের বাড়ি থেকে কলেজ হোস্টেলে।'[১৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্কুল জীবনের সময়েই দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই তীব্র হয়। নারায়ণের এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। নারায়ণের ছোটবেলার রাজনৈতিক আকর্ষণ নিয়ে কথা বলেছেন নারায়ণের অগ্রজ শেখর গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন–

> 'দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি স্কুলজীবন থেকেই নারায়ণের তীব্র আকর্ষণ ছিল–বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি। তাই আমি যখন বিপ্লবী দলে যোগ দিলাম, তখন সে কথা তার কাছে লুকিয়ে রাখার কোন প্রশ্নই ছিল না। আমার এ কাজে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। যদিও নারায়ণ নিয়মমত আমাদের দলের কখনো সদস্য হয়নি, তা হলেও দলের জন্যে কখনো কোন কাজ করতে ও আপত্তি করে নি। এর মধ্যে অনেক কাজ যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। যেমন, অস্ত্র ইত্যাদি লুকিয়ে রাখা বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, চিঠিপত্র, বে-আইনি বই ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া।'[১৪]

ফরিদপুর বসবাসকালীন 'কলেজ জীবনে' তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সেখানকার রাজেন্দ্র কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। রাজেন্দ্র কলেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই বিশিষ্ট সহপাঠীর নাম 'অচ্যুৎ গোস্বামী' এবং 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র'। একই দিনে কলেজে ভর্তি হন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অচ্যুৎ গোস্বামী। অচ্যুৎ গোস্বামী প্রথম দিনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তারকনাথ' নামটাই শুধু জেনেছিলেন–'কিশোর তারকনাথের স্মৃতি' প্রবন্ধে তিনি এটা বলেছেন।[১৫]

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে থেকেই কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তীব্ররূপে বিস্তৃত সামন্তস্বার্থ ও বুর্জোয়াস্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাতাবরণে নরমপন্থা ও চরমপন্থা এই দুই বিপরীত ধারার রাজনৈতিক মেরুকরণে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। *বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)* বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই মূলত কংগ্রেসী রাজনীতির উদারনৈতিক ও চরমপন্থী ধারা সুপ্রকাশ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পায়।

বঙ্গভঙ্গ'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিলো ঐতিহাসিক 'স্বদেশী-আন্দোলন'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহবানে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা নেমে এলো রাজপথে। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রণীত হলেও ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। গঠনতন্ত্র কার্যকর করতে না পারায় দেশব্যাপি কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে নানামতের জন্ম হয়। এর ফলে মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধিতা এবং নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরির বাস্তবতা তৈরি হয়। 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত আন্দোলন ধারার নিয়ন্ত্রণ ছিলো চরমপন্থী রাজনীতিবিদদের হাতে। চরমপন্থীদের কাছে "স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা গৌণ, মুখ্য–স্বরাজ।"[১৬] ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনকে সীমায়িত রাখার উদারনৈতিক উদ্যোগে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে চরমপন্থা-নরমপন্থার দ্বন্দ্ব ব্যাপক রূপ নিলো 'স্বরাজ'-কে উপলক্ষ করে। 'এই দ্বন্দ্বেরই ক্রমধারায় চরমপন্থী রাজনৈতিক ধারার স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ গোপন সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়।'[১৭]

সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে গোপনে গঠিত হয়। ব্যায়ামচর্চা, চরিত্রগঠন, সমাজসেবা ও দেশাত্মবোধক নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে ২৪ মার্চ কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'অনুশীলন সমিতি'। বাংলাদেশে 'গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন' স্থাপনের জন্য বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুশীলন সমিতি' সহযোগে একটি গুপ্ত বিপ্লবী আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে প্রমথনাথ 'ঢাকা সমিতি'র পত্তন করেন। এর

যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন পুলিনবিহারী দাস। ১৯০৬ সালে বারীন্দ্রের পরিচালনায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরেই তাঁরা সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। বস্তুত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমিতির ভিতরে 'যুগান্তর দল' নামে পৃথক একটি উদ্রপন্থী উপদলের সৃষ্টি হয়। পরে মূল দলের সঙ্গে এদের বিরোধ তৈরি হয়। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে মুরারিপুকুর গোষ্ঠীর সদস্য ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। অন্যরা গ্রেফতার হন। সরকার এদের সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেন। 'যুগান্তর পার্টি' স্থানিক ভিত্তিতে কয়েকটি উপদলে বিভক্ত থাকলেও এরা মুলত বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে অনুশীলন সমিতি একটি সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে।

সে সময় তরুণদের মধ্যে এসব সশস্ত্র দল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ইতিহাসবিদ বিশেষত 'মর্লির মন্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবকে তীব্র রাজনৈতিক অসন্তোষের স্বাভাবিক পরিণতি বলে গণ্য করতেন। পক্ষান্তরে মিন্টো মনে করতেন, এটা নেহাত অনুকরণজনিত।'[১৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অগ্রজ শেখর গঙ্গোপাধ্যায় এমন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কথা থেকে বলা যায়–

> 'স্কুলজীবন থেকেই আমাদের রাজনীতির দিকে টান ছিল। নারায়ণ যদিও জেলে যায়নি কিন্তু ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমি জেলে যাই আর জেল থেকে বেরিয়ে দুজনেই যুগান্তর পার্টির একটা গ্রুপ এ যোগ দিই। খুব একটিভ না হলেও নারায়ণ পার্টির জন্য যথাসম্ভব কাজ করত। কলেজে পড়বার সময়ে নারায়ণ কমুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসে এবং আমার সঙ্গে ওর কথাবার্তা অনুসারে, ও পার্টির কিছু কাজ করতে আরম্ভ করে। অবশ্য পার্টি তখন বে-আইনি ছিল।'[১৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সেজ-দা শেখর গঙ্গোপাধ্যায় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। নারায়ণের শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল দাদার উপরে। এ বিষয়ে গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির সতীর্থ'তে যা লিখেছেন তা অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার সূত্রে জানা যায়–

'কলেজের প্রথম ধাপেই পুলিশের কবল থেকে সেই দাদা যে উধাও হয়ে যান আর বাড়ি ঘরে তাঁকে নারায়ণ দেখেন নি বহু বৎসর। উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী গোপন কর্মীর জীবন, সেখানকার নানা জেল ও দেউলির বন্দীনিবাস পেরিয়ে কর্মে ও মতে রূপায়িত হতে হতে ক্রমে আবার সে প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হয়,–তার পরে বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যম–প্রয়াসে নিজেকে আবারো নতুনভাবে

তৈরি করেন '[২০] এর সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধের অংশ মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে–

> 'বাংলাদেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃষহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ। পড়েছি রবীন্দ্রনাথের *নৈবেদ্য*, নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত *দেশের ডাক*, *ফাঁসির সত্যেন*, আমাদের হাতে ঘুরেছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের *সর্বহারাদের গান*, বিমল সেনের *ফুলঝুরি*, প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের *বেণু* পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো : 'দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।' সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।'[২১]

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স অবশ্য বারো বছর। ফলে সে সময় তিনি ঠিক কী দেখেছেন বা কতটা উপলব্ধি করেছেন, সেটা বলা দুষ্কর।

বিশ্ব রাজনীতির পালাবদলও এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। '১৯১৪-১৮ সালের সময়সীমায় সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯১৭ সালে অক্টোবরে রাশিয়ায় সম্পাদিত বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বিশ শতক তথা বিশ্ব-ইতিহাসের দুই তাৎপর্যবহ ঘটনা। একদিকে মহাযুদ্ধে মানববিধ্বংসী রাজনীতির মারণান্তিক আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে মানবসভ্যতা ও মানবসমাজের বিকাশধারায় নিপীড়িত 'সর্বহারা'র কল্যাণার্থে সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব–এই দুই পরস্পর– বিপরীত ঘটনা যুদ্ধকালীন সমাজ ও বিশ্বের রাজনীতির পটভূমিতে সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়া ও প্রভাববিস্তারী প্রসঙ্গ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনিবার্য করে তোলে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়। যুদ্ধে পুঁজিবাদী বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মুখচ্ছদ নগ্নরূপে উন্মোচিত হয়। ফলস্বরূপ বিশ্ব মানবসমাজের রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক অনিশ্চিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যুদ্ধাবস্থায়, ১৯১৭ সালে অক্টোবরে এই তমসঘন পরিবেশে ঊষা-সূর্যের আলোক-আভা ছড়িয়ে সংঘটিত হলো রুশবিপ্লব; বিরূপ বিশ্বে নৈরাজ্য-নৈরাশ্য, নাস্তি ও নঞর্থকতার বিপ্রতীপে শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধি, প্রত্যাশা ও প্রত্যয়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নবমহামন্ত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো, দেশে-দেশে সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতিতেও ঘটলো তার অনিবার্য প্রভাব-প্রতিফলন।'[২২]

বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে মাত্রাগতভাবে ভিন্ন ছিল। যুদ্ধজয়ী ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্ববৃহৎ কলোনি হিসেবে যুদ্ধের অনাকাঙ্খিত উত্তরাধিকার ভারতকে আত্মস্থ করতে হয়। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান গতি ঘনীভূত করে তোলে অর্থনৈতিক সংকট।

যদিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও 'স্বরাজপন্থী' রাজনীতিকেরা যুদ্ধ প্রসঙ্গে নিজেদের সরব উৎসাহকে রাজনৈতিক রণকৌশল রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের অন্যতম প্রধান পক্ষ ইংল্যান্ডের কাছ থেকে স্বরাজ অধিকার করার বস্তুগত ভিত্তির সন্ধান পেলেন তাঁরা। 'ব্রিটেনের যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। আশা ছিল এই ভাবে ব্রিটেনকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করলে হয়ত পুরস্কার মিলবে। হয়তো ভারত স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হতে পারবে ইংরেজদের অনুগ্রহে। যুদ্ধে সহযোগিতা করলে স্বরাজ আসবে এমন আশ্বাসে প্রতারিত হলেন সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত (১৯১৪) মহাত্মা গান্ধী; যুদ্ধে সহায়তার মানসে ব্রিটিশদের জন্য ভারতীয় সৈন সংগ্রহে পর্যন্ত সচেষ্ট হলেন তিনি। পরিশেষে, যুদ্ধ সমাপ্তিতে স্বরাজ-এর পরিবর্তে ভারতবর্ষ পেল 'মন্টেগু-চেমসর্ফোড সংস্কার পরিকল্পনা' (১৯১৯), 'জনপীড়নমূলক রাওলাত-আইন' (৩মার্চ ১৯১৯)। একই বছর গণঅভ্যুত্থানের শাস্তিস্বরূপ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র জনতার ওপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চালানো বেপরোয়া গুলিতে শহীদ হলেন চার শতাধিত ভারতীয়।'[২২] ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে কৌশলগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল।

'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা', 'রাওলাত-আইন' এবং 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড'-এর সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া স্তরবহুল ভারতীয় সামাজিক শ্রেণির রাজনৈতিক স্রোতোধারাকে করলো লক্ষ্য–অভিমুখী। সর্বজনীন এই প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এর পূর্বেই রাওলাত-আইনের বিরুদ্ধে তাঁর সূচিত সত্যাগ্রহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন।[২৩] খিলাফত আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করলেন পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনে। বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও ভোটাভুটি শেষে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) ঘোষণা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন লাভ করলো। অন্যদিকে কংগ্রেসী রাজনীতির 'স্বরাজপন্থী' অংশ গান্ধীর অহিংস কর্মসূচীর সমান্তরাল 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হলেন। বাঙালি রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০- ১৯২৫) নিয়ন্ত্রণে ছিলো 'স্বরাজপন্থী' অংশের নেতৃত্ব।

গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সর্বভারতীয় বিস্তার ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বভারতীয় চারিত্র্য অর্জন করে। তবে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ সহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হলে বাঙালি নেতাদের প্রবল বিরোধিতার মুখে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন। শ্রেণি-নির্বিশেষে সর্বজনীন অংশগ্রহণে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ যখনই হাতছাড়া হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখনই বুর্জোয়া নেতৃত্ব আন্দোলনের বিমুখ হতে দ্বিধান্বিত হয়নি। তবে আইন অমান্য কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'স্বরাজ দল' (গয়া কংগ্রেস, ডিসেম্বর ১৯২২)। এর সভাপতি ও মহাসচিব মনোনীত হন যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু। ইতোমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে সুভাষচন্দ্র বসু-র (১৮৯৭-১৯২৫) আত্মপ্রকাশ ঘটেছে (১৯২১) ভারতীয় রাজনীতিতে। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষিত হলে গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি 'প্রিন্স অব ওয়েলস'-এর ভারত-ভ্রমণ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে কারারুদ্ধ হন এবং কারাবাস শেষে চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রধান সহকারী-রূপে সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন।

পরর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণার পর মহাত্মা গান্ধী চরকা ও সূতো কাটার বিস্তারে এবং সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রমপীড়িত সমাজে দূষিত অস্পৃশ্য-ধারণার নিরসনে মনোনিবেশ করলেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যুতে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরামর্শেক্রমে গান্ধী 'যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মস্তকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব রূপ 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে দেন।'[২৪] বাংলায় কংগ্রেসী রাজনীতির অভ্যন্তর-সংকটের উৎস এখানেই। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে এই বিভেদ স্থায়ী রূপ নেয়।

বিরোধাত্মক এই পরিস্থিতিতেই '১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারিতে কোটি কোটি ভারতীয়র স্বাধীনতা শপথ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, স্বরাজীদের আইন সভা বর্জনের জন্য মতিলাল নেহেরুর নির্দেশ এবং গান্ধীর সঙ্গে আপস-প্রত্যাশায় এগার দফা দাবি উত্থাপন–ইত্যাদি ঘটনার ক্রমধারায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি ১৯৩০ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে ক্ষমতা অর্পণ করলো।'[২৫] ঐ বছরের ১২ মার্চ আত্মদ্বন্দ্বে জয়ী গান্ধী গুজরাটের 'লবণ আইন'-কে কেন্দ্র করে ডাণ্ডি অভিমুখী যাত্রার মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। সশঙ্কিত ব্রিটিশ

সরকার গ্রেফতার করলেন গান্ধীকে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে আইন-অমান্য আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। গৃহীত হলো বিদেশী পণ্য বর্জন, বিলাতি মদের দোকানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, সরকারি কর্মচারিদের কর্মস্থলে যোগদানে বাধা দান এবং ট্যাক্স পরিশোধ বর্জন কর্মসূচী। এছাড়া 'জালালাবাদ যুদ্ধ' (২২এপ্রিল ১৯৩০), 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' এবং বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে ঐতিহাসিক অভিযাত্রা ও আত্মোৎসর্গ (৮ ডিসেম্বর ১৯৩০) এ পর্যায়ের তাৎপর্যবহ ঘটনা। ছাত্র-যুবক, মহিলা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণে এই আন্দোলন ক্রমশ গণঅভ্যুত্থানের চরিত্র অর্জন করে। আন্দোলন দমন করার জন্য বড়লাট আরউইন ১৯৩০ সালে ১০ অক্টোবর অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কংগ্রেস দল ও তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করলেন; বাজেয়াপ্ত করা হলো কংগ্রেসের সম্পত্তি, হরণ করা হলো কংগ্রেসী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গুলি-চালনা, দৈহিক নির্যাতন এবং নির্বিচার গ্রেফতার করে আরউইন এই আন্দোলনকে দমন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দমনমূলক অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ অভিমুখী হয়ে পড়লে দেশীয় পুঁজিপতি-সম্প্রদায়ের উৎসাহে। কংগ্রেসের মধ্যকার এক শ্রেণির নেতৃত্বের যোগসাজশে গান্ধীকে সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে 'গোল-টেবিল-বৈঠকে'র প্রস্তাব দিলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ স্বাক্ষরিত হল 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'। গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধী ইংল্যান্ডে যাত্রা করলেন। ফলত আইন-অমান্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লো এবং ব্যর্থপ্রসূ বৈঠক-শেষে বিফল মনোরথ গান্ধীকে শূন্যহাতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হলো। কৌশলী ব্রিটিশ সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য গোল-টেবিল বৈঠকের কর্মসূচী অব্যাহত রাখল এবং যুগপৎ দমননীতিও কার্যকর করে চলল। আবার কারারুদ্ধ হলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩৩ সালের ৩০ এপ্রিল কারাভ্যন্তর থেকে তিনি ঘোষণা করলেন একুশদিন ব্যাপী অবিরাম অনশন কর্মসূচী। ৮ মে অনশন শুরুর দিন সরকার গান্ধীকে কারাবাস থেকে মুক্তি দিলেন এবং অন্যান্য বন্দির মুক্তিদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের আহ্বান জানালেন।

'অসহযোগ-আন্দোলন' ও 'আইন-অমান্য আন্দোলন'-এর সর্বজনীন আবেদন এবং এর সর্বভারতীয় প্রভাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই দুই আন্দোলনের সময় পরিধিতে অহিংস অসহযোগ এবং সর্বাত্মক আইন অমান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুদয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পারিবারিকভাবেই তিনি কংগ্রেসীয় রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ নারায়ণের বাবা ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির সমর্থক। আর তখন বাংলাদেশে বিরাজ করছিল বিপ্লবী আন্দোলনের কাল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস *উপনিবেশ* (১৩৮৯)-এর ভূমিকায় লিখেছেন–

> অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হল একদিন।[২৬]

এখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথাও স্মরণীয়। গোপাল হালদার লিখেছেন–

> নারায়ণের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলে তাঁর অগ্রজ, তরুণ শেখর গাঙ্গুলী ছিলেন সে দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক। নারায়ণের কাছে তাঁর সে রূপ গোপন ছিল না।[২৭]

দাদার প্রতি শুধু শ্রদ্ধা ও আস্থা পোষণ নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই সময়েই পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তাঁর উপন্যাস তাই তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহৃত হয়নি, চরিত্রের অন্তঃবিকাশে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে, তাঁর প্রথম পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কই বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। আবার পরবর্তীকালে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই এই নায়কেরা কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যার পরিণতি মার্কসবাদের দীক্ষাগ্রহণ এবং নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কোনো আত্মজীবনী লিখেননি কিম্বা নিজের কোনো লেখায় ব্যক্তিগত বিষয়াদি উল্লেখ করেননি। ফলে আমাদের পূর্ণাঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। আবার তাঁর মৃত্যুপরবর্তী দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ব্যক্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সন্ধান খুব বেশি একটা পাই না। যেটা পাওয়া যায় তা হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক সময়ের বন্ধু কথাসাহিত্যিক সরোজ দত্ত লিখিত *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়* (প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে)। কিন্তু সেখানেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিনাজপুর, ফরিদপুর কিম্বা বরিশাল জীবনের দিনলিপি খুব অল্পই জানা যায়। জৈবনিক এই গ্রন্থটিতে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের বরিশাল, ফরিদপুর এবং দিনাজপুরে জীবন নানাভাবে নানাজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন । অনেক তথ্য কখনও কখনও একাধিক উৎস

থেকে নেবার কারণে বিকৃত হয়েছে। আবার কোন কোন তথ্য একেবারেই পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটিতে নারায়ণের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসা, তাঁর বাবার চাকুরিচ্যুতি কিম্বা খোদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ নিয়ে রয়েছে একাধিক তথ্য। তবে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি শুধুমাত্র সেই তথ্যের উপরে যেটা নারায়ণের নিজের বয়ানে কিম্বা লিখিত আকারে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধগুলো বিশেষ কাজে দিয়েছে। বিশেষত নারায়ণের নিজের চিন্তাকে বোঝার জন্য, আরো স্পষ্ট করে বললে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা মতাদর্শকে বোঝার জন্য। তিনি যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অর্থাৎ পার্টি সংগঠন অথবা নিত্য পার্টি অফিসে যাবার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সেটা নারায়ণের নিজের কথা (*শিল্পের স্বাধীনতা*)-র মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতি অথবা গান্ধীবাদী রাজনীতি অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন–সেটা স্পষ্ট নয়। কারণ লেখকের উপন্যাসের পর্যায়গুলোকে যদি বিশ্লেষণ করি তবে কোনো স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। কারণ প্রথম দিকের উপন্যাসের অধিকাংশেই তিনি বিপ্লবী রাজনীতিকে সমর্থন করছেন। কিন্তু উপন্যাসগুলোর ভেতরে এক ধরনের হতাশা আছে। অর্থাৎ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর দিক থেকে রাজনৈতিক লাইন বা দিশা বলতে যেটা বোঝায় সেটা পাচ্ছে না। তিনি সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে হতাশ হয়ে কংগ্রেসের রাজনীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেখানে তাল মেলাতে পারছেন না। আবার কখনও কংগ্রেসের মতাদর্শ, গান্ধীর রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু সেখানেও আবার ঠিক উদ্যমটা নেই। যেমন ভাবে চলবার প্রয়োজন বলে বাস্তবতা থেকে মনে হচ্ছে, সেটা পার্টি করছে না বলে তাঁর মনে হয়েছে। ফলে সেখানেও একটা একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং তিনি এককভাবে কোন রাজনীতিকে অনুসরণ করছেন বা লেখনীতে নিজে কোনটা ধারণ করে চরিত্রগুলোর উপরে প্রয়োগ করেছেন সেটা একটু দ্বিধান্বিত। তবে স্পষ্টভাবে বলা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংঘ শক্তির পক্ষে। তিনি গণমানুষের সামগ্রিকতাকে ধারণ করতে চান, চান, সেটাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। এটাই হয়ত রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের মূল পরিচয়।

মোটামুটি আট-ন'বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; ঔপন্যাসিকের নিজের বক্তব্যেই পাওয়া যায়–

> 'ছাপার অক্ষরে কৈশোরকালের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হলো 'মাস পয়লা' কবিতাটি। *মৌমাছি* পত্রিকায় ছোটদের বিভাগে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য। যে কবিতাটি সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম 'আষাঢ়ে' এবং সেই লেখার জন্য তিনি বারো আনা দামের একটি পুরস্কারও লাভ করেন। শিশু সাহিত্য ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এবং অনুমান তাঁর বয়স তখন বারো।'[২৮]

পরে ধীরে ধীরে লেখার হাত পরিণত হতে শুরু করে এবং লেখার ইচ্ছেও বাড়তে থাকে। তিনি স্কুলের পত্রিকাতে লিখতে থাকেন। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার অবসরে একদিন বড়োদের উপযোগী 'অবরুদ্ধ' নামে একটি কবিতা সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় পাঠালেন এবং ১৩৪১, ১৭ কার্তিক (৩ নভেম্বর, ১৯৩৪) তা ছাপা হলো। পরবর্তীতে *দেশ* পত্রিকায় অনেক কবিতা ছাপা হয়েছিল–'অদুরাগত' (১৩ পৌষ ১৩৪১), 'অমাবস্যা' (৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪২), 'আমার প্রভাতী কাহারে শুনাবো' (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪২), 'আসিয়াছে রাবণের রূপে' (১২ মাঘ ১৩৪১)। শুধু *দেশ* নয় *বিচিত্র* এবং সেসময়ের আরো অনেক সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত হতে শুরু করেন।

কবিতা লেখার পর্ব চলতে চলতে হঠাৎই একদিন যেন ছেদ পড়ে গেল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণের কথাসহিত্যের মুখটি খুলে দিয়েছিলেন। কবিতার স্বর্গ ছেড়ে ছোটগল্পের জগতে নামলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষ্য করলেন তাঁর চারপাশের জগতে গদ্য-সাহিত্য রচনার বহু বিস্তৃতক্ষেত্র অপেক্ষমান। *দেশ* পত্রিকার জন্য পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গল্প লিখতে বললেন।

'*আমার কথা*' প্রবন্ধে নারয়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–

> গল্প লিখব–কিন্তু কী লিখি। কিছুদিন আগে ফরিদপুরে থাকবার সময়ে কিছু কিছু গল্প চর্চা করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই গণ্ডীবদ্ধ শৃংখলিত দেশমাতা সর্ম্পকে জ্বালাময়ী রচনা। পবিত্রদার পত্রে বিব্রত হলাম।[৩০]

গল্প সর্ম্পকে 'আমার কথা' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন–

> সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য জগতে যে সব লেখা আমার প্রাণ মন কেড়ে নিয়েছিল সেগুলি অচিন্ত্যকুমারের গল্প। তারাশঙ্করের বিচিত্র একটি ফ্যান্টাস্টিক রচনা–নাম বোধহয় মনোজ বসুর *বন-মর্মর* এবং নবাগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুল নাচের ইতিকথা*। মপাসাঁ আর বালজাকের গল্পও কখন গিলতে শুরু করেছি। আমার অতি প্রিয় এই সব লেখকের সম্মিলিত প্রভাব নিয়ে *দেশ*-এর পাতায় আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়ে বেরুল : 'নিশীথের মায়া'। আমার বয়স তখন সতেরো থেকে আঠারোর মধ্যে। বয়স সুলভ রোম্যান্টিকতার স্বপ্নময় অতীতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে গল্প আকারে একটা ফ্যান্টাসি খাড়া করে তুলেছিলা।[৩০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় আসার পরে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনার একটা ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৩৯ সালে। এর আগে 'আই.এ পরীক্ষা না দিয়ে

নারায়ণ ফরিদপুর ত্যাগ করেন বা করতে বাধ্য হন। মে ১৯৩৫ সালের আগে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর ন'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ফরিদপুর ত্যাগ করতে না করতেই ৪ মে ১৯৩৫-এ *দেশ*-এ প্রকাশিত হল তাঁর 'মৃত্যু দিয়ে আনে জন্ম' কবিতাটি। এইভাবে আরো দুটি কবিতা পত্রস্থ হবার পর *দেশ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হল 'নিশীথের মায়া'– এর প্রকাশকাল ২৫ শ্রাবণ ১৩৪২,(১০ আগষ্ট ১৯৩৫)। গল্পটি প্রকাশের একটি ইতিহাস আছে। নারায়ণ ততদিনে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। নারায়ণ লিখেছেন:

> বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এ পড়ছি। তখন পবিত্রদার পত্রাঘাত এলো–গল্প লেখো? ঘটনাটি আরেকটু বিস্তৃত করে লিখেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই। তিনি তখন *দেশ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, নারায়ণের ৪/৫ টি কবিতা প্রকাশিত হবার পর তিনি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পান, যাতে ওঁ সামান্য পারিশ্রমিকের কথা বলেছে। পবিত্র অবশ্য বলেছেন, এ চিঠি নারায়ণ লিখেছিলেন বরিশাল থেকে। ঠিক নাও হতে পারে এ তথ্য; কারণ নারায়ণ ফরিদপুরে থাকাকালে *দেশ*-এ তাঁর নটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যাই হোক, নারায়ণের চিঠির উত্তরে পবিত্র লেখেন– "কবিতার জন্য পয়সা দেওয়ার নিয়ম নেই। গল্প লিখে পাঠাও, চেষ্টা চরিত্র করে যা পারি ব্যবস্থা করবো। হলোও তাই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার এক গল্প লিখে পাঠাল। গল্পটি যে নারায়ণ ফরিদপুর থেকে পাঠিয়েছিলেন, এ-অনুমানের কারণ আছে।[৩১]

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের বি.এ ক্লাশের নিয়মিত ছাত্র নারায়ণ (১৯৩৬-৩৮) অপরিচয় থেকে পরিচয়ের আলোতে চলে আসেন শুধু নয়, রীতিমতো নায়কত্বে পৌঁছে যান–তারও মূলে ছিল তাঁর সৃষ্টিকুশল হাত। এই দু'বছরে ব্রজমোহন কলেজ পত্রিকায় তাঁর মোট ছ'টি রচনা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ১৯৩৭-এর বসন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পরিপূর্ণ' (কবিতা) ও 'আমাদের সমাজে নারীর স্থান' (প্রবন্ধ); শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'প্রত্যাবর্তন' (কবিতা) ও 'অনার কীর্তন' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা–এটিতে অবশ্য রচয়িতা হিসেবে নাম ছিল হিরণ ভট্টাচার্য-র। আর ১৯৩৮-এর বসন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'শেষ প্রণতি' (কবিতা) এবং 'কীর্তন বিভ্রাট' নামে 'অনার কীর্তনের' একটি মজাদার টীকাভাষ্য। এগুলো নিয়ে পুরো কলেজে তুমুল আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।'[৩২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মননের আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করা। বিচিত্র আরণ্যক পরিবেশে রচিত তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বনজ্যোৎস্না'। ডুয়ার্সের অরণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি

এখানে। রোমান্টিক গল্প হলেও তিনি কিন্তু সমাজ এবং সময়কে ভুলে যাননি। প্রকৃতি নিয়ে আরো দুটি গল্প 'পলাতক', 'জান্তব'। প্রকৃতি এবং সময়ের বাইরেও সামাজিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন বেশ কিছু গল্প, যেমন– 'ভাঙ্গার গান','দুর্ঘটনা', 'ভাঙ্গা চশমা', 'ফলশ্রুতি'। এছাড়া তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প 'বনতুলসী', এটি রূপকধর্মী, জনপ্রিয় গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বদেশকে ভালোবাসতেন, মানুষের মহত্ত্বের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু শুধুমাত্র আবেগ-সম্বল সেই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাহায্যে মহৎ উপন্যাস লেখা কি সম্ভব? উপন্যাসগুলোর মধ্যে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতাও প্রবল। অবশ্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শুধু নিজের কথাই বর্ণনা করে যাননি। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি সচেতনভাবে তার কালকে ধরতে চেয়েছেন। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ১৯৭০ সাল–বিপুল এইকাল পরিধির মধ্যে তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু শুধু সেইটুকু দেখা নয়, আরও বড়ো পটভূমিতে তিনি দেখতে চেয়েছেন বাংলাদেশকে, বলেছেন–

> আমি বাঙালি আর ভারতবাসীর কথা লিখবো–লিখবো তাদের দুঃখের কাহিনী, বেদনার রূপ, সংগ্রামের ইতিহাস।[৩২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে ইতিহাসের উপাদানকে উপজীব্য করেও উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম যৌবনে তিনি যখন *উপনিবেশ* (১৯৪৪-৪৬) লেখেন, তখন তিনি দেখাতে চেয়েছেন কেমন করে 'উপনিবেশের বর্বর যৌবন পূর্ণতার, প্রবীণতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।' আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্বাস মানুষই কেবল ইতিহাস রচনা করে না, ইতিহাসও মানুষ রচনা করে।

এদিকে বিশ্বব্যাপী দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থগত বিরোধিতার ফলস্বরূপ ১৯৩৯ সালে ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এই মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়া মানবঅস্তিত্ব ও বিশ্ব-অর্থনীতিকে করেছে সশঙ্কিত ও বিপর্যস্ত, বিপন্ন হয়েছে সামাজিক অগ্রযাত্রার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ–সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার এবং যুদ্ধেও ফলে বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন নিয়ামক সৃষ্টি হলো। ফ্যাসিবাদী জার্মানি-ইতালি-জাপান এবং তার বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স–এই দুই পক্ষের সশস্ত্র অন্তর্ঘাতের পটভূমিকায় ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্ববৃহৎ উপনিবেশ ভারতের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতি অমোঘভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এরই মধ্যে ভারতীয় সামন্ত-বুর্জোয়া রাজনীতির অন্তর্বিরোধ প্রকাশ্য রূপে হাজির হলো। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অর্জন করলো শাসকশ্রেণির আনুকূল্য। রণকৌশল হিসেবে কংগ্রেসের সামন্ত-বুর্জোয়া রাজনীতির অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে বামপন্থী সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টরা আন্দোলনের সাফল্য সন্ধানে বিভ্রান্ত হলেন। এ পর্যায়ে গান্ধী-বসু বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতির অন্তর্কলহ ব্যাপকরূপ পেল। বিশেষত ১৯৩৯ সালে জানুয়ারিতে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীর রাজনীতি বিরোধিতা সত্ত্বেও সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হলে এই বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে এই বিরোধের পরিণতিতেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা পায়।

১৯৪০ সালে কংগ্রেস রামগড় সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর ভিন্নধর্মী মূল্যায়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র-সংগ্রামের গোপন তাৎক্ষণিক হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র সকলের অগোচরে দেশত্যাগ করে বার্লিন পৌঁছেন, পরে জাপানিদের সহযোগিতায় 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। 'কিন্তু যুদ্ধে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল সহসাই। ১৯৪১ সালে ২২ জুন রুশ-জার্মানি চুক্তি ভঙ্গ করে ফ্যাসিস্ট হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। এরই প্রতিক্রিয়ায়, যে যুদ্ধ কমিউনিস্টদের ভাষায় 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' নামে অভিহিত হয়েছিল, তা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ তথা 'জনযুদ্ধ' অভিধায় চিহ্নিত হলো। যুদ্ধের এ চারিত্র্যগত রূপান্তরে উন্মোচিত হলো ফ্যাসিবাদের নগ্ন স্বরূপ–ভারতীয় রাজনীতির নতুন মেরুকরণেও প্রতিফলিত হলো এর কার্যকর প্রভাব। রাজনীতির এই বস্তুগত প্রতিবেশ মহাত্মা গান্ধীকে সক্রিয় রাজনীতির শীর্ষচূড়ায় প্রতিস্থাপন করলো পুনরায়। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বে অধিবেশনে গান্ধী 'ভারত-ছাড় আন্দোলন'-এর ঘোষণা দিলেন এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উচ্চারণ করে বললেন 'করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা'।'[৩৩]

১৯৪৪ সালের আগস্টে ভারত-ছাড় আন্দোলন গান্ধী-কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। ভারত-ছাড় আন্দোলন যা 'আগস্ট আন্দোলন' নামে সমধিক পরিচিত–তা সৃষ্টি করেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য দশ সহস্রাধিক লোক হত্যা করা হয়, কারারুদ্ধ হয় লক্ষাধিক ব্যক্তি। আগস্ট আন্দোলনের সংগ্রাম-ঐতিহ্যই ১৯৪৫ সালে নব প্রেরণায় সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনসমূহে যুগিয়েছে প্রেরণা ও সাহস।

ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস রচিত হয়েছে–সতীনাথ ভাদুরী'র (১৯০৬-৬৫) উপন্যাস *জাগরী* (১৯৪৫) ও *ঢোড়াই চরিতমানস* (১৯৪৯, ১৯৫১) শীর্ষক সুবিখ্যাত রচনা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন কলকাতায় গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদ আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর *মন্দ্রমুখর* উপন্যাসটি আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

১৯৩৯ সালে কলকাতায় আসার পর বিভিন্নজনের সংস্পর্শে আসার বিবরণ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মননের একটা চিত্র পাওয়া যায়। অচ্যুত গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচারণে জানান, 'অনেক বছর পরে কলকাতায় এক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তারকনাথের (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম) সঙ্গে আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎলাভ করি। জানতে পারলাম, সে এখন মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত। ভারতবর্ষে people's War নামক পত্রিকাটিকেই সে একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের পত্রিকা বলে মনে করে।'[৩৪] এখানে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যে সাহিত্য-সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে, সেটা হয়েছিল ৩ মার্চ ১৯৪৫। তখনও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে কলেজে পড়ান, 'জলপাইগুড়ির ঔপন্যাসিক' হিসেবে সেখানে তাঁর উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন তৎকালিন রাজনৈতিক কর্মী চিম্মোহন সেহানবীশ। ৪৬ নম্বরের বুধবারের বৈঠকেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়মিত উপস্থিতির কথা জানা যায় সেহানবীশের বিবরণে,

> নারায়ণ গাঙ্গুলীর ধীর ও সবিনয় প্রস্তাবে অবস্থার মোড় ফেরার উপক্রম হতো।[৩৫]

তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কোনো রাজনৈতিক পার্টির কর্মসূচী নিয়ে কখনও রাস্তায় না নামলেও সাহিত্যে তিনি সব সময় শোষিত-নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি মানুষের এই সহানুভূতি একজন লেখকের স্বাভাবিক মানবিক বৈশিষ্ট্য। গবেষক সুস্নাত দাশের উক্তি– 'নারায়ণ বাবু ছিলেন 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং পরবর্তীকালে 'প্রগতি লেখক সংঘ'র একজন সক্রিয় সহযোদ্ধা। ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটের সেই সাংস্কৃতিক তীর্থক্ষেত্রে তাঁর প্রায়ই যাতায়াত ছিল। প্রায়ই যেতেন গণনাট্য সংঘের আসরে। অসংখ্য বামপন্থী ছোট পত্রিকার গড়ে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থে বা রচনায়। কমিউনিস্টরা ডেকে নিয়ে যেতেন নানা সভা-সমিতিতে। এমনকি পার্টির কর্মীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সুশিক্ষিত করতেও মাঝে মাঝে ডাক পড়তো নারায়ণবাবুর এবং সেই নির্দেশ হাসিমুখে পালন করতেন। সর্বজনপ্রিয় এই মানুষটি কখনোই ছিলেন না পার্টির সদস্য বা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু দেশপ্রেম মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যে কোনো শোষণ-নিপীড়নের প্রতি তাঁর

তীব্র ঘৃণা তাঁকে টেনে এনেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে।"[৩৬] এই প্রসঙ্গে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা জানতে পারি– 'থার্ড ইয়ার অনার্স ক্লাসে পড়বার সময়ই ওনার সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। তখন চুটিয়ে ছাত্র–ফেডারেশন করতাম। তিনি নিজে আগাগোড়া বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রগতিশীল বা বামপন্থী ছাত্রদের প্রতিও তাঁর আলাদা একটা আকর্ষণ ছিল। সেই হিসেবে আমরাও তাঁর খুব কাছের ছাত্র হয়ে গিয়েছিলাম।'[৩৭]

তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বামপন্থী আদর্শ মাঝে মাঝে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। ভারত চীন আক্রমণ করলে নারায়ণের মানসিকতার আর একটি দিক জানা যায়। 'অবশ্য ১৯৬২ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রগতিশীলতা তথা বামপন্থার প্রতি সমর্থন বিষয়ে একটি সংশয়াত্মক ঘটনা ঘটে। চীনের ভারত আক্রমণের বাতাবরণে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি আর একবার দেশের সাধারণ মানুষের কিছু অপ্রীতি উৎপাদন করেছিল। কারণ রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি সামনে থাকায় তাঁরা সরাসরি চীনের নিন্দা করতে পারেনি এবং দেশব্যাপী স্বজাত্যবোধের স্রোতে নিজেদের মিলিয়ে দিতেও পারেনি। পরিস্থিতিটি যে কত জটিল ছিল সেটা বোঝা যায়– দীর্ঘকালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি চীন আক্রমণের অভিঘাতে দুই বছর পরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।'[৩৮]

তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন সেটা অনেক বার বললেও দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেটাকে আবারো নতুন করে বলার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে *দেশ* পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন–

> আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নই, কোনোদিন ছিলাম না। যতদূর জানি, কম্যুনিস্ট লেখক হতে গেলে এই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হয়, সক্রিয়ভাবে তার কর্মধারার অংশীদার হতে হয়, অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কমিউনিজম সম্পর্কে রায় দেবার অধিকার আমার নেই। কারণ কোনো মতবাদকে সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত তাকে স্তুতি-নিন্দার কোনো শিরোপাই আমি দিতে পারি না। যে কথা বলছি, দেশের শুভাশুভের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগ ফলের উপরেই যে কোন মতবাদকে আমি বিচার করি। আজ দেখছি, কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু। আমার দেশের শত্রু, সমস্থ মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।[৩৯]

কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্য না হয়েও কম্যুনিস্ট লেখক হওয়া যায়, কম্যুনিস্টরা যাদের সহযাত্রী বলে অভিহিত করেন। 'গোপাল হালদার থেকে শুরু করে সুশীল জানা' পর্যন্ত অনেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পার্টির বন্ধু হিসেবে বর্ণনা করেছেন ('শিল্পীর স্বাধীনতা', লেখার পরেও)। শুধুমাত্র অন্যের সাক্ষ্য বা মতামত নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে যেমন, তেমনি তাঁর প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী মাকসীয় সাহিত্যাদর্শের স্বীকৃতি দেখা যায়। স্বাধীনতার অনতিপরে (১৯৪৮) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–

> আসলে জীবননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে– যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে। আর সেই সঙ্গে যদি সে যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে স্বীকার করতে পারে তার বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে, তাহলেই তার আদর্শ সার্থক হবে। আজ বিপ্লবী সাহিত্য আর প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণে যেন অনেক বেশি সতর্ক হই আমরা। সাম্যবাদী শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করতে গিয়ে, আদর্শগত বিবর্তনের বাণীকে ঘোষণা করতে গিয়ে `historical concreteness of the artistic portrayal' সর্ম্পকে যেন আমরা অবহিত থাকি। অত্যুগ্র বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে সাহিত্যে যারা অ্যানারকিজ্‌ম বয়ে আনছে, মার্কর্সবাদের নামে আনছে উন্নাসিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য– Socialist Realism এর সংজ্ঞা সর্ম্পকে অবহিত থাকলে তাঁদের সম্পর্কে কোনো মোহই আমাদের থাকবে না। সাহিত্যে কে বিপ্লবী আর কে প্রতিবিপ্লবী, নিঃসংশয়ে এ থেকেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।[৪০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় দাদা শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায়,'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর আমরা সুযোগ মতো খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। বাবার এতে কোনো আপত্তি ছিল না– বরঞ্চ উনি এতে খুশি হয়েছিলেন। মনে হয় এই অভ্যাস নারায়ণ কলেজে পড়বার সময় বজায় রেখেছিল। নারায়ণ তখন কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা করছিল। ওঁর সঙ্গে আলোচনায় আমি জানতে পারি যে, ও কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিতে আস্থাবান এবং পার্টির সমর্থক। কিন্তু ও কখনো পার্টির সদস্য হয়নি। ছাত্রজীবনে বাবার কথা মনে রেখে, ইচ্ছে থাকলেও নারায়ণ কোনো ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি। এখন নিজের কাজ এবং লেখা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে ওর পক্ষে পার্টির কাজ করা সম্ভব নয়। ওঁর মতে, যদি পার্টির কাজ না করতে পারে তো সদস্য হওয়া অনৈতিক। তবে ও কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং সেই হিসেবে যতদূর সম্ভব পার্টির কাজে সাহায্য করেছে, করছে এবং করবে। তরপর নারায়ণ হাসতে হাসতে বলেছিল – তোমার মনে আছে ছেলেবেলার কথা–যখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে

আমাদের মধ্যে একজন সক্রিয় রাজনীতি করবো, আর তুমি ওটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। ১৯৪৮ সালের পরে 'রনদিভের সময়ে'ও কম্যুনিস্ট পার্টির উপর ওঁর বিশ্বাস অটুট ছিল। পরবর্তীতে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্তের উপর ওঁর বিশ্বাসের মূলে চীন দ্বারা ভারত-আক্রমণ ভয়ংকর আঘাত দেয়। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এই আঘাত ও সামলে উঠতে পারেনি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল। নারায়ণ কখনো মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হয়নি।'[৪১]

ব্রিটিশশাসিত বাংলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যুদ্ধকালীন সময়ে সৃষ্ট ১৯৪৩ সালের 'মন্বন্তর' যা পঞ্চাশের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। *The Great Bengal Famine* গ্রন্থে, এ মন্বন্তরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে 'An extreme and protracted shortage of resulting in widespread and persistant hunger, evidenced by loss of body weight and emaciation and increase in the death rate caused either by starvation or disease resulting from the weakened condition of the population'[৪২]

মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী রূপ বাংলার নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজজীবন এবং শাহরিক জীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। ভারত-ছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক পরিমণ্ডলে আবর্তিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যখন গ্রামীণ সমাজমূল পর্যন্ত বিস্তৃতির কৌশল সন্ধানে– তখন একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ– ঝড় ঝঞ্ঝা ও বন্যার ফলে শস্যনাশ। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের জন্য সরকারি খাদ্যভাণ্ডারের শস্য মজুদ, খাদ্য আমদানিতে ব্রিটিশ সরকারের বিঘ্ন সৃষ্টি–এসব ঘটনার অমোঘ পরিণতি পঞ্চাশের মন্বন্তর।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে ডিস্টিংসন সহ বি.এ পাশ করেন। অলটারনেটিভ বেঙ্গলি এবং ইলেকটিভ বেঙ্গলিতে তিনি বেশি নম্বরও পেয়েছিলেন। সে সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপকদের সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করেছিলেন। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। বি. এ. পরীক্ষা দেবার পর, ফল প্রকাশের পূর্বেই কোনো এক সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা প্রমথনাথের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর আগেই তাঁর সঙ্গে আত্মীয় রেণু দেবীর (রেণু মুখোপাধ্যায়) আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তাঁদের বিবাহ ছিল প্রেমজ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিয়ে বিষয়ে সরোজ দত্ত যা লিখেছেন তা হলো– 'গুঞ্জন কখন কিভাবে শুরু

হয়েছিল সে কথা না জানলেও, এক ফাল্গুনী সন্ধ্যায় সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন রেণু দেবী নিজেই। নারায়ণ তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দোল পূর্ণিমার রাত্রে নারায়ণ জানালেন রেণু দেবীকে– নারায়ণ ভালোবেসেছেন তাঁকে। রেণুদেবীর বয়স তখন বছর চৌদ্দ।

রেণু দেবীর বাবার নাম গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়ের নাম কুমুদিনী দেবী। বরিশালের কাছাকাছি রূপতালী গ্রামের মানুষ ছিলেন গোপালচন্দ্র। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় রেণু দেবী আশৈশব পিত্রসান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। মাতুলালয়ে কেটেছে তাঁর প্রথম জীবন। নারায়ণ ব্রজমোহন কলেজে পড়তে এসে সেখানেই ছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের প্রাথমিক পরিচয়। পরবর্তীকালে সে পরিচয় দু'জনকে নিকট সান্নিধ্যে এনেছে, নারায়ণ চিঠিও লিখেছেন কিশোরী রেণু মুখোপাধ্যায়কে। তারপর ১৯৩৮ সালে বি.এ. পরীক্ষায় সাফল্যের আনন্দ, পিতৃবিয়োগের বেদনা এবং প্রথম প্রণয়ের অভিজ্ঞতায় আন্দোলিত নারায়ণ কলকাতায় আসেন এম.এ. পড়তে।'[৪৩]

বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে উঠেছিলেন শোভাবাজার স্ট্রীটের একটি মেসে (সময়টা ১৯৩৮ সাল)। সেই মেসে পেয়েছিলেন বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক)। এই মেসে থাকাকালীন নরেন্দ্রনাথ, নারায়ণ ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের কবিতা নিয়ে ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় *জোনাকী* পত্রিকা।

ছাত্র হিসেবে নারায়ণ মেধাবী ছিলেন। এম.এ. পরীক্ষার পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলিতে তিনি যথাযথ সাফল্য পেয়েছিলেন। অবশ্য প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও এম.এ. পরীক্ষা তিনি নির্দিষ্ট বছরে দেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে না পারার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কবি, সমালোচক, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র 'প্রিয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' নামক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন– 'নারায়ণ আমার সহপাঠী ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ. ক্লাসে আমরা একসঙ্গে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৩৮-৩৯ সালে। ১৯৪০ সালে আমি পরীক্ষা দিলুম, নারায়ণ দিল না। সে ১৯৪১ সালের নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যয়নে বিরতির কারণ হিসেবে পারিবারিক বিষয়কেই উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র–'হয়ত অনেক কারণের মধ্যে নির্ধারিত বছরে এম. এ. পরীক্ষা না দেবার অন্যতম প্রধান কারণ ১৯৪০ সালে রেণু দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৯৪০ সালের ২৬ বৈশাখ, বরিশাল টাউনের বাড়িতে।'[৪৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত এই পর্যায়ের জীবন সম্পর্কে হরপ্রসাদ মিত্র আরো জানান–'প্রথম বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কন্যা সন্তানের পিতা হন। তাঁর এম.এ. পরীক্ষার সময় রেণু দেবী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। মেধাবী ছাত্র বলেই সেই অবস্থায় নারায়ণ ফল খারাপ করেন নি। কন্যার নাম রেখেছিলেন বাসবী, জন্ম ১৯৪২ সালের ২৫ কার্তিক। বাসবী'র বয়স যখন ছ'মাস তখন তিনি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। একদিন যে উত্তরবঙ্গের আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতির মধ্যে তাঁর দিন কেটেছিল আবার তিনি সেখানেই অধ্যাপনার সূত্রে উপস্থিত হলেন। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৯৪২ সালে। সেখানে চার বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৪৫ সালে এলেন কলকাতায়।'[৪৫]

জলপাইগুড়িতে থাকাকালীন সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। সেখানে পরিচয় হয় আশা সান্যাল এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে। আশা দেবী সম্পর্ক যেটা জানা যায় তা হলো-'আশা দেবীর পিতার নাম ভরতচন্দ্র আর মাতা গোবিন্দ সান্যাল। কলকাতা প্যারীচরণ গার্লস স্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ সালে কলকাতা উইমেনস কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. পাশ করার পর আশা বেদী এম.এ. ভর্তি হন। এই সময়েই তাদের মধ্যে সর্ম্পক গভীর হয়ে ওঠে। প্রেমের এই সর্ম্পককে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে, তাঁর বাল্যবন্ধু, সহ লেখক, বর্তমানে তার মামাশ্বশুর নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জলপাইগুড়ি যান তখন নারায়ণ তাঁর কাছে আশা দেবীকে বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মাস কয়েক পরে নারায়ণ রেণু দেবীকে সরাসরি লেখেন। চিঠিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়–তিনি ও রেণু দেবী অর্থাৎ 'তাঁদের দুজনের মাঝে আর একজনকে স্থান দেবার কথা উল্লেখ করেন।'[৪৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ ছেড়ে জুলাই মাসে কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এই সময়েই আশা দেবীকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিবাহিত জীবনের শুরু। আশাদেবী এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান অরিজিৎ বাবলু'র জন্ম হয় ১৯৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি। আশাপূর্ণা দেবী অধ্যাপিকা হিসেবে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে কলকাতার রামমোহন কলেজে যোগ দেন। ঐ বছরই আশাপূর্ণা দেবী *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টোরেড উপাধি লাভ করেন।

কলকাতায় আসা এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হবার পর থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যথার্থ কর্মজীবন শুরু হয়। এই সময় থেকেই তাঁর প্রকৃত সাহিত্য চর্চারও সূত্রপাত। তখন থেকেই তিনি যেমন বড়োদের কাগজে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তেমনি সমানতালে ছোটদের পত্র-পত্রিকাতেও লিখতে থাকেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *উপনিবেশ* (প্রথম খণ্ড) ১৩৪৯-৫০ সালের *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় (১৯৪২-৪৩) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়–এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। প্রথম লেখা উপন্যাস *তিমির তীর্থ*, যদিও তা প্রথম পত্রস্থ হয় ১৩৫১ সালে শারদীয় *দৈনিক কৃষক* পত্রিকায়। বইটি বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ১৩৫১ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন– '*তিমিরতীর্থ* লিখেছিলাম ছাত্র-জীবনে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। নানা কারণে লেখাটি এতদিন তিমিরেই নিহিত হয়েছিল। কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক লেখাটিকে উদ্ধার করে শারদীয় *দৈনিক কৃষক* (১৩৫১)-এ পত্রস্থ করেন।'[৪৭]

জলপাইগুড়িতে অবস্থান কালে *উপনিবেশ*-এর প্রথম দুটি খণ্ড (প্রথম খণ্ড ১৩৪৯-৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫০-৫১) প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় খণ্ড-র শুরু জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে হলেও, শেষ হয়েছে কলকাতায় আসার পর। *তিমির তীর্থ* যখন লেখা হয় তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। জলপাইগুড়িতে থাকাকালীন সময়ে তিনি বিখ্যাত কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন– 'বীতংস' (শারদীয় ১৩৪৯), 'নক্রচরিত' (শারদীয় ১৩৫০), 'হাড়' (১৩৫১), 'পুষ্করা' (১৩৫২ অগ্রহায়ণ), 'দুঃশাসন' (ফাল্গুন ১৩৫১) ইত্যাদি। এছাড়া বেশ কিছু কবিতাও লেখেন।

কলকাতা আসার পর থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যেমন প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিবৃদ্ধি হতে থাকে তেমনি একে একে তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাস *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী*, ১৩৫২ সালের ১ ফাল্গুন- ডি.এম লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। *স্বর্ণসীতা* উপন্যাস বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ১৩৫৩ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৪৬) প্রকাশিত। *সূর্য-সারথি* উপন্যাস ফাল্গুন ১৩৫৩ কলকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। *বৈতালিক* প্রকাশিত চৈত্র ১৩৫৪, বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *বীতংস* (১৩৫২ নববর্ষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স)। গ্রন্থটির ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন– '*বীতংস* আমার প্রথম গল্পের বই। রচনাগুলি নির্বাচনে বন্ধুবর অধ্যাপক বীরেন লাহিড়ী এবং বান্ধবী আশা দেবীর সহায়তা পেয়েছি।'[৪৮]

বীতংস গল্পগ্রন্থটি প্রকাশের দিনের একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা আশাদেবী প্রথম খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে আমাদের জানিয়েছেন এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের মানসিকতায় এই ঘটনাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ –'*বীতংস* যখন প্রকাশিত হয় তখন শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি বইটি নেবার জন্যে প্রকাশকের দোকানে গিয়ে দেখি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বসে : তিনি ওঁকে চেনেন না তখনও। –কাজেই বললেন : আহা কী বই– আর কী নাম : বীতংস, মানে কী বল তো : ওঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে তখন। কী যেন বলতে যাবেন, পাশের থেকে আর একটি স্নেহাদ্র কণ্ঠ ভেসে এলো– কেন? পাখী ধরা জাল : বলেই ওর দিকে ফিরে তাকালেন: "তোমার লেখা–আরে কপালে যে রাজতিলক জ্বলজ্বল করছে। তোমার পথ আটকায় কে?" বলেই, নিজেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওঁকে, অনেক আশীবাদ করলেন।

পথে নেমে এসে লেখক বললেন : 'এখন আমার মনে আর কোন গ্লানি নেই। উনি কে জানো? বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়।'[৪৯]

১৯৪২ সালে সফল রচনা *উপনিবেশ* প্রথম খণ্ড মুদ্রণের পর এক দশকের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়ে যায়। সাহিত্যিক হিসেবে তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য জীবনে যখন তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত তখন তিনি কৃতী অধ্যাপকরূপেও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। অধ্যাপক হিসেবে সাফল্য পেয়েছেন বলেই সিটি কলেজে থাকাকালীন তাঁকে সকাল, দুপুর ও রাত্রি তিন বিভাগেই পড়াতে হতো। সিটি কলেজে দশ বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৫৬ সালে পূজার ছুটির পরেই তিনি ফুল টাইমার হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের বাংলা বিভাগে, বিনা বেতনে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পরে তিনি তিনখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন– গ্রন্থগুলি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতারই পরিচায়ক। *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (আষাঢ় ১৩৩৬, ইং জুন-জুলাই ১৯৫৬) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ, প্রকাশক–কলকাতা ডি.এম. লাইব্রেরি। পরবর্তী প্রবন্ধগ্রন্থ *সাহিত্যে ছোটগল্প* (শ্রাবণ ১৩৬৩, জুলাই-আগস্ট ১৯৫৬) প্রকাশক–কলকাতা ডি.এম. লাইব্রেরি। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ছিল সংক্ষিপ্ত এবং ১৩৬৫ সালে আবার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ডি.লিট উপাধির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে ডি.লিট দেননি। ডি.ফিল উপাধি দিয়েছিলেন। তখন ছিল ১৯৬০ সাল। তাঁর থিসিস পেপারের পরীক্ষক ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন রায় এবং শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ১৯৬৭ সালে ১২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ তাঁকে রিডার পদে নিয়োগের কথা জানান।

অধ্যাপক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কিংবদন্তী স্বরূপ। শোনা যায়, বাল্যকালে তাঁর হাতে খড়ির সময়ে তিনি গৃহদেবী কালীর সামনে যশস্বী, আদর্শ শিক্ষক হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। শিক্ষকরূপে তাঁর বিপুল ও সর্বাত্মক খ্যাতি বিষয়ে তাঁর অগণিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুরা সকলেই উচ্ছ্বসিত। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন–'সিটি কলেজেই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক–তাঁর অসামান্য বাগ্মিতায় ছাত্রসমাজ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত। আমাদের কালের অধ্যাপকদের মধ্যে নারায়ণের মতো স্মৃতিশক্তি আর কারো দেখিনি। বক্তৃতার সময় বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনর্গল তুলনামূলক আলোচনায় তিনি ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ কবিতা পড়াতে পড়াতে মূল পারসী ভাষায় উদ্ধৃতি শুনে ছাত্র-ছাত্রীর বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়তো। কিম্বা বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস পড়াতে পড়াতে বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক থেকে সাম্প্রতিকতম কথাসাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণী আলোচনা শুনতে শুনতে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাপনা গৃহে সাহিত্যরসের আস্বাদন পেত। নারায়ণ নিজে একজন প্রথম সারির কথাশিল্পী ছিলেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কথাসাহিত্যের বক্তৃতাগুলিও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নিত হত। তাছাড়া ছাত্র সমাজের সমস্থ প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। স্বভাবতই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব ছিল সবচেয়ে আকষর্ণীয়।'[৫০]

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যই দেখা গেছে তাঁর ক্লাসে কখনই গোলমাল হয়নি এবং ছাত্রেও অভাব হয়নি। তিনি পড়াচ্ছেন হয়তো ছোটগল্প, কিন্তু নাটকের ছাত্ররাও এক অনিবার্য টানে তাঁর ক্লাসে এসে জুটত। ছাত্র-ছাত্রীদের সর্ম্পকে ওনার ধারণা ছিল উচ্চতর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করতেন, 'ছাত্ররা নিরেট নির্বোধ নয়–তারাও সব জানে।' আসলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি এতই বিস্তৃত ছিল যে তিনি অপরকে হেয় করে দেখতেই পারতেন না–এই ঔদার্যবোধ তাঁর চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একসময়ের ছাত্র ও সহকর্মী উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁকে যেভাবে দেখেছেন সেটা বর্ণনা করেছেন একটি লেখায়– 'শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে এসে সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহকর্মী। সহকর্মীরূপে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসেছি, গল্পে মেতেছি, রসিকতায় যোগ দিয়েছি, তিনি ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধান রাখেননি। দেখেছি, তাঁর

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সংস্কারমুক্ত মন এবং দুর্লভ সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি। স্মৃতিশক্তির পরিচয় ছাত্রাবস্থায় পেয়েছি। কিন্তু সহকর্মীরূপে দেখলুম যে, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙালা সাহিত্যের সর্ব যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সমান মনোযোগ এবং চর্যাগীতি, গোপীচন্দ্রের গান, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, কবিগান, মুসলমানী সাহিত্য সবকিছু থেকেই তিনি প্রয়োজন মতো উদ্ধৃতি দিয়ে স্তব্ধ করতে পারতেন তার্কিককে। আমাদের যখন নিয়মিত ক্লাস শেষ হয়ে আসছে সেই সময় একদিন টিউটোরিয়াল ক্লাসে হঠাৎ তাঁকে বলেছিলাম যে *বনবাণী* বইটি তো পড়ানো হয়নি, যদি একটু আলোচনা করে দেন তো উপকার হয়। নির্বিকারভাবে তিনি *বনবাণী*'র প্রত্যেকটি কবিতা ও গান ঠিক বইতে যেমন সাজানো আছে তেমনি পরের পর মুখস্থ বলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসৃষ্টি ও ঋতুবৈচিত্র্যের সুক্ষ্ম পরিবর্তনগুলোকে আশ্চর্যভাবে বলে গেলেন অথচ হাতের কাছে বইটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের কবিতা এবং পরবর্তীকালে অনেক কবির কবিতা, এমনকি আমাদের সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবের কবিতাও তিনি অক্লেশে মুখস্থ বলতেন। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও তাঁর মুখস্থ ছিল।'[৫১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক হতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর পরিবারের কতটা ভূমিকা ছিল সেটা জানা যায় না, তবে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যে আত্মপ্রকাশ তাতে বাড়ির পরিমণ্ডল পরোক্ষভাবে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। লেখকের বাবা পুলিশ বিভাগে চাকুরি করলেও তাঁর নেশা ছিল বইয়ের। তাঁর নিজস্ব একটি লাইব্রেরিও ছিল। বাংলাদেশে প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা সমস্থ পত্রিকা লেখকদের বাড়িতে আসত। বাবার প্রমথনাথের পড়ার নেশাও ছিল তীব্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই দাদার'ই লেখার হাত ছিল–বিশেষ করে সেজদা শেখর গাঙ্গুলী'র লেখা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বাবার সাহিত্যপ্রীতিও ছিল অসাধারণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক হয়ে উঠার ইতিবৃত্তের কথা জানিয়েছেন বেশ সহজ ও সরল ভাষায়–'বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিলো, মাসে মাসে বই আসত, বাংলাদেশের যত রকম 'দৈনিক', 'সাপ্তাহিক' আর 'মাসিক' পত্রিকার গ্রাহকই তিনি ছিলেন না–ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠকও। আমাদের মতো ছোটদের জন্যে আসত অধুনালুপ্ত *খোকাখুকু*, *সন্দেশ*, *মৌচাক*, *শিশুসাথী*। আজও আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকুরিতে সুনাম অর্জন করেছিল। পড়াশুনা ছাড়া তাঁর কোনো নেশা ছিল না, পান-তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং স্টুয়ার্ট মিল থেকে মিল্টন, সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি–তা একান্তভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে বর্ণপরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকালপক্বতাও অর্জন করেছিলাম কিছুটা। *খোকাখুকু*'র পাতায় আর মন বসত না, চুরি করে *ভারতবর্ষে*'র

পাতা থেকে পড়তাম। *শ্রীকান্তর ভ্রমন কাহিনী*–দেশবন্ধু দাশের *নারায়ণ* কাগজ থেকে পড়তাম 'স্বামী'। কতটুকু বুঝতাম, ঠিক জানি না– কিন্তু দোলা লাগত মনে।'[৫২]

শুধু পত্র-পত্রিকা আর পুস্তকই নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখক করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছিলো উত্তরবাংলার শস্য-শ্যামল-সবুজ জলভরা প্রান্তর ও প্রকৃতি। তার নদ-নদী, গ্রাম ও গ্রামের মানুষ, গ্রামের পথ-ঘাট, গাছপালা-এ সবই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মানস-প্রকৃতিতে কাব্য-ময়তার সঞ্চার করেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরো বলেছেন,'আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জরী কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে আছে–তার ওপারে বয়ে যাচ্ছে আত্রাইয়ের নীল ধারা, তারও ওপারে গ্রাম-ছাড়া রাঙা মাটির পথ-ঘন বাঁশ আর আখের বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যে দিক-চিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য রেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত। মনে হত, ওই অজানা পথটা আর এই রেখাগুলোর মধ্যে কী যেন নিবিড় একটা সাদৃশ্য আছে।'[৫৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন সবে লিখতে শুরু করেছেন, তখন মোটামুটিভাবে দিনাজপুর শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হয়ে গেছে। তখন তিনি জেলা এম.ই স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। সে-সময়েই তিনি শিল্পীর স্বভাবসুলভ আসক্তি মত জ্যামিতিক নিয়মে কাব্য চর্চা শুরু করে দিলেন।–

> আমি চিরকাল নিরালা মানুষ–কবিতা লেখায় হাত দিয়ে নিজেকে যেন আরো বেশি সংকুচিত করে ফেললাম। লেখা সম্বন্ধে যেমন সংশয় ছিল, তেমনি ছিল লজ্জা। অপরাধ বোধ তো ছিলই। চোরের মত লিখতাম–ছিঁড়ে ফেলতাম সঙ্গে সঙ্গেই।[৫৪]

সাহিত্য চর্চার সেই প্রথম দিনগুলোতে *আনন্দলহরী* সিরিজের রোমাঞ্চকর বইগুলি কিশোর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ প্রভাবিত করে। ক্রাইম নভেল তাঁর মাথার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। ফলে সচিত্র *চিত্র বৈচিত্র্য* পত্রিকায় কবিতা, সম্পাদকীয় ছাড়াও প্রকাশিত হলো রহস্য রোমাঞ্চিত একটি উপন্যাস–যার প্রথম কিস্তিতে দুটো ভয়াবহ নরহত্যা ঘটানো হয়েছিল, সেটাই ছিল লেখকের প্রথম গল্প বা উপন্যাস। তবে পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর এবং পাঠক স্বয়ং বালক শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

গোয়েন্দা-গল্প লেখার অভিজ্ঞতা থেকে সকৌতুক কিছু স্মৃতি উপহার দিয়েছেন লেখক। অতি শৈশবের সেই কবিতা–কবিতা কিম্বা গল্প লেখার খেলার দিনগুলোতে হঠাৎই এক পাঠক জুটে গেল– সুধীন ঘোষ, ডাকনাম বেন্ত। একদা রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের পুত্র সুধীন। সেই সুধীনকে *চিত্র*

বৈচিত্র্য থেকে উপন্যাসটা এক কিস্তি পড়ে শোনালেন বালক তারকনাথ গাঙ্গুলী। বন্ধু সুধীর মুগ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজের গ্রাহকও হয়ে গেল। 'তারপর থেকে কাগজ বেড়ে গেল। হস্তযন্ত্র থেকে দুকপি কাগজ মুদ্রিত হতে লাগল। কিন্তু রহস্যোপন্যাসটা আমার গ্রাহককে পাগল করে দিয়েছিল। তিনদিন পরে এসে বললে, না; বড্ডবেশী দেরি হচ্ছে। তোর কাগজকে সাপ্তাহিক করে দে। আমি তখন নতুন উৎসাহে দৈনিক দু'সংখ্যা করে বার করতে পারি–সাপ্তহিত তো কী কথা। আমার প্রথম ভক্ত পাঠকের অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। *চিত্র বৈচিত্র* সাপ্তাহিক হল।'[৫৫]

দেশবিভাগ পূর্ব সময়ের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক অধ্যায় বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মনুষ্যত্বহীনতার এক নারকীয় যজ্ঞে রক্তাক্ত হলো কলকাতা মহানগর ও নোয়াখালির জনপদ–রক্তের এই হোলি খেলা সম্প্রসারিত হলো বংলার বাইরের বিভিন্ন শহরে ও নগরে। নিকট অতীতে 'রসিদ আলি দিবস'কে কেন্দ্র করে কলকাতায় ঐক্যমত ও সাময়িক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিলো ছয় মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ রাজশক্তির ধূর্ত কূটনৈতিক চালে তা ভেঙ্গে গেল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির স্বার্থগত দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটলো ১৯৪৬ সালে আগস্টে বাঙালির এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

মন্বন্তরের এই মানবিক বিপযয় লেখক-শিল্পীদের মনকে দারূণভাবে আহত করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মানবিক হৃদয়, শিল্পী মনও কেঁদে ওঠে। নারায়ণের ছোটগল্প এই প্রসঙ্গে দূর্দান্ত সাক্ষ্য বহন করে। 'নক্রচরিত', 'দুঃশাসন', কিংবা 'পুষ্করা' গল্পগুলো লেখকের ক্রোধান্বিত মনের পরিচয় বহন করে। 'নক্রচরিত' গল্পে মহাজন নিশিকান্তের গোলাভরা শত শত চাল মজুদ থাকে। অতি মুনাফার আশায় সে এগুলো জমিয়ে রাখে। অন্যদিকে নিরন্ন মতি পাল না খেতে পেয়ে মরে, পরে তার বৌ পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। 'দুঃশাসন' গল্পে আড়তদার দেবীদাস যাত্রার আসরে 'দুঃশাসনের রক্তপান'-এর অভিনয় দেখে তার স্বরূপ ও পরিণাম সর্ম্পকে সচেতন হয়ে ওঠে। পাপের ফলাফল কী হয়-ভেবে সে ভীত বহ্বল হয়। শ্রমিকের হাতে ধারালো হেঁসোগুলো দেখে সে নিজের দুঃকর্মের ফলাফল ভাবতে থাকে। এখানে কহিনীর মধ্যে দিয়ে লেখক মানুষের মানবিক সর্ম্পকের চিত্ররূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া 'বীতংস', হাড়, টোপ গল্পগুলোর মধ্যেও মানুষের মৌলিক চাহিদাকে উপজীব্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি সার্থক পরিচিতি, যে তিনি ছোটদের লেখক। বাস্তবিক তাঁর সাহিত্যিচর্চা প্রথমে ছিল শিশুদের জন্য লেখা। পরে তিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। বিশু মুখোপাধ্যায় '*ছোটদের সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয়*' রচনার এক জায়গায় লিখেছেন–'যতদূর মনে পড়ে, ১৩৫৭ সালে *মৌচাক* মাসিক পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এবং বলতে দ্বিধা নেই, এর জন্যে উদ্যোগী ছিলাম আমি নিজে।'[৫৬] এ সর্ম্পকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন–

> বড়োদের জন্য গল্প লিখেছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। একটি আশ্চর্য সুন্দর মানুষ– ভালোবাসেন সাহিত্যকে। তেমনি ভালোবাসেন সাহিত্যিকদের। এসেই ফরমাশ করলেন, *মৌচাকে* গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্যে। ছোটদের গল্প। সে তো দু-একটা লিখেছি কৈশোরে। মফস্বলের ছেলে– পাঠিয়েছিলাম কলকাতার দুটো কাগজে। তাঁরা ছেপেও ছিলেন।[৫৭]

বিশুদার ফরমাশ মতো *মৌচাকে*'এ প্রথম যে গল্পটি লিখলেন তার নাম 'সভাপতি'–প্রকাশকাল পৌষ ১৩৫৩। ছোটদের জন্য তাঁর প্রথম সংকলন গ্রন্থ *সপ্তকাণ্ড* (১৩৫৫)। ১৩৬২ সাল প্রকাশিত হলো *ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প*। এরপর ধীরে ধীরে তিনি শিশু-সাহিত্যিক রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। লেখক কিশোর তথা সবার জন্য যে হাস্যরসের এবং মজার গল্প লিখেছিলেন তা সত্যি সত্যিই পাঠক মনকে ছুঁতে পেরেছিলো। একালের অন্য এক হাস্যরসের কৃতি লেখক লিখেছেন–'ছোটদের জন্যে আমিও কম বেশি হাসির লেখা লিখেছি বটে কিন্তু সে সব নারায়ণবাবুর লেখার কাছে দাঁড়াতেই পারে না– এ কথা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে, অত সহজে অত মজার লেখা আমি লিখতে পারি না। খুব কম লেখকই পারেন।'[৫৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার কাণ্ড কারখানা, সেইসঙ্গে ক্যাবলা-হাবুল–প্যালা–কুট্টিমামা–এদের কীর্তিকাহিনী বাংলাসাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়েছে। নির্মল হাস্যরসের স্রষ্টা যিনি তিনি নির্মল, সহৃদয় ও স্বচ্ছ মনের অধিকারী একথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্ম্পকে আরো বেশি সত্য। অজাত-শত্রু এই মানুষটি ছিলেন সবার প্রিয়, বিশেষ করে ছোটদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল সহৃদয়। এই কারণে যে কোন কিশোর পত্রিকা তাঁর লেখা চাইলেই পেয়েছেন। এমনকি, পূজার নানান বিশ্রী নানান নামী কাগজের দামী লেখার তাগিদের ভীড়ের মধ্যেও। সব সময় যে তিনি পয়সা নিতেন তা নয়– লেখাটা ছিল তাঁর ভেতরকার আনন্দ–বিশেষ করে ছোটদের পত্রিকা বিষয়ে তিনি ছিলেন সহৃদয়।

সাহিত্যের বেশ কয়েকটি শাখাতেই ঘটেছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ পদচারণা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কিশোরদের জন্য রচনা এবং রম্যরচনা। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কাহিনী রচনায়ও তিনি সার্থক। যদিও তিনি প্রকৃত শিল্পীর মতোই জানিয়েছিলেন–

> আমি মনে করি আমার শ্রেষ্ঠ বই এখনো লেখা হয়নি। নিজের কথা আজও সম্পূর্ণ করে বলা হয়নি– কবে যে হবে তাও জানি না।[৫৯]

সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের খুব বড় পুরস্কার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাননি। তবু তাঁর মধ্যে আছে *আনন্দ পুরস্কার* (১৯৬৪), *বসুমতি সাহিত্য পুরস্কার* (১৯৬৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত *সরোজিনি বসু* স্বর্ণপদক এবং কথাশিল্পী গল্প প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ গল্পকারের পুরস্কার। পুরস্কার না পাওয়ার ব্যাপারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন ক্ষোভ ছিল বলে জানা যায় নি। তবে তাঁর একমাত্র পুত্র অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন–'বাবাকে একবার একাডেমী পুরস্কার দেবার কথা উঠেছিল। বাবা নাকি বামপন্থী, মার্কসবাদী মতবাদে বিশ্বাসী এই অজুহাতে বাবার নাম খারিজ হয়ে যায়। সে বছরের পুরস্কার কমিটিতে একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকও ছিলেন। শুনেছি তিনিই নাকি বাবার নাম সুপারিশে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ফলে বাবার একাডেমী পুরস্কার পাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে এসবে কিছু যায় আসে না, বাবা সারাজীবন ধরে যা ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা পেয়ে এসেছেন তা যেকোনো পুরস্কারের থেকে অনেক বড়।'[৬০]

সাহিত্য চর্চার বাইরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনয়, আবৃত্তি ও সিনেমা জগতের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। খুব বেশি অভিনয় না করলেও অভিনয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ও মনোযোগ ছিলো। খ্যাতিনামা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণে বলেছিলেন– 'সিটি কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তীর বিভাগীয় এক অনুষ্ঠানে আমরা নারায়ণবাবুর *রামমোহন* নাটকটি মঞ্চস্থ করি। এই উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি চলেছিল। নারায়ণ বাবু ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের রিহার্সাল দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় নানারকম নির্দেশও দিয়েছেন। মাস্টারমশাই *রামমোহন* ছাড়াও বেশ কিছু নাটক এবং চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্যিকের করা সেসব চিত্রনাট্য অনবদ্য স্বাদুতা। একবার কলেজের শিক্ষক মশাইয়রা মিলে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন– মাস্টারমশাই সেই নাটকে দারুণ অভিনয়ও করেছিলেন।'[৬১]

পুত্র অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও পিতার অভিনয় প্রিয়তা নিয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন– '*ভাড়াটে চাই* নাটকে সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এই নাটকে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব

বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের *বৈকুণ্ঠের খাতা*'য় বাবা তিনকড়ি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া বহু ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তিনি। সে সময়কার অনেক চিত্রপরিচালক বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাদের অনুরোধের চাপ এলে দেখেছি অনেক সময় রাত জেগেও বাবাকে চিত্রনাট্য রচনা করতে।'[৬২]

সফল কথাসাহিত্যিক হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পুরো জীবনে মোটামুটি দুইবার বড় ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এর একটি দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে। এবং আর একটি 'শিল্পের স্বাধীনতা' শীর্ষক *দেশ* পত্রিকায় লেখাটির জন্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রথম স্ত্রী এবং দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে কিছু বিতর্কে পড়েছিলেন এবং এগুলোর দ্বারা মানসিকভাবে আহত হন। গবেষক সরোজ দত্ত'র প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়–'পারিবারিক জীবনে নারায়ণ কতটা মানানসই হতে পেরেছিল, সে কথা জানি না। বিবাহ বহির্ভূত কয়েকটি রমণীর আকর্ষণে সে যদি জড়িয়ে পড়ে থাকে, এতদিন পরে সে বিষয়ে কোনো পক্ষেরই খুঁৎ খুঁৎ করাবার কিছু নেই। তবে একথা ঠিকই যে, একজন লেখকের পক্ষে এসব চাঞ্চল্য তাঁর আসল কাজের বাধা হয়ে তাকে অনাবশ্যক অস্থিরতায় নিক্ষেপ করে তো বটেই।'[৬৩]

জীবনের শেষ পর্বে এসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক রচনার জন্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের কাছেই বিতর্কিত হয়ে উঠলেন যাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। 'আমরা জানি না শিল্পী আবার নতুন কিছু ভাবছিলেন কি না, কিম্বা জানি না তাঁর সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যাশা ভঙ্গের বেদনাবোধ দানা বেঁধে উঠেছিল তাঁরা কিভাবে পরে তাঁর বিচার করবেন। সে-সব চিন্তা ভাবনাকে ছড়িয়ে খুব দ্রুত চলে এল ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর, রবিবার– বাংলা ১৩৭৭ সাল, ২৩ কার্তিক,- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় কলকাতা *শেঠ শুকলাল করনানি* হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি নেরিব্রাল থ্রমবোসিস রোগে আক্রান্ত হন। শুক্রবার নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করে বাড়ি ফিরলেন অসহ্য মাথার কষ্ট নিয়ে। চারটি কোডোপাইরিন বড়ি গলাধঃকরণ করে লিখতে বসল *সুনন্দর জার্নাল*, তারপর? দীর্ঘদিনের অসর্তক অবহেলার ছিদ্রপথে এলো মৃত্যু। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিভা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'[৬৪]

সেই সময় (১৯৬৩ থেকে ১৯৭০, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত) তিনি নিয়মিত *দেশ* পত্রিকায় সাপ্তাহিক একটি জার্নাল লিখতেন– 'সুনন্দ' ছন্দনামে। তাঁর সেই জার্নালগুলো বাঙালির জীবন-ইতিহাস, এবং সমাজের দর্পন। ৭ নভেম্বর প্রকাশিত জার্নালের শিরোনাম ছিল 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা'। লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৪

Dhaka University Institutional Repository

'নভেম্বর, ১৯৭০। এর আগেই তিনি চিরবিদায় নেন। *সুনন্দর জার্নাল* লেখাগুলোতে যেহেতু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার নিজের নাম ব্যবহার করতেন না, ছদ্মনামে লিখতেন এবং *দেশ* পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষে'র সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনই শর্ত ছিল। এসব শর্ত মেনেই তিনি লিখতেন এবং *দেশ* ছাপত। পাঠকদের মধ্যে দুর্দান্ত কৌতুহল ছিল কে এই *সুনন্দ*। কিন্তু সেটা কখনও প্রকাশিত হয়নি। কিম্বা অফিসের কেউ জানত না। তিনি অন্য ঠিকানা ব্যবহার করে লিখা পাঠাতেন, লেকক সম্মানিও সেই ঠিকানায় আসত। তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিতেন। *দেশ* পত্রিকা ১৯৮৩ সালের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় সুজিতকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন- '১৯৬৩-র চব্বিশে আগষ্ট সংখ্যা থেকে অবিস্মরণীয় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নল' শুরু হয়ে রুচিবান বাঙালি পাঠককে মাতিয়ে দেয়। সুনন্দ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) অর্জন করলেন দুদান্ত খ্যাতি। ১৯৭০ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চিত্রশিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীর অনুমপ কার্টুনের সঙ্গে *দেশ*-এর পাতায় *সুনন্দর জার্নাল* বার হয়েছিল। সুনন্দ নামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন কে? এটা জানতে শুরু থেকেই পাঠককেরা অত্যন্ত আগ্রহী হন, নানাভাবে খোঁজ খবর নেন। কিন্তু পাঠক তো দূরের কথা *দেশ* দফতরের কোনো কর্মীও জানতের না। শুধু জানতেন সম্পাদক মহাশয় এবং জানতেন স্বয়ং লেখক এবং তাঁর পরিচিত কোনো এক ব্যক্তি। পাণ্ডুলিপিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যাতে তার হাতের লেখায় ধরা না পড়েন তার জন্য মূল লেখা থেকে ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে অন্য কাগজে কপি করে সেই কপি *দেশ* দফতরে পাঠাতেন। *দেশ* সম্পাদক এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে এক অলিখিত অথচ দৃঢ় দৃষ্টি হয়েছিল যে, সুনন্দর আসল নাম কাউকে জানানো যাবে না।(এদিকে) জার্নালেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চতুর্দিকে শুনে শুনে সুনন্দ বেচারি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। অবশেষে এক দূর্বল মুহূর্তে জার্নালের একটি কিস্তিকে, তিনি ক্ষীণভাবে আত্মপরিচয় দিয়েই ফেললেন- সুনন্দর ঠিকানা বৈঠকখানা এলাকায়। আর যায় কোথায়। হুশিয়ার পাঠকের হাতে ধরা পড়তে হল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সপরিবারে বৈঠকখানা অঞ্চলে থাকেন তা অনেকেরই জানা। কেনো তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে জার্নাল লিখতেন। সেটা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত *সরস গল্প* সম্পাদনা করেন। ৪৪৮ পৃষ্ঠার সংকলনে দীর্ঘ ২১ পৃষ্ঠার ভুমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি বাংলাসাহিত্যেও কৌতুকরসপুষ্ট রচনার ঐতিহাসিক পরিক্রমা সাঙ্গ করে দেখান–আমাদের ঐতিহ্য কেমন সমৃদ্ধ ছিল এবং বর্তমান কেমন ম্রিয়মান। *সরস গল্প*'এ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন-অধিকাংশ সাম্প্রতিক লেখকই বড়ো বেশি গম্ভীর–হাসিটাকে যেন তাঁরা লঘুচেতনাসুলভ চাপল্যের মতো দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গম্ভীর কঠিনতা, তিক্ত নির্লিপ্ততা আর দার্শনিক প্রৌঢ়তা ধীরে ধীরে বাংলাসাহিত্যের হাসির উৎসটাকে শুকিয়ে আনছে।

কিন্তু এ কথা বলতেই হবে ভবিষ্যতের পক্ষে এ লক্ষণ শুভ নয়। আমরা নিশ্চয় আজ কোনো স্থির সত্যের মধ্যে পৌঁছে স্থিতচিত্ত হয়ে যাইনি; বরং এই মুহূর্তের বাঙালী দেখছি–তার পুরনো সমাজ-জীবন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ–শ্রেণি-সংঘাতের রূপ তীব্রতর হচ্ছে। এই কালে ব্যঙ্গরচনার সম্ভবনা সীমাহীন। কিংবা এ-কালের বাঙালী লেখকরা ভাবছেন হাসিটা inferior art? ওতে তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তো সে-কথা ভাবেননি। পাঠক হিসেবে বাংলাসাহিত্যে নতুন রস-স্রষ্টার জন্যেই আমরা পথ চেয়ে রইলাম?'- এই রস সৃষ্টির প্রবণতা থেকেই সুনন্দর জার্নালের সৃষ্টি।'[৬৫]

সুনন্দ নিজেকে পরিচয় দেন 'কমনম্যান বাঙালী' বলে। তাই বাঙালী কমনম্যানের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশাই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। বাঙালী বলতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্থানের পূর্ববঙ্গের সকল বাংলাভাষী মানুষকেই বুঝিয়েছেন। (আমার কেবল অবিভক্ত বাংলাকেই মনে আসে–*অসুস্থ শরীরের ভাবনা*)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত হয়নি। *অসুস্থ্য শরীরের ভাবনা* নামক লেখাটিতে ব্যক্ত বাঙালীর অধঃপতনের আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত আর মশকরা থাকে না, অকৃত্রিম হৃদতার রসায়নে লেখকের মনের গভীরে উপলব্ধি স্বস্থিকর কথাটিই হয়ে যায়। 'অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় 'সুনন্দ'র পাতাটি যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালির অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।'[৬৬]

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছর কালপরিসরে ক্ষমতা-কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের বিস্তার ও সুসংহতি, পারিবারিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও আবর্তন, সক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানে ব্যর্থতা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সমস্যা, সমাজে বহুস্তরীভূত শ্রেণিসমূহের অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সংক্রমন, মৌলবাদী দলসমুহের উত্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপর্যয় সমাজের গতিধারাকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ধারা শিল্পে প্রভাব বিস্তার করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখনিতে মুলত উপজীব্য করেছেন রাজনীতিকে। রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে তিনি সমাজকাঠামোর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন উপন্যাসগুলোতে। উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রন, কাহিনী বিন্যাস কিংবা মনস্তত্ত্ব নির্মাণেও তিনি রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমসাময়িক সময়ে ঘটে যাওয়া বিষয়াবলী যেমন তাঁর উপন্যাসে কাহিনী হয়ে উঠে এসেছে তেমনি পূর্ববর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে তিনি সমকালীন বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তার কেন্দ্র ছিল রাজনীতি। রাজনীতিক পরে দ্বিতীয় বিষয় ইতিহাস এরপর প্রাধান্যের বিষয় মানুষ। তিনি একক ব্যক্তির চেয়ে সংঘশক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতি নিবিড়, দ্বন্দ্বপূর্ণ ও সময়ের একনিষ্ঠ স্বাক্ষর।

তথ্যনির্দেশ

১. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। মিলান কুন্ডেরা'র ডাইরী; পুস্তক বিপণী, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ জুলাই-২০০০। পৃ ১৩৭

২. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ১৩-১৪

৩. প্রভাস রায়চৌধুরী। *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পুস্তক বিতান, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ ১১

৪. সরোজ দত্ত। *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ১৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

৭. প্রভাস রায়চৌধুরী। *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পুস্তক বিতান, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ ১১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৯. সুকোমল সেন। *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৪৮। পৃ ১৭৩

১০. সিরাজ সালেকীন। *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প ঃ জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার*। প্রকাশক: ঐতিহ্য, প্রকাশকাল: ফাল্গুন ১৮১২, ফেব্রুয়ারি: ২০০৬, পৃ ১২৮

১১. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড। *শিলালিপি* (প্রথম অধ্যায়), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ ১২৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৫

১৩. সরোজ দত্ত। *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ১৪

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

১৫. প্রভাস রায়চৌধুরী। *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পুস্তক বিতান, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ ১৩

১৬. 'আসলে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য ছিল না, পার্থক্য ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকার নির্বাচনে। ভারতবর্ষের দুঃসহ দারিদ্রের জন্য উভয় দলই দায়ী করেছিলেন ইংরেজদের; তবে নরমপন্থীরা যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বেও যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেখানে তার অবসান ঘটানোতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, আর এইটেই তাঁদের মতে ছিল ভারতবর্ষের অর্থনীতির পুনর্জ্জীবনের পূর্বশর্ত।' অমলেশ ত্রিপাঠী; *ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব* (কলকাতা: ১৯৮৭), পৃ ১১৪

১৭. Sumit Sarkar; *The Swadeshi Movement in Bengal (New Delhi : 1977)*, pp 75-76

১৮. সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১)। প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০০/ রা। পৃ ১৬

১৯. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ১৮

২০. অধেন্দু মুখোপাধ্যায়, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পদসঞ্চার*, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮৪, পৃ ৮-৯

২১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শিল্পীর স্বাধীনতা*। *দেশ*, ২০ পৌষ-১৩৬৯। পৃ ৮৯৫

২২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪০৪/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। পৃ ১৯

২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী। *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭)। আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ 1397, মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৭, পৃ ৯০-৯৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১

২৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশে*। বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রোড, কলিকাতা-৯। চতুর্থ মুদ্রণ– পৌষ, ১৪০৪। উপন্যাসের ভূমিকা।

২৭. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ২১

২৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সমগ্র কিশোর সাহিত্য*, আমার কথা, আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট-১৯৯৬, পৃ ১৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ২০০

৩১. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ১৯৯৭। পৃ ২১

৩২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শিল্পীর স্বাধীনতা*। দেশ- ২০শে পৌষ, ১৯৯৬, পৃ ৮৯৫

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩

৩৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ ২১৮-২২৩

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৩

৩৬. প্রাগুক্ত, ২২৩

৩৭. জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃষ্ঠা ২২৪

৩৮. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০, পুস্তক বিপণি/ কলকাতা

৩৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *শিল্পীর স্বাধীনতা*। কোরাক, সাহিত্য পত্রিকা। বইমেলা- ১৯৯২, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা। তৃতীয় পর্ব, পৃ ২১

৪০. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*।'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য, নতুন সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৫৫, দ্র. তৃতীয় খণ্ড ১৯৮০, পৃ ১৫৮-১৫৯

৪১. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০। পৃষ্ঠা ১৩৯

৪২. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ, *Amartya Sen: Poverty and Famines*, ELBS editiob-1987

৪৩. প্রভাস রায়চৌধুরী, *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পুস্তক বিতান, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৬

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২০

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২১

৪৭. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৯৬, পৃ-১৬

৪৮. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী- লেখকের ভূমিকা'* অংশ। মিত্র ও ঘোষ। তৃতীয় মুদ্রণ, জৈষ্ঠ্য ১৩৯৫। পৃ ২

৪৯. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, গ্রন্থ পরিচয় অংশ। পৃ ৫৮২। তৃতীয় মুদ্রণ জৈষ্ঠ্য ১৩৯৫

৫০. ঐ, পৃ ৫৮৩

৫১. জগদীশ ভট্টাচার্য, *অন্তরঙ্গতম আত্মীয় নারায়ণ*। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ নভেম্বর ১৯৭০

৫২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *কি করে লেখক হলাম*। তৃতীয় পর্ব। কোরাক, বইমেলা-১৯২৯, সম্পাদক-তাপস ভৌমিক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বর্মণ। পৃ ১০২

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪

৫৪. *সমগ্র কিশোর সাহিত্য*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ। আগস্ট-১৯৯৬, পৃ ১৪

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

৫৭. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০, পুস্তক বিপণী/ কলকাতা। পৃ ১৩৯

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০

৫৯. *আমার কথা*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। তৃতীয় মুদ্রণ, জৈষ্ঠ্য ১৯৯৫

৬০. অরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, *আমার বাবা*, কোরাক, বইমেলা-১৯৯২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা। পৃ ৪০

৬১. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, *বলেছিলেন বড় অভিনেতা হবে*, কোরাক, বইমেলা-১৯৯২, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা। দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ৪৩

৬২. অরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, *আমার বাবা*, কোরার, পৃ ৪০

৬৩. সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী। পৃ ১৪০

৬৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, *অন্তরঙ্গতম আত্মীয় নারায়ণ*। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ নভেম্বর ১৯৭০।

৬৫. *সেরা রম্যরচনা*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদনা-আবদুশ শাকুর। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র। প্রথম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারি ২০০৬। ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১১

৬৬. অসুস্থ্য শরীরের জার্নাল, *সুনন্দর জার্নাল*। (অখণ্ড সংস্করণ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা- প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৮। কলকাতা পুস্তক মেলা-২০০২। পঞ্চম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস

শিল্পের জন্ম সমাজের গভীরতর সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিল্পীর চিন্তা গড়ে ওঠে যেমন তার শিক্ষা ও সমাজবোধের উপরে তেমনি চলমান সময়ও তার ভাবনা থেকে বাদ যায় না। যখন কোন শিল্পী সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন সেখানে সমাজের সত্য, সময়ের সত্য অবশ্যম্ভাবী রূপে ধরা পড়ে। কেননা 'সমাজসত্য স্রষ্টার মনোলোকে যে অনিবার্য আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তারই অন্তর-গরজে তাঁকে সৃষ্টির প্রয়োজনানুগ রীতিকে আবিষ্কার করতে হয়। জীবনের যন্ত্রণা, গতি, সংঘর্ষ, উত্থান-পতনের চলমান-রেখার সঙ্গে সমন্বিত হয়েই জন্ম হয় বিশেষ কালের শিল্পরীতির।'[১] 'উপন্যাস রচনা ও উপন্যাস পাঠ, দায়বদ্ধ কর্ম। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময় ও ইতিহাস, নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবনের মধ্যের দ্বান্দ্বিক সম্পটির্কে একটি টেকসই বা বয়ানে আকরিত করেন। যে আততি দ্বন্দ্ব-সংযোগহীনতা তিনি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজ সত্তার দেখেন, তাকে একটি বীক্ষাগত বিন্দু থেকে সংহতি দেন উপন্যাসে। বলা ভাল, বাস্তবের সঙ্গে নিজ চৈতন্যের সামঞ্জস্যহীনতাকে তিনি দূর করতে চান উপন্যাসের নির্মাণের সূত্রে। এই নির্মাণে ছায়া ফেলে তাঁর দেশের-সমাজের ইতিহাস-বর্তমান, ছায়া ফেলে তাঁর শ্রেণীর চৈতন্য ও বাস্তবের ইতিহাসে–ঔপন্যাসিক নিজ অভিজ্ঞতা ও মননে তাকে একটি আকরণে অনন্যরূপ দেন।'[২] একটি নিদিষ্ট সময়ের কথাশিল্পী বাস্তবতা, ইতিহাস এবং নিজের অভিজ্ঞতার বয়ানেই নির্মাণ করেন উপন্যাস।

কোন উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক বলবো সেটা নিয়ে আছে নানামত, নানা বিশ্লেষণ। মূলত রাজনীতি আর সময়ের পাঠের মধ্য দিয়ে উপন্যাস অর্জন করে এক রাজনৈতিক মাত্রা। 'প্রচলিতভাবে সেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল; কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গতঃ কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধের কারণে। অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে, অভিজ্ঞান সন্ধানে, জনসমাজের নির্মাণ-ভাঙ্গনের চেতনায়, এমন কি ধর্মীয় জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক অন্বেষণেও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক।'[৩] তাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে লিখিত হলেই তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায় না। বরং সব উপন্যাসই কোনো না কোনো ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পকির্ত থাকে তার সময়ের কারণে। বাস্তবতা বা সময় জড়িত থাকে বলে সেখানে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক কাঠামো এসে পড়ে, পাশাপাশি ব্যক্তি মননও বাদ যায় না। যদিও

রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকে ক্ষমতা দখল কিম্বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু উপন্যাসকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই বলা যায় না। উপন্যাস এক অর্থে ভাষা, শব্দের বয়ান। কোনো উপন্যাসই কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিবরণ নয়। সেখানে ব্যক্তিমানুষ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ নানাভাবে নানাদিক থেকে আসে। মিখাইল বাখতিন যেমন বলেন, 'The basic tasks of a stylistics in the novel are, therefore: the study of specific images of languages and styles; the organization of these images; their typology (for they are extremley diverse); the combination of images of languages within the novelistic whole; the tranafers and switchings of languages and voices; and their dialogical interrelationships'[৪]

সুতরাং কোন উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক বলবো আর কোনটাকে বলবো না সেটা এক বিতর্কের বিষয়। অনেকে রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রসঙ্গটিকে বুঝে থাকেন। রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কার্ল মাকর্স বলেছেন, 'political power is precisely the expression of antagonism in Civil Society'–মাকর্সের প্রজ্ঞায় ধরা পড়েছিল রাজনীতি বা রাষ্ট্রের মূল প্রোথিত সমাজ অর্থনীতিতে। গত তিন-চার শতাব্দী ধরে কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম ভারববর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি লেখেন–'গৃহবিবাদ, বাইরের শত্রুর আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, পরাধীনতা এবং পরপর দুর্ভিক্ষ–এমন ধরনের বিচিত্র অঘটনে দেশের বাহ্যিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধ্বংসস্তুপ পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।[৫] কার্ল মার্কস উৎপাদন কাঠামো অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই ক্ষমতা দখল বা শাসনতান্ত্রিক নীতির চেয়ে তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল সমাজে ভোগ ও বণ্টনের সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক। তাই তিনি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নয়, সমাজ, সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজকেই মূল হিসেবে ধরেছিলেন।

বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা উনিশ শতক থেকে জনসমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। রামমোহন রায়ের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এমনই। 'রামমোহনের এই আন্দোলন ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের ভেতর রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ অন্বেষণের সঙ্গেই যুক্ত।'[৬] পুরো উনিশ শতক জুড়ে কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এই জন সমাজেরই প্রবল

প্রতিরোধ। এমন কি পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনও অনেকটা তাই। ১৯০৫-০৮ এর স্বদেশী আন্দোলনে, এ ভাবনা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীর নেতৃত্বে তারই অনুপস্থিতি, যদিও ১৮৭০-এর দশক থেকেই এর একটি বিরোধ ধারা তৈরি হয়েছিল। এ ধারার একটি অংশ বাস্তবত পশ্চিমী রাজনৈতিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিকেই অনুসরণ করতে চায়। গ্রামসি, রাষ্ট্রের একটি সামাজিক দলের সমগ্র সমাজের উপর রাজনীতি ও সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই যে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সারকথা, এ কথাটিই জোরের সঙ্গে বলার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে জনসমাজ, এই জনসমাজের আমূল পরিবর্তনই রাজনীতির প্রধান কাজ। আর ঔপন্যাসিকরা রাজনৈতিক উপন্যাসের মাধ্যমেই সেটা করবার চেষ্টা করেন। বৃটিশ-কর্তৃত্ব যে পুরোনো জনসমাজ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে তেমন নয়। যদি তখন বৃটিশ কর্তৃত্বের কারণে সামগ্রিক সমাজের ভাঙ্গন আসতো তাহলে পরবর্তী পরিস্থিতি অন্যরকম হত। কিন্তু ঔপন্যাসিক রাষ্ট্রগত ও অর্থনীতিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও আপস সৃষ্টি করে এক পঙ্গু ও জটিল বাস্তব। জনসমাজ বিকৃত ও পঙ্গু এই সমাজের এদেশীয় নেতারা ফলত দেশবিচ্ছিন্ন, তাদের ভাবনার জগৎও তাই প্রচলিত অর্থে 'আধুনিক' আসলে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ জনসমাজ বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা কাটাতেই প্রধান ও স্থায়ী রাজনীতি ছিল। সুতরাং এটা কেবল কাঠামোগত কাজ নয়। গ্রামসী সুন্দরভাবে বলেছেন, জনসমাজকে দেখতে হবে as superstructural primary moment' আর রাজনৈতিক সমাজ 'Secondary superstructural moment'। রাষ্ট্রীয় সমাজ দখলের প্রতিক্রিয়ার যে রূপান্তর আমরা কাজ করতে দেখি সেটার প্রধান কাজ জনসাধারণের।

উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালীর মানসিক উন্নতি যুক্তিবাদী ছিল না। 'উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল সর্বাংশেই প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাববাদী।[৭] দেশাত্মবোধ হিন্দু বাঙালীর একটা সাংস্কৃতিক চেতনা বা ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতীয়তাবাদ হিন্দু বাঙালীর একটা সাংস্কৃতিক চেতনা বা ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতীয়তাবাদ তখন রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু একটা উপনিবেশের বুর্জোয়াদের অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির পক্ষে পুরোপুরি বুর্জোয়া হওয়া সম্ভব নয়। অর্থ-সম্পত্তি কিম্বা মজ্জাগত কোনোদিক থেকেই তা সম্ভব নয়। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজের চরিত্র অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল কিছুটা সামন্তবাদী আর কিছুটা বুর্জোয়া শ্রেণি মিশ্রত। ধর্মীয় আবরণে মোড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রথমে শ্রেণি আন্দোলন এর পরে সুবিধাবাদী আন্দোলনের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

সামজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উন্মেষ ও জাগরণে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ সৃষ্টি উপন্যাসের দ্বারখুলে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা এবং উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা। 'বঙ্কিমচন্দ্র মিলের উপযোগবাদ এবং কঁতের দৃষ্টবাদের প্রভাবে 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' (১২৭৯) ও 'সাম্য' (১২৮০-১২৮২) নামে দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে 'সাম্য'র মত সম্পূর্ণ নতুন এবং তার মূল মতের পরিপন্থী'[৮] বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের পক্ষ নিয়েছেন। বলেছেন–

> যাহারা জমিদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদের বিরোধী। জমিদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। ....এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমিদারদিগের হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিনজনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধনের জন্য যত্ন করেন। জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেই রূপ করুণ সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না– জনসমাজকে জানাইতেছি না, জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাহাদিগের অসাধ্য নহে।[৯]

আনন্দমঠ (১৮৮২) বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী ধারণার মুখপত্র। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'[১০] *আনন্দমঠ* উপন্যাসে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সমর্থন নেই। বরঞ্চ ইংরেজ আগমনে সংগ্রামকে বলপূর্বক থামিয়ে দেয়া হয়েছে। উপন্যাসটিতে একদিকে রয়েছে পরাধীনতার বেদনায় স্বাধীন হবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে উল্টো প্রশস্তি। এই আপাত বৈষম্যমূলক আপসধর্মিতা সে যুগের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মানস-চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালীর যোগ্য প্রতিনিধি। *আনন্দমঠ*-এর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ বিদ্বেষের চাইতে মুসলমান বিদ্বেষই বরং অধিক চোখে পড়ে। যেমন–'কাপ্তেন সাহেব তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছো।'[১১]

আনন্দমঠ রাজনৈতিক উপন্যাস কিনা এটা নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন সময়ে এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় রাজনীতি ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন–

> এটি যে রাজনৈতিক উপন্যাস এ সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ববাদী সম্মত; দেশ ও মাতার সমীকরণ, সশস্ত্র লড়াইয়ের চিত্রলে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বাভাস এই উপন্যাসে আছে। এমন সিদ্ধান্ত অনেকেই নিয়েছেন। কিন্তু আমরা যে মানদণ্ড ব্যবহার করছি, সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের ভাঙ্গন ও এ সম্পর্ককে চেতনা এবং পুনর্নির্মাণ ভাবনা– যে উপন্যাসের আকরণে বয়ানে স্পষ্ট তাকেই বাংলায় উপন্যাস রাজনৈতিক বলব তার বিচারে কি *আনন্দমঠ*কে কিম্বা বঙ্কিমের কোন লেখাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায়? [১২]

আনন্দমঠ-এর শেষাংশের সংলাপ বিশ্লেষণ করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বঙ্কিম বুঝি ইংরেজ বিরোধিতা প্রচার করতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে তা ভুল প্রতীয়মান হয়, যেমন, 'সত্যানন্দ বলিলেন, হে মহন্নত! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজ রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' মহাপুরুষ বলিলেন, 'ইংরেজ এক্ষণে বণিক–অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে না রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ হইবে না'[১৩]

বঙ্কিম *আনন্দমঠ* ছাড়াও *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৪৮), *সীতারাম* (১৮৮৭) প্রভৃতি উপন্যাসে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে রূপ দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সে সবসময় একটি শত্রু খোঁজে। তিনি ইংরেজকে শত্রু বলে মনে করেননি। শত্রু মনে করেছেন মুসলমানদের। *আনন্দমঠ* উপন্যাসটি মূলত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় ১৮৮২ সালে। 'বঙ্কিমের সময়কাল ১৮৮০-র দশকে মডারেট রাজনীতিবিদরা ঔপনিবেশিকতার সমালোচনা করলেও নিজ শ্রেণী অবস্থান ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় বৃটিশ শাসনের বাইরে কিছু ভাবতে পারেননি। তবে তাঁরা অনেকেই বাইরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আর মানেন না।'[১৪]

জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে যদিও বঙ্কিমচন্দ্র কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলোতে এমন একটি উপাদান প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, যা উনিশ শতকে জনসমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসগুলো যে সময়কালে বিধৃত তার সীমা (প্রায় *দুর্গেশনন্দিনী* থেকে *সীতারাম* পর্যন্ত), উপন্যাসগুলীর মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে বা দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে

শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দী সময় পর্যন্ত সময়কালকে পটভূমি করেছেন। এর বৃহৎ অংশই হিন্দু-মুসলমানের কথা।

বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি এবং সামন্তবাদী ধর্মপ্রীতির মধ্যে বাস্তবিক কোনো বিরোধ নেই। কেননা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যে স্বার্থগত সমঝোতা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রত্যক্ষ ফল। বঙ্কিমের মধ্যে বুর্জোয়া চেতনা তাঁর কালের চেতনার তুলনায় নিঃসন্দেহে অগ্রসর ছিল। তার প্রমাণ গদ্যের প্রবহমানতায় ও তাঁর উপন্যাস রচনাতেই সমুপস্থিত। বঙ্কিমের আগে *নববাবুবিলাস* বা *আলালের ঘরের দুলাল* এসব রচনায় ব্যক্তি চরিত্র প্রাধান্য পায়নি। প্রাধান্য বিস্তার করেছে সমাজচিত্র। ব্যক্তি ছিল সমাজের প্রতিনিধি। বঙ্কিমই প্রথম ব্যক্তিকে এমন একটা ব্যক্তিত্ব দিলেন যে ব্যক্তিত্ব তখনও তাঁর সমাজে বিকশিত হয়নি এবং এই মানবিক ব্যক্তিত্বে আস্থা বুর্জোয়া মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত। তবে তাঁর রচনায় আমরা ভক্তিবাদের যে প্রাবল্য দেখি তা সামন্তবাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র্যের প্রতীক। 'বঙ্কিম রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু গতি ও স্থিতির সেই সময়কার এই বৃহত্তর সংকটের সম্মুখীন কোন সচেতন বুদ্ধিজীবীর মত তাকেও হতে হয়েছিল। ঐ মর্ডারেটদের মত তিনিও কোন পথ পাননি। কারণ জনসমাজ থেকে তিনিও ছিলেন বিচ্ছিন্ন। বঙ্কিম বাইরের পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্বকে মনে করেছিলেন বেঁচে থাকবার উপায়, তিনিও বেন্থাম-মিল-স্পেন্সার পড়া ইংরেজীশিক্ষিত, তবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। কিন্তু সময়ের দায়, ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতার দায় তাকে বহন করতে হল।'[১৫]

বঙ্কিমের অনন্য সৃষ্টি *দুর্গেশনন্দিনী*, ১৮৯৩ সালের প্রকাশিত তাঁর কোনো উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকে বৃহত্তর জনসমাজের সংযোগের দিকে নিয়ে যাননি। বঙ্কিম বলেন, 'ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পুর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' ইংরেজ আসলে বাহুবল কেন লুপ্ত হয়েছে– তার ব্যাখ্যা বঙ্কিমের নেই। এসব আত্মদর্পণেই বঙ্কিম দেখতে পান না কৃষক বিদ্রোহ, ৫৭- এর মহাবিদ্রোহ। *দূর্গেশনন্দিনী*র পরে *চন্দ্রশেখর*, *রাজসিংহ* ইত্যাদি উপন্যাসেও জনসমাজবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকেই গ্রহণ করেন। 'সেটা আমাদের জাতীয়তাবোধ ও রাজনীতির সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। সিভিল সোসাইটির পুনর্নির্মাণই যে এখানে রাজনৈতিক সমাজ গঠনের প্রধান কাজ, একথা বিস্তৃত হয়ে ইতিহাসে সহজ পথ নিতে চেয়েছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত। তাদের কাছে ঐ পুনরুত্থানবাদী বঙ্কিমই জনপ্রিয় হলেন।' [১৬]

লিবারেল ও নারদবাদী দুই ইউটোপিয়ার বাইরে এসে মূর্ত দেশ ও মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে ভবিষ্যতের রূপ। উনিশ শতক জুড়ে ধর্মীয় প্রশ্ন ও সংঘাত, সমাজসংস্কার ১৮৭০এর দশকের সংকট ও হিন্দুবাদী উত্তরণের প্রচেষ্টা– বাঙালী নাগরিক শিক্ষিত সমাজের এসব কিছুই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। উনিশ শতক শেষ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপ প্রাচীন ভারতবর্ষ বা ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, কোনোটাই মুক্ত ভারতবর্ষের মডেল হতে পারে না। তবে এই কথা স্পষ্ট করেই বলা যায়–রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভারত ইতিহাসের মূলসূত্র রাষ্ট্র নয় সমাজ। কোন সমাজ-না বৃহত্তর প্রাচীন জনসমাজ।'[১৭] চিন্তার মধ্যে অনেক গরমিল থাকলেও এর একটা আভাস তিনি পরবর্তীকালে গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলেন বলেই, গান্ধীকে মহাত্মা বলতে তাঁর আটকায়নি। আবার রশিয়ায় গিয়ে যে তিনি ঈপ্সিতকে পান, তার মূলেও ঐ জনসমাজের জাগরণ, পুনর্নির্মাণের বিপুল প্রয়াস। ১৯০৮-০৯ নাগাদ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে বলেন– 'কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে, তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম সমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার বশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালবৈ মন্দ হয় না– কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক তাহা আমাদের নহে, তাহা আমাদের সমস্থ প্রয়োজন ঠিকমত পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিকমত হইতে পারে না।'[১৮] রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র জনসমাজের সঙ্গে সংযোগে, নির্মাণেই, রাজনৈতিক মুক্তি আসবে। ব্যক্তির মুক্তি ও স্বদেশের মুক্তি ও স্বদেশের মুক্তির ঐ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত জনসমাজের মুক্তি ঘটলেই পাওয়া যাবে। গভীর রাজনেতিক বোধ থেকেই তিনি রচনা করলেন *গোরা* –একটি অসামান্য রাজনৈতিক উপন্যাস, যা আমাদের মুক্তি আকাঙ্ক্ষারই এক রূপক।

গোরা উপন্যাসটির অব্যবহিত পটভূমিতে আছে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের এই প্রথম গণ-আন্দোলন, প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক প্রতিবাদের সদর্থক ও নঞর্থক দিকের প্রত্যক্ষবোধ *গোরা* উপন্যাস বয়ানে ছায়া ফেলেছে। উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে। *গোরা*র সময়কাল প্রায় দু'আড়াই দশক পিছিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে তার ডায়ালগকেই মূর্ত করেছেন। 'উপন্যাসের মুখ্য-গৌণসহ সব চরিত্রই ডায়ালগিক্যালি সর্ম্পকযুক্ত। একটি দৃষ্টিকোণ আর একটির বিরুদ্ধে, একটি মূল্যবোধ আর একটির বিপরীতে একটি স্বর আর একটির বিপ্রতীপে অবস্থিত। এই মিথস্ক্রিয়া এই দুটি ভাষা ও বিশ্বাসের মধ্যে

আততি, বাখতিনের ভাষায় বলতে গেলে– Permits snothorial intentions to be realized in such a way that we can acuteiy sense their presence at every point in the work.'[১৯] উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের কথা বা ভাষা ,'is the speceh of another in another language.– এটাই রাজনৈতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। এখানে লেখক তৃতীয় পক্ষ, গোরা-বিনয়, গোরা-হরান-বিনয়, গোরা-পরেশবাবু : এরকম নানা তর্ক-বিতর্ক, ডায়ালগের মধ্যে দিয়ে একটি জগৎ তৈরি করেছে, যাতে ঐ সময়ের বৃহত্তর ঐতিহাসিক চরিত্রটি ধরা পড়ে।

উপন্যাসের কতগুলো পারস্পরিক বক্তব্য তুলে ধরলে এগুলো আরো স্পষ্ট হয়। যেমন : পরেশবাবু বলেন, 'একটি বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কখোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব? মানুষকে যারা ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না। অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।'[২০] তিনি আরো বলেন,– 'নীচু জাতকে দেবালয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যদি দেবাতার ক্ষেত্রেও আমাদের সাম্য না থাকে তবে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কী আর না থাকলেই কী?'[২১] অর্থাৎ পরেশবাবু মূর্তরূপে সাম্যকে চান, জ্ঞানের তত্ত্বে নন। গোরার মা 'আনন্দময়ী'র যে মাতৃরূপ সেটা তিনি দেশের মাতৃরূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গোরা বাংলা উপন্যাসের একটি উত্তরণ। এই উপন্যাসে ভারতবর্ষকে গভীরভাবে পাওয়া যায়, সেটা রাজনৈতিক। ১৯৪৭-এর আগে উপন্যাসের তাৎপর্য রাজনৈতিক, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন– 'জাতীয় জীবনের গভীরে প্রসারিত ব্যক্তি প্রতিভার শিকড়–অন্বেষণা-ব্যক্তি ও জাতীর যে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রশ্নের সামগ্রিক জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি, *গোরা* বাংলার জীবনে সেই প্রাথমিক প্রশ্নের উত্থানের সম্পূর্ণ একক।'[২২] এরই উত্তরাধিকার ছড়িয়ে আছে পরবর্তী মহৎ রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাসুলিবাঁকের উপকথা* বা *গণদেবতা*, সতীনাথ ভাদুরীর *ঢোড়াই চরিতমানস*-এ। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় আরো বলেন, '*গোরা*র প্রশ্ন ও কাহারদের ছন্দিত পেশন প্রাণশক্তির একাগ্র আশ্লেষ বাংলার ভবিষ্যৎ জীবনের রূপক। শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক উদ্ধারের যে পথপ্রদর্শন *গোরা*য় লক্ষ্য করা যায়, ১৯৬৭-৭১ এ তারই অনুসৃতি। সুচরিতার চোখে গোরা যে দূর আকাশের তারা দেখে, তারই পরবর্তী ধাপ আধুনিক রাজকন্যার রূপক–শোষণের অবসানে সুচরিতার, ভারতবর্ষের উদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ *গোরা*য় দেখিয়েছেন শিক্ষিত শ্রেণীর বৃহত্তর জনসমাজ, গ্রামের কৃষক

মানুষ সম্পর্কে অবজ্ঞা-উদাসীনতা-অজ্ঞতা, আর *ঘরে-বাইরে*-তে দেখিয়েছেন এই শ্রেণীর আন্দোলনের ফলাফল বৃহত্তর সমাজে কি প্রভাব ফেলে। ওপর থেকে বা শুধু বাইরে আইডিয়ার ধোঁয়ায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ঐ প্রত্যক্ষ বাস্তবকে বোঝে না, তাকে বিকৃত করে তোলে।

নিখিলেশের আত্মকথায় *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে পঞ্চু। পঞ্চু মূর্তিমান বাস্তব সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। শিক্ষিত শ্রেণির রাজনৈতিক উন্মাদনার চাপেও পঞ্চুর অস্তিত্ব বিধ্বস্ত। এই বিধ্বস্ততা ঔপনিবেশিক ভাঙ্গনে, জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে বিপর্যস্থ। নিখিলেশ পঞ্চুর খবর রাখে, বছরে অন্তত চারমাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না। নিখিলেশ তাকে কিছু দান করতে চেয়েছিল, কিন্তু মাস্টারমশাই বাধা দেয়, কারণ দান দ্বারা মানুষকে নষ্ট করা যায়, দুঃখকে নয়– 'আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্থ দেশের স্তন আজ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।' এখানেই গোরা আর নিখিলেশের পার্থক্য, গোরাকে তিনি সরাসরি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু নিখিলেশকে শুধু মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। গোরা সবসময় এগিয়ে যেতে চেয়েছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হতে চেয়েছে। আর *ঘরে-বাইরের* নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করাতে চেয়েছেন যেন ঝোড়ো সমুদ্রের মধ্যে অচঞ্চল বাতিঘরের মতো। আবার *যোগাযোগ* (১৩৩৬) উপন্যাসের মধূসূদন উঠতি বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব করলেও সামন্তবাদ থেকে বের হতে পারেনি। মধূসূদন ইংরেজের বিরোধিতা করে, ইংরেজদের আশ্রয়ে দালালি করে পয়সা করে। অন্যদিকে *শেষের কবিতা* উপন্যাসের অমিত রায়-এর মধ্যে এক ধরনের বুর্জোয়া রুচি শৃঙ্খলা বোহেমিয়ানতা আছে কিন্তু সে সবের অর্থাৎ কোনো কিছুরই কোনো গভীরতা নেই। আবার *চতুরঙ্গ* উপন্যাস বহুমাত্রিক এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কিম্বা যে কোনো বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। *চতুরঙ্গ*-এ এক মুক্তির কথা প্রচণ্ড ভাবে এসেছে – শচীশের সত্য ও মুক্তির যন্ত্রণামুখর অস্থির অন্বেষণের পাশে ও সংলগ্নতায় দামিনী ও শ্রীবিলাস সে মুক্তির চিত্রকল্প আঁকে। তা আমাদের বিবেচনায় অবশ্যই রাজনৈতিক মাত্রাযুক্ত।'[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংরেজকে অভূতপূর্ব সাহায্য করে। ফলে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এ সময়ে সন্ত্রাস-দমনের সূত্র ধরে অন্য আন্দোলনকে ধামাচাপা দেবার জন্য ঐ বছর ১৮ মার্চ 'রৌলটেবিল' আইনে পরিণত হয়। প্রতিবাদে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও হরতাল পালিত হয়। ইংরেজ সরকার এর জবাব দিলেন ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ বড়লাট চেমসফোর্ডকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক চিঠিটি লেখেন, সঙ্গে 'স্যার' খেতাব ত্যাগ

করেন। গান্ধীর অসহযোগের সঙ্গে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হয়। এরই ভেতরে ভেতরে চলে সন্ত্রাসী কাজ। ১৯২৮-২৯ সালে রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলিতে আবার দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালের জানুয়ারিতে লাহোর কংগ্রেসে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল সমুদ্র তীরে লবণ উৎপন্ন করে স্বয়ং গান্ধী আইন অমান্য করলেন এবং কয়েকদিন পরেই ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণের ফলে ভারতবাসী আরো সশস্ত্র হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে রাশিয়া যান। রাশিয়ার জনগণের শিক্ষা, সামাজিক শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক বিস্তারে তিনি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন। ফিরে এসে তিনি শিক্ষা ও সমবায়ী পন্থায় গ্রামীণ জীবনের উজ্জীবন করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়ার অনুকরণে তিনি এই সমাজে নানা ধরনের কাজ করবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু উপলব্ধি করেন–'রাষ্ট্রক্ষমতা ভিন্ন সমাজে কল্যাণের যে কোনো প্রচেষ্টা অতিশয় তৃষিত মাটিতে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মতো বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। দাতব্য করে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় এককভাবে কোনো জমিদারের জমিদারী ত্যাগ করে, ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করা। এমন কি সে জমিদার যদি রবীন্দ্রনাথও হন, তবেও না।'[২৪]

চতুরঙ্গ উপন্যাসে রাজনীতি-ধর্ম-সাহিত্য তাদের ভিন্ন বর্গত্ব হারায়ে আবার এক হয়ে যেতে চায়। ধর্ম জিজ্ঞাসাও এখানে রাজনীতি জিজ্ঞাসাই, দেবীমূর্তিও পলিটিকসের দেবী। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে শচীশ প্রথমে ইতিহাসে মুক্তি চায়, পায় না, এরপরে ইতিহাসহীনতাতেও পায় না। জীবনবাদী দামিনী এই মুক্তির চৈতন্য বুকে নিয়ে, গভীর অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ ঠুকে জীবনের সাধ নিয়ে শ্রীবিলাসের পায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সামনে তখন জীবনের বিরাট সমুদ্র। *চতুরঙ্গ* রূপকার্থে শ্রীবিলাসের কথনের মধ্যে দিয়ে বয়ান করেন। চারটি চরিত্রকে চারটি শ্রেণির, রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে রূপকার্থে তুলে ধরেছেন। ধর্মের মধ্যে যে মুক্তি নেই সেটা মীমাংসীত এবং শিক্ষিত জাতি আবারও রাজনৈতিক পুনর্গঠন ছাড়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে– এই পরিণতিও *চতুঙ্গে*-এর অন্তর্নিহিত দৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কেন্দ্র এমন কি রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রেও ছিল আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা। আর আত্মার উন্মোচন কখনো ঘটবে না যতদিন না সঠিক রাজনীতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীতে সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎসাহিত্য যেন অনেকটাই উচ্চমধ্যবিত্ত ভুবন থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত চেতনায় প্রবেশ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাবাদর্শের দিক থেকে রক্ষণশীল। তাঁর মানবিকতায় এই রক্ষণশীলতা ব্যক্তি চরিত্রের ক্ষেত্রে মানবিকতা যতটা প্রসারিত, সামাজিক ক্ষেত্রে ততটাই রক্ষণশীল। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা* গ্রন্থে নীহারঞ্জন রায়ের কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে–'রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তিনি অভিজাত পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, লালিতপালিত হইয়াও তাহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছেন মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি তাহাঁর সকল বন্ধু সুহৃৎ সহকর্মী সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক।...এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ-কোলাহল, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্থই রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। [২৫]

'রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক আর শরৎচন্দ্র শুধুই ঔপন্যাসিক।'[২৬] প্রথম পেশাদার সাহিত্যিক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত রোমান্টিক সন্ত্রাস-বিপ্লববাদ শরৎচন্দ্রকে আবিষ্ট করে কিন্তু বৃহত্তর প্রশ্নে তিনি শুধু রক্ষণশীল থাকেন না, প্রায় প্রতিক্রিয়ার কাছে পৌঁছান। এই উভয়বিলাসিতার জন্যই তিনি আজও জনপ্রিয়। গ্রামীণ ভূমিনির্ভর মধ্যশ্রেণীর ভয়াবহ চরিত্রহীনতা-দলাদলি ক্ষয়ে যাওয়া তিনি নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে দেখান। এছাড়া জমিদার কেন্দ্রিক যে উজ্জীবনের কথা শরৎ সাহিত্যে পাওয়া যায় তা মূলত প্রাক-ঔপনিবেশিক জগতের পুনরুজ্জীবন। মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত নিজেদের দারুণ সংকটে একটি কল্পস্বর্গ ফিরে পেতে চায়। যেখানে গিয়ে সে সুখ ভোগ করে– এটাই শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

পথের দাবী শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস বলে সর্বাধিক আলোচিত। 'এ উপন্যাসে সমসাময়িক বিপ্লবী নেতাদের ব্যাখ্যা আছে, ভারতবর্ষ-ভারতবর্ষের বাইরে বিপ্লববাদী-সন্ত্রাসবাদের পটভূমি স্পষ্ট–এই সূত্রে *পথের দাবী*কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলেই অভিহিত করা হয়।'[২৭] কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাসের কেবলমাত্র রাজনৈতিক একটি উপরিস্তর বা রাজনৈতিক ঘটনার সংলগ্নতায় হয় না; জনসমাজভিত্তিক–রাজনৈতিক সমাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন এখানে ধ্বনিত, কোনো সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়, শ্রেণিগত বা সম্প্রদায়গত কোনো জিজ্ঞাসা কাজ করে, সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পথের দাবী প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে । 'প্রায় ঐ সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ'। সুতরাং এই দেশকে শৃংঙ্খল মুক্ত করিবার একা দায়িত্ব হিন্দুদের। মুসলমানরা মুখ ফিরিয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে–এ দেশে তাহার চিত্ত নাই।' মুসলমান, 'অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তা সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের পরে।' উদ্ধৃতি দুইটির দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক তাৎপর্য মারাত্মক। মনে রাখতে হবে, এই উক্তি তিনি করছেন, ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন সাম্প্রদায়িক ভাবনা ও সংঘাত নতুন করে তীব্র হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে লেখক রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে উপন্যাস লিখবেন, তার মূল চরিত্র কী হবে বলাই বাহুল্য। এক ধরনের রোমান্টিক বিলাস, যে বিলাস কয়েক বছরের মধ্যে ঐ বিপ্লববাদী ত্যাগে করেছিলেন। ফলে *পথের দাবী* হয়ে ওঠে এক গা ছমছম করা অ্যাডভেঞ্চার গল্প, শ্রেণিগতভাবে ন্যুব্জ বাঙালী মধ্যবিত্তের রোমাঞ্চকর কল্পনার আশ্রয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লববাদী- সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব-আততি, বাস্তব কিছুই এতে আসে না। আসে এক গোয়েন্দা কাহিনীর আভাস, একটি শিকড়হীন অতিমানব সৃষ্টির আবেগ, বলা ভাল, উল্টো করে এক ফ্যাসীবাদী ভাবনা। সেই ভাবনারই প্রকাশ ডাক্তার-অপূর্বর তর্কে বা আলোচনায়। ডাক্তার তার কঠিন যুক্তিতে বলে, 'অপূর্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নেই।' মনে হয়, বুদ্ধি বিভাসিত চৈতন্যের উপাসক ডাক্তার– কিন্তু এই চৈতন্যের রূপ কি? তা কী শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিমজ্জন।

> অপূর্ব জানায়, সে ধর্মসাধন বা আত্মার মুক্তি কামনায় সংসার ত্যাগ করতে চায় নি, যদি করে, পরার্থেই করবে। মায়ের মৃত্যুর পর সে এখন থেকে 'দেশের কাজে দশের কাজে, দীন দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ' করবে। অপূর্ব বলে, কলকাতায় আমার বাড়ি, শহরেই আমি মানুষ, কিন্তু শহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষি প্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংনোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশ শাসন করে এবং শোষণ করে। এছাড়া আর কোন সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরূপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে।[২৮]

কংগ্রেসের আন্দোলনের অনেক সমালোচনার মধ্যে একটি মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ- তা হলো কংগ্রেসের আন্দোলন সৃষ্টিধর্মী ছিল না। সমাজের মূল প্রবাহের সঙ্গে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আন্দোলন চলেনি। কারণ গান্ধীবাদী কংগ্রেসী আন্দোলন মুলত পরিচালিত হয়েছিল দেশীয়

স্বার্থবাদী বণিকশ্রেণীর দ্বারা। গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কারণে গান্ধীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, 'তাঁর আসল ভয় সোশয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।' [২৯] নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে তারা কখনো জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়েছে আবার কখনো জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ এগোতে চাইলে তাদের ছলে-বলে-কৌশলে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের চরিত্র বদলের সাধনা ছিল গান্ধীর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বড় কথা ছিল না– স্বাধীনতাযোগ্য মানুষ তৈরি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। হিতবুদ্ধি-জাগ্রত অহিংস ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার উপায়। কিন্তু অবেচতন জনগন তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসকে নিয়ে বলেছে- 'কংগ্রেস একটি বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এর চরকা প্রীতিও তার শেষ পর্যন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'বয়কটের' রাজনীতি পছন্দ না করলেও শরৎচন্দ্র তা পছন্দ করতেন। শরৎচন্দ্রের অবিচল প্রত্যয় ছিল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের প্রতি, 'এই ভারতবর্ষের এক দেশ জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ করা জীবন আর কই।'[৩১]

শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*তে এই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে– 'এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। তাই পাবে আমাকে কুলি–মজুর–কারিগরের মাঝখানে কারখানার ব্যারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগেঁয়ে চাষীর কুটীরে।' এক জগাখিচুড়ী শ্রেণীচেতনা শ্রমিক বোঝেন, কৃষক বোঝেন না। বলাই বাহুল্য *পথের দাবী* শ্রমিকচেতনা শূন্য, মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণ; ভারতবর্ষের মূল ও একমাত্র পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত শ্রেণি কৃষকদের সম্পর্কে শুধু উদাসীন নয়, বিরূপ। বৃহত্তর জনসমাজবিচ্ছিন্ন এই মধ্যবিত্ত সর্বস্বতা এখানে অতিমানবের কল্পনা আনে, আনে এদেশীয় ফ্যাসীবাদের রূপ। এ মধ্যবিত্ত পঙ্গু, উৎপাদন সম্পূর্ণ শূন্য : শরৎচন্দ্রের মুসলমান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা মেলে। উপন্যাসে অপূর্ব কৃষকদের ছাড়া বিপ্লব হয় না বুঝেও মনে করে কৃষকদের কল্যাণ ও স্বদেশের রাজনীতি ভিন্ন। এ এক বিচিত্র তালগোল পাকানো দৃষ্টিকোণ। মূলত রক্ষণশীল ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিপ্লব কল্পনা, ওপর থেকে চাপানো স্বদেশের রাজনীতি। আর ওপর থেকে চাপানো 'বিপ্লব'ই খুলে দেয় ফ্যাসীবাদের পথ– এখানে যার রূপ সাম্প্রদায়িক, মুসলমানদের সব কিছুর জন্য দায়ী করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের আর একটি উপন্যাস *পল্লীসমাজ* এবং ১৯২৩-এ প্রকাশিত হয় *দেনা-পাওনা*। দুটি উপন্যাসই রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনসমাজের একটি দিকের বিরাট ভাঙ্গন এ দুটি উপন্যাসে চিত্রিত। এখানেও শরৎচন্দ্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনিরপেক্ষ একটি নির্মাণের ধারণা দেন। কিন্তু অবশ্যই রক্ষণশীল সেই ধারণা। তবুও এটার রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে।

পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র গ্রামীণ সমাজকে ধরতে চেয়েছেন। মুলত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ। এই মধ্যবিত্তের সঙ্গে শহরের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর তফাৎ, এদের ভাঙ্গন-অবক্ষয় নিয়েও এরা গ্রামের জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত ও গ্রামীণ এই সমাজের অর্থনৈতিক–ঔপনিবেশিক কারণে যে মহাসর্বনাশ ঘটে গেছে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তাঁর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। ফলে এখানে *পথের দাবী*র ঐ শঙ্কা জাগানো ভাব আসে না। বস্তুত: গ্রামীণ যে দলাদলীর ছবি শরৎচন্দ্র এ সমাজের ক্ষেত্রে আঁকেন, তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিরও চরিত্র হয়ে ওঠে। কর্পোরেশন নিয়ে, বিশ্বায়ন নিয়ে যে দলাদলি আমরা দেখি ওই সময়ে ও তার পরে, তা কোনো শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি নয়। আজও রাজনীতি বলতে যে মহান লড়াই ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম বোঝা হয়, যা লেনিন, মাও সে তুং ১৯২০-২২ এর গান্ধী করেছিলেন, যাতে লেগে থাকে এক মুক্তি-স্বাধীনতার স্বপ্ন, তার ক্রমিক অবক্ষয় ঐ দলাদলিতেই পর্যবসিত, এ আরও নির্মম, হিংসামুখর।

পল্লীসমাজ উপন্যাসের মূল বিষয়– রমেশ নামক এক যুবক গ্রামে এসে পড়ে। সে যদিও এ গ্রামেরই ছেলে, বাইরে ছিল, বাবার শ্রাদ্ধে এসে উপস্থিত হয়েছে। গ্রামের দলাদলি, কুৎসিত জ্ঞাতি কলহের মধ্যে বহিরাগত এই যুবকটি নিজ অভিজ্ঞতা ও তার আসার অভিঘাতের চিত্রণে উপন্যাসটিতে জনসমাজগত ভাঙ্গনের ছবিটি ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্র সর্তকতার সঙ্গে অতীতকে আনেন, 'প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলিন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষলকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুর্য্যে শুধু কুলিন ছিলেন না বুদ্ধিমানও ছিলেন।' নানাভাবে বৈষয়িক উন্নতি ঘটান। কিন্তু ঘোষালের উন্নতি হয় না, বিবাহ উপলক্ষে এমন মনোমালিন্য হয় যে বিশ বৎসর পরস্পর মুখদর্শন করেন না। কিন্তু মৃত্যুর সময় বলরাম না কী সমস্ত বিষয় দুভাগ করে, এক ভাগ ঘোষালকে দিয়ে যান। 'সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুজ্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকেও অস্বীকার করিত না।' বস্তুত গ্রামীণ ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত উন্নতির প্রক্রিয়াটি শরৎচন্দ্র এখানে আঁকেন, আবার উনিশ শতকের গোড়ায় এই শ্রেণীর উদারতার কথাও বলেন বলরামের সম্পত্তি ভাগের মধ্য দিয়ে।'[৩২]

রমেশের বাবার শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে যে ছবি শরৎচন্দ্র আঁকেন তা জাতিধর্ম অভিমানী ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর ছবি : তোষামোদে, সঙ্কীর্ণতায়, কুৎসিত, কলহে এই সমাজ যে মৃত্যুপথযাত্রী, এরা যে সামাজিক ভূমিকায়, একথা অবশ্যই শরৎচন্দ্র বুঝিয়ে দেন। গ্রামীণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ লোভ ও করুণ আত্মমর্যদাহীনতায় শরৎচন্দ্র কোনো ট্রাজিডি দেখেন নি, দেখেছেন বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় করুণ আত্মসমর্পণ। দেখেছেন অনুধাবনীয় এক শ্রেণির সামাজিক টানাপোড়েন।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত *দেনা-পাওনা* শরৎচন্দ্রের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসটিতে বৃহত্তর তাৎপর্য ষোড়শীর নির্মল হৈমকে দেখে নারী-সত্তা জেগে ওঠা, জীবানন্দ-অলকার অতীত কাহিনী ও অলকা-জীবানন্দর ব্যক্তিগত চলে যাওয়ার গল্পে হারিয়ে যায়। জমিদারকেন্দ্রিক এক প্রজাকল্যাণের ধারণা এখানেও ক্রিয়াশীল, কিন্তু লম্পট জমিদারের পরিবর্তন ঘটে নিতান্তই এক প্রবল নারীর সংস্পর্শে, যে নারী তার আসলে স্ত্রী এবং সেই স্ত্রীর হাত ধরেই সে গ্রাম ত্যাগ করে।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, উপন্যাসটিতে কিছু কিছু উপাদান আছে যা তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে চণ্ডী মন্দিরকে কেন্দ্র করে: তার ভৈরবী ষোড়শী বা অলকা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসটি মুলত একটি ধর্মীয় সত্তার প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে ওঠার আভাস। এমন চরিত্র মধ্যযুগ বা প্রাগাধুনিক যুগেও দেখা যায়।

রাজনীতির সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের থেকে ভিন্ন ধরনের। কেন না তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করবার আগেই কিছুদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা রবীন্দ্রনাথ এরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে কখনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যাহ্নে । তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে লিখেছিলেন– 'যৌবনের কিছু আগেই জীবনের সব কামনা একত্রীভূত হয়ে পরাধীনতার অবসান করে দেশকে স্বাধীন করবার যে জীবনযজ্ঞ তাতেই আহুতি দিয়েছিলাম। ১৯১৭ সালে অন্তরীণ হওয়া থেকে ১৯৩৩ সালে জেলে যাওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী সৈনিকের মধ্যে দলগত বিরোধের যে মর্মান্তিক সংঘাত দেখেছিলাম, তাতে বেদনা হয়েছিল যেমন মর্মান্তিক রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও হয়েছিল তেমনি বা ততোধিক মর্মান্তিক।'[৩৩]

তারাশঙ্কর কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রত্যয় সত্ত্বেও তখন সেই আন্দোলন সফল হয়নি। কারণ আন্দোলনটি ছিল নেতিবাচক। আন্দোলনের অসফলতার সঙ্গে বিরাজ করছিল চরম অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকার সংকট। তারাশঙ্কর অসামান্য জনপ্রিয় লেখক। সেটা শুধু তার শৈল্পিক দক্ষতার কারণে নয় বরং তিনি বাঙালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গভীর মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

তারাশঙ্কর তার মনঃসমীক্ষণের চেয়ে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে প্রবৃত্তিতাড়িত কার্যকারণের দিকে অধিকতর পরিচালনার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর ছিল বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে আসা জীবন। এই সব অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও নির্মম বাস্তবের উপাদান এক করে তিনি কাঁথার কারুকাজের মতো সনাতন অথচ নবরূপ এক সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করলেন। বাস্তবের রূঢ়তাকে দেখেছেন বলেই তার মধ্যে এক ধরনের দুঃখ-চেতনার প্রকাশ দেখি।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *চৈতালি ঘূর্ণি*[৩৪]-এ নবীন সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা হলো– 'সমন্বয় নয়, বিপ্লবের বাসনা সাহিত্যে সঞ্চারিত হতে চাওয়াটাই এই সাহিত্যের বড় লক্ষণ বলেছেন।'[৩৫] তেমনি লক্ষণাত্তক উপন্যাস হলো *চৈতালী ঘূর্ণি*। যদিও বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের সূচনা এতে আছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। জমিদার, মহাজনের শোষণে গোষ্টি অতিষ্ঠ। কৃষক গোষ্টির অবস্থা তার বাবার আমল পর্যন্ত ভালো ছিল এখন গোষ্টির পরিচয় সে দেনাদার। গান্ধীর স্বরাজ সাধনা তার বুদ্ধিগম্য নয়। তাঁর নিজের বাস্তব জীবনের প্রশ্ন তুলে সে জানতে চায় যে, কবে জমিদার মহাজনী প্রথাটা উঠে যাবে? লেখক বলেছেন যে, বহু যুগের অন্যায় অত্যাচারে এই কৃষকদের কাছে দেশ, ধর্ম সমাজ বোধকরি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে তারা জানেও না কে তাদের শোষণকারী, কে তাদের এমন কঙ্কাল করে তুলেছে। তবে এরা সবাই বাঁচতে চায়। গোষ্টির শোষক জমিদারকে হাতের কাছে পায় না।

*চৈতালি ঘূর্ণি*তে তারাশঙ্কর ক্ষণিকের জন্য হলেও বিপ্লবের ইচ্ছা শ্রমিকদের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে। তিনি আপসহীন বিপ্লবকে চিত্রিত করতে পারেননি। উপন্যাসের শেষ হয়েছে একটি ব্যর্থ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এখানেই সমন্বয়পন্থী তারাশঙ্কর দুলক্ষ্য নন। এর পরের রচনাগুলিতে তিনি অন্বেষণ করেছেন এমন একটা পথ যার মধ্যে 'আধ্যাত্মিক সাধনা ও লৌকিক সাধনার সমন্বয় চেষ্টা রয়েছে'। অর্থাৎ সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া চেতনার মধ্যে তিনি একটা আপস করতে চেয়েছেন। এই সমন্বয়পন্থা ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মধ্যেও ছিল।

সে জন্য তারাশঙ্করের পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কদের কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়া কঠিন হয়নি।

ধাত্রীদেবতা (প্রস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)-র শিবনাথ ন্যায়বোধে উদ্দীপ্ত এক আদর্শবাদী তরুণ। মায়ের প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই সে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে এবং সেবাধর্ম পালন করে যা তারই দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছে। দেশ-সেবকের আর্দ্র চিত্তে *আনন্দমঠ*-এর প্রগাঢ় প্রভাব পড়ল। ভক্তিমিশ্রিত স্বদেশমুক্তির এই জাতীয়তাবাদী ধারণায় সে আকৃষ্ট হল সন্ত্রাসবাদের প্রতি। তারাশঙ্কর অবশ্য সন্ত্রাসবাদকে সুনজরে দেখেননি। তিনি একে অভিহিত করেছেন 'নিরন্ধ অন্ধকার পথ' এবং 'স্বাধীনতা লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত পথ' বলে। শিবনাথের সৃষ্ট সে পথকে পছন্দ করেননি শিবনাথ স্বভাবতই সে পথে চলতে চাইবে না। সে সন্ত্রাসবাদীদের সংশ্রব ত্যাগের জন্য উপায় খুঁজতে লাগল। তার জন্য এ অধ্যায় হয়ে রইল এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। শিবনাথের সন্ত্রাসবাদীদের সংসর্গ পরিত্যাগের প্রেক্ষাপট দেখাতে গিয়ে *ধাত্রীদেবতায়* মূলকাহিনীর বাইরে অতিরিক্ত আর একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এক রহস্যময়, সৌম্য, আশ্রমবাসী, একদা-সন্ত্রাসবাদী 'মহাপুরুষ' কেন সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করে আশ্রমিক হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'মহামানবের' মত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ শুধু ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ, ফলে তা বিচ্ছিন্ন।

সন্ত্রাসবাদী দলের নিয়মানুযায়ী ঐ 'মহাপুরুষ'কে শিবনাথের সামনে হত্যা করা হল। সন্ত্রাসবাদ-ত্যাগী ঐ 'মহামানব' গান্ধীবাদী কংগ্রেসের মূলনীতি তুলে ধরছে। বিদেশী বর্জন ছিল কংগ্রেসের আন্দোলনের অঙ্গ। অথচ 'মহাপুরুষের' আকাঙক্ষার আর সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যে তেমন বিরোধ ছিল না, উভয়েই স্বাধীনতাকামী, পথ শুধু ভিন্ন। স্বাধীনতাকেই সন্ত্রাসবাদীরা পরম লক্ষ্য মনে করে- তফাৎটুকু সেখানেই। শিবনাথের দেশকে স্বাধীন করার উপক্রমনিকায় সন্ত্রাসপন্থা একটি উদ্যম ছিল কিন্তু সেটাই একমাত্র উদ্যম নয়। *চার অধ্যায়*-এর অতীন এ পথে এসেছিল, এটার কাছে থাকবার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই বলে। শিবনাথ এসেছিল অনেকটা একই কারণে, কিশোরী স্ত্রীর অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞায় আহত হয়ে এবং কিছু সন্ত্রাসবাদী ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে।

শিবনাথ অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদার। মায়ের মৃত্যুর পর শোকজনিত বৈরাগ্য ও তার স্ত্রীর ঐশ্বর্যপ্রীতিতে তার মনে আবার দেশ বড় হয়ে দেখা দিল। কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায়? শিবনাথ পথ পায় না। নিজের অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার প্রতিকার করা যায় কিভাবে– সে কথা শিবনাথ চিন্তা করে। সে

ফরাসী- বিপ্লবের ইতিহাসের বইতে সূত্র খোঁজে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ কিছুটা আনুধাবন করে নিজেকে জমিদার ভাবতে তার অপরাধী মনে হয়। নিজেকে অপরাধী জেনেও নিজের জমিদারীর নিলাম রদ করতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তার প্রজারা তাকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছে জমিদারী রক্ষা করতে তাই পিতৃপুরুষের স্মৃতিজড়িত সম্পত্তি সে রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষ থেকে তার জমিদারী বাঁচল কিনা সেটা তারাশঙ্কর বলেননি, তবে সে জমিদারী নায়েবের হাতে তুলে চরের মধ্যে যেয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত হল। কৃষিকাজ, দুঃস্থের সেবা, নৈশবিদ্যালয় চালানো প্রভৃতি কাজে শিবনাথ দেশের সেবায় তৎপর হয়েও উপলব্ধি করল, কিন্তু যে মূতি, সে মাকে দেখিতে চাহিয়াছেল এ মূর্তি সে মূতি নয়।'[৩৬]

এর মধ্যে ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। চরকা, তাঁতের কাজ শিবনাথ তার এলাকায় প্রচলন করল। সন্ত্রাসবাদী দলের বন্ধু সুশীল দেশত্যাগের আগে তাদের দলের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে গেল শিবনাথের কাছে। দেশের জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেনি, নির্বিকার দূরত্বে অবস্থান করেছে এমন অভিযোগ সুশীল করেছিল। শিবনাথ নিজে জনসাধারণের নিকটবর্তী হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে–'স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য শব্দ ছাড়া কিছু নয়। সাহায্য তাহারা করিবে কোন প্রেরণায়? দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থের কোনো যোগ নেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের স্বার্থ–সংরক্ষণের আন্দোলন সে কথাও তারাশঙ্কর বলেন নি। শিবনাথেকে দেখা যায় ঐ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে। সবচেয়ে আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসটিতে লেখকের নিজের মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভারতবর্ষের আন্দোলনও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ গণমুখী হয়ে উঠেছে এবং রাজনীতিতে জনসাধারণের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারাশঙ্কর দৃষ্টি ফেরালেন জমিদার থেকে জনসাধারণের দিকে। জনসাধারণের প্রতি তাঁর আগ্রহের প্রকাশ *গণদেবতা* (১৩৪৯) এবং এর পরিপূরক উপন্যাস *পঞ্চগ্রাম* (১৩৫০)-এ বিধৃত। উপন্যাস দুটি ব্যক্তিহীন গণজীবনের শোভাযাত্রা। জনপদ জীবনের যে চিত্র এখানে প্রত্যক্ষ তা *পল্লীসমাজ* এর মতো ব্রাহ্মণ্যশাসিত নয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পঞ্চগ্রামের সব মানুষই প্রায় এক স্তরের। এদের জীবনে কিভাবে নবীন বিশ্বাস ও ধারণা পুরাতন মুল্যবোধগুলির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে লেখক সেই প্রক্রিয়ার চিত্র নির্মাতা। মাটি ও মানুষ কেন্দ্রিক এমন আলেখ্য, সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের এমন অপূর্ব চিত্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে কেউ অঙ্কণ করেননি। অবশ্য তিনি এঁকেছেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

গণদেবতা ও *পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে দুটি রাজনৈতিক কর্মী চরিত্র রয়েছে। নজরবন্দী যতীন ত্রিশ সালের অসহযোগের আগে পঞ্চগ্রামের অস্ফুট রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সাহায্যকারী চরিত্র। সে পঞ্চগ্রামের প্রিয় অতিথি। বন্দীজীবনেও সে দেবুকে জাগাতে সাহায্য করেছে। দেবু ও যতীনের সম্মিলিত শুভবোধ এই যে 'নতুন কালের ধর্ষণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে– মানুষ বাঁচিবে। ভয় নাই, ভয় নাই'। সাম্যবাদী বিশ্বনাথ যতীনদের দল ত্যাগ করে সাম্যবাদের দীক্ষা নিয়েছে। অথচ বিশ্বনাথের পিতামহ এ অঞ্চলের সর্বাধিক ধার্মিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ও পান্ডিত্যর জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। যতীন বহিরাগত হয়েও গ্রামে যে আন্তরিকতা পেয়েছে বিশু গ্রামের ছেলে হয়েও সেটা পাচ্ছে না। কারণ বিশ্বনাথের বংশ পরিচয় তার সাম্যবাদী ধারণার সঙ্গে বেমানান, বিশ্বনাথ নিজেও তার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্কারে আস্থা রাখে না। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাতেই তার অনাস্থা, কারণ সে সাম্যবাদী। পিতামহ এ যুগে তার ধ্যান-ধারণার জন্য যতই শ্রদ্ধেয় হোক না কেন তার জীবনে এই ধারণা অচল। আর পৌত্র ঐতিহ্যহীন-ধর্মহীন অতি প্রাগ্রসর বোধে উদ্দীপ্ত। তারাশঙ্কর তাঁর সমস্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন মহামহোপাধ্যায়ের জন্য। ধর্মের প্রতি অতি নিষ্ঠাবান এই চরিত্রটিকে তিনি সমাজপতি ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারলে সর্বাধিক সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু জীবন-ঘনিষ্ঠ লেখক বলে এবং তাঁর সামন্তবাদী মানসিকতা সত্ত্বেও এ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারেননি যে, ন্যায়রত্নদের যতই শ্রদ্ধা-ভক্তি করা যাক না কেন তাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারা সমাজপতির ভার বহন করতে পারে না। এদের জায়গায় এসেছে নব্যধারার নেতা।"[৩৭]

উপন্যাস দুটোতে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। দূর-দূরান্তের দরিদ্র পল্লীবাসীর জীবন অর্থনৈতিক কাঠামোর হাড়ি-কাঠে বন্দী। এই দরিদ্রদের সমস্যা টিকে থাকার। কংগ্রেসী রাজনীতির মুক্তিসাধন করাতে তাদের তেমন সাড়া দেবার কথা নয়। দেশের মুক্তিতে তাদের মুক্তি আসবে এমন কথাটা বোঝানো গেলে তারা সংগ্রামে অংশ নেবে। তারাশঙ্কর উপন্যাসে কালোবাজারীদের স্বাধীনতা-প্রীতিকে শ্রেণিস্বার্থ রূপে দেখেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনকে সে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কোথাও করেননি। আর স্পষ্ট করে বলেননি কোন শক্তি মজুতদারদের পুষ্ট করে, বাড়তে দেয়।

তারাশঙ্কর তার সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই সুনজর দেননি। সামন্তবাদী জমিদাররাই তাঁর ভক্তি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি যে শুধু বণিকদের নয়, মধ্যবিত্তেরও সুবিধা আদায়ের আন্দোলন– এ সত্য তিনি দেখাতে চাননি।

সন্দীপন পাঠশালা (১৩৫২) উপন্যাসে পুনরায় গ্রামীণ পটভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন তারাশঙ্কর। এই উপন্যাসের নায়কের নাম সীতারাম। তার বাবা চাষী। সীতারাম সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। সেটাকে

সম্বল করেই সে জীবন পার করার অভিপ্রায় পায়। সীতারাম রাজনৈতিক চরিত্র নয় কিন্তু সে রাজনৈতিক সময়ের মানুষ। এছাড়া তারাশঙ্করের সর্বশেষ দুটি রচনা- *একটি কালো মেয়ের কথা* (১৯৭১) এবং *সুতপার তপস্যা* (১৩৭৮) উপন্যাস দুটিতেও রাজনীতি এসেছে। মুলত একাত্তরের আগে গ্রামীণ বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে কিন্তু এখানেও লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে কংগ্রেসী।

তারাশঙ্কর জীবননিষ্ঠ লেখক। জনজীবনের কাছাকাছি থেকে এবং রাজনীতিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি এই সত্য বুঝে নিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক কালের রাজনীতি একটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য। সেইসঙ্গে তার মনের মধ্যে এই উদ্বেগও ছিল যে, রাজনীতি যাতে সমাজ-বিপ্লবের সৃষ্টি না করে। সে কারণে রাজনীতিকে তিনি একটা বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন করেছে কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তারাশঙ্করের কাজের একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে, এই সাদৃশ্যের ভিত্তি হচ্ছে তারাশঙ্কেরের শ্রেণীগত অবস্থান ও অভীপ্সা। তাঁর উপন্যাসে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতা রয়েছে তাঁর আগের লেখকদের উপন্যাসে তেমন নেই। এর অবশ্য অন্য একটা কারণ রয়েছে যে, তাঁর মতো অন্য লেখকদের রাজনীতির সঙ্গে তেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তারাশঙ্কর নিজেই অধ্যাত্মবাদ ও ভক্তিবাদ অর্থাৎ সামন্তবাদী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক, প্রকৃত বক্তব্যের বিচারে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের তুলনায় কম অগ্রসর। শরৎচন্দ্র ধর্মের সামাজিকতাকে স্বীকার করেছেন ঠিকই কিন্তু ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোযোগ দেননি। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ভাবাবেগ সত্ত্বেও এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতা ছিল যেটা তারাশঙ্করের মধ্যে অনুস্থিত। তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি ভাববাদী। তিনি বঙ্কিমের মতো উদার জীবন-স্বীকৃতি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিন্তু বঙ্কিমের মতো জীবনের সীমানাকে আরও প্রসারিত করতে পারেননি। বঙ্কিমের তুলনায় তার ভাষার ওজস্বিতা বিশেষ করে উপন্যাসের পরিণতিতে প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস কম। তাঁর ভাববাদিতা ও রাঢ় অঞ্চলের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ রূঢ়তা একত্র হয়ে ভাষাকে এক ধরনের আপাত পৌরুষ দিয়েছে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে অনুপস্থিত। কিন্তু এই পৌরুষ আবার প্রতারকও, কেননা এর অভ্যন্তরে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা তারাশঙ্করের বিপরীত পথ ধরে। তারাশঙ্করের মতো তিনি সাহিত্যিক হবার আগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক হবার পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখার

বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন–'...লেখক-কবিও টের পাচ্ছেন যে, নিছক হাসিকান্নার আকর আর ভূমার মূলধনে প্রেম চলবে না মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষের রোগ উপবাস লড়াই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।[৩৮]

তারাশঙ্কর মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে আন্তরিকতার সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন, অথচ দুঃখ-কষ্টের জাগতিক কারণ না দেখিয়েই একটা আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানিক এ দেশের নিপীড়ত মানুষের দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। সাহিত্য-জীবন শুরু করবার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মার্কর্সবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর, আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি রয়ে গেছে।'[৩৯] এই উপলব্ধি তাঁর মার্কসবাদী হবার পরে। দেশের মানুষের মুক্তি বলতে তিনি নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তিকেই বুঝেছেন। তাই তিনি শুধুমাত্র মিষ্টি কথার সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি।

তারাশঙ্করের তুলনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে ছোট হলেও তারা দুজনেই সমসাময়িক লেখক। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রধর্মী সাহিত্যিক। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তাঁর সামনে একদিকে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের প্রভাব, অন্যদিকে অতি আধুনিক কল্লোল-কালি-কলম গোষ্টির নব-সৃষ্টির উল্লাস। সব মিলিয়ে মানিক নিজেও বিদেশী সাহিত্যের পাঠক। তাঁর নিজের সাহিত্য রচনার হাতে খড়ি 'রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী দিয়ে।' ১৯৩৫ সালে প্রথম গল্প দিয়ে সাহিত্য জীবনের শুরু। 'চরিত্রহীনে'র বিশেষ অনলস পাঠক ও ভক্ত হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র সর্ম্পকে বিশেষ অভিযোগ ছিলো, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে– মধ্যবিত্তের হৃদয়।' হৃদয়াবেগের তুলনায় যুক্তি ও মননশীলতার প্রতি তাঁর আগ্রহ অধিক। কবি রূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'প্রশ্নোত্তর' সাহিত্যিক। অতি আধুনিক তরুণ লেখকেদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড় জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না– সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।..."[৪০]

প্রথম জীবনে মানিক রোমান্টিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তার প্রথম উপন্যাস *জননীর* (১৯৩৫) রোমান্টিকতা বিশ্লেষণ করলে, সেখানে তার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা ধরা পড়ে। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের

মতো *জননী*কে নিয়ে ভাব বিলাসী হবার সুযোগ তিনি নেননি। অথচ তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে মৃত্যুও রোমান্টিক। *জননী* মানিকের প্রথম উপন্যাস আর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের ভাবাবেগময় রচনা *আরোগ্য নিকেতন* (১৩৫৯) হচ্ছে পরিণত বয়সের রচনা।

সহরতলী উপন্যাস মানিকের লেখক জীবনে সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি। সংগ্রামী মানুষকে সর্বদায় তিনি খুঁজে ফিরছেন। শ্রমিক ও দরিদ্রদের যে সংগ্রামী জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'বীভৎস'। এমন মানসিক অবস্থায় তাঁকে মেনে নিতে দেখি, 'আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ।' যে রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ইলেকশনে জেতা, তার কথা *সহরতলী*তে নেই। কিন্তু রয়েছে মিল মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আংশিক সফল সংঘর্ষের জীবন দলিল যা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমনভাবে দেখা যায়নি। শ্রমিক সম্বন্ধে সচেতনতা এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। মানিক যশোদার মাধ্যমে এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে, বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা কিছু সংখ্যক শ্রমজীবীর জন্য দরদ দেখাতে গেলে তা সার্থক হয় না, তাতে সমস্যারও সমাধান হয় না। একটা শ্রেণী হিসাবেই তাদের সমস্যাকে অনুধাবন করতে হবে। ভাবালুতার একটা বলিষ্ঠ জীবনাবেগ এ উপন্যাসে প্রতিফলিত।

প্রতিবিম্ব উপন্যাসটি রচিত হয়েছে মানিকের পুরোপুরি মার্কসবাদী শিক্ষা গ্রহণের কিছু আগে। সে কারণে *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসকেও বলা চলে তাঁর সাহিত্য জীবনের সন্ধিক্ষণের রচনাা। *প্রতিবিম্ব*-এর আগে রচিত *অহিংসা* (১৩৪৮) উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য। রূপকাশ্রয়ী উপন্যাস রূপে *অহিংসা* নামকরণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ধর্মকে মূলধন করে এ দেশের আশ্রমিক ব্যবসা সে ভণ্ডামির চাল, সেই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন মানিক। মানিক নিজেই অবশ্য এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেননি।[৪১] কিন্তু উপন্যাসটি পর্যালোচনা করলে তাঁর ঐ অস্বীকৃতি ঠিক মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

"*অহিংসা*র কাহিনীতে জটিলতা রয়েছে। যদিও চরিত্রগুলোর কার্য ও কারণের পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তবু একটা অস্বচ্ছভাব কুয়াশার মতো কাহিনীকে আবৃত করে আছে, যেমন থাকে রূপকে। সহস্র মাইলব্যাপী তপোবনের মালিক বিপিন একজন আশ্রমিক ব্যবসায়ী। লোকের ভক্তিকে ভাঙ্গিয়ে সে পয়সা উপাজন করে। ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে তার ব্যবসায়ের উন্নতি। ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের ভক্তি নিষ্কাশনে যে ব্যক্তি সর্বাধিক পারদর্শী, বিপিন তাকেই আশ্রমের ভার দিয়ে দেয়। সে জন্য যখন তার আশ্রমে তারই প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী ভণ্ড সদানন্দকে জনগণের কাছে ভক্তির তুলনায় ভীতির পাত্র হয়ে উঠল তখন বিপিন সদানন্দকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দিল।

সদানন্দর স্থলাভিষিক্ত হল মহেশ চৌধুরী। মহেশ চৌধুরী *অহিংসার* কেন্দ্রীয় চরিত্র। জনসাধারণের ভক্তিকে আকর্ষণ করে আশ্রমিক ব্যবসা জমে ওঠে। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা সে জন্য এ ব্যবসায়ের একটি প্রধান দিক। এমন কি বিপিনও জানে 'ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়।' সাধারণ মানুষ আবার পছন্দ করে মহেশ চৌধুরীকে। মহেশ বিশ্বাসী লোক, 'নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা তার আছে।"[৪২]

কৃষকদের নিয়ে বেশ কিছু উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে রচিত হলেও তিনি এসব থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আঙ্গিকে কৃষকদের নিয়ে উপন্যাস লিখলেন যা বাংলা সাহিত্যে আগে রচিত হয়নি। মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে চরম অর্থনৈতিক পীড়নে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই অসন্তোষ কিভাবে বিপ্লবী চেতনায় রূপান্তরিত হল তার অগ্নিসম্ভার চিত্র *দর্পণ*-এ বিধৃত। হেরম্ব- লোকনাথ, হীরেন-মমতা, রম্ভা-রামপাল, আরিফ- মোহনলাল, কৃষ্ণেন্দু-বীরেশ্বরের যে পার্থক্য তা শহরের বা গ্রামের দূরত্বের নয়– প্রভেদটা শ্রেণীতে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে দু'শ্রেণীর মনে প্রতিচিন্তন ও কর্মকে উপস্থিত করেছেন। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানিক দেখেছেন যে, তাঁর নিজের দেশের জীবন যাপন প্রণালীর ধারায় ভূমিনির্ভর প্রায় সকলেই। *প্রতিবিম্ব* থেকেই তিনি বলতে চাচ্ছেন, গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে সহাবস্থান শুধু কর্তব্য নয়, তাদের মন জানাও কৃষক-শ্রমিক হিতৈষীদের উচিত। কৃষ্ণেন্দু যাদের মধ্যে কাজ করে তারা শ্রমিক। বীরেশ্বরদের গ্রামে সে আগেও গিয়েছে। তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে শহরের কল-কারখানা এবং তৎসংলগ্ন এলাকসমূহ। *প্রতিবিম্ব* এর তারক আলতোভাবে, বাহ্যিক রূপে চেনা চাষী মজুরদের কলকাতায় বসে মনে করতে চেষ্টা করেছে। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ চাষী-মজুরদের কথা ভাবতে গিয়ে 'কেবল সোভিয়েট পোস্টার দেখছি' আর তারেকের আক্ষেপ ছিল 'ওদের ভাল করে জানি না।'

কৃষ্ণেন্দু শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে নবচেতনা অন্বেষণ করে ফেরে। ছোট বড় হাঙ্গামা দেখে শ্রমিকদের মধ্যে 'নতুন চেতনার লক্ষণ আবিষ্কার করে পুলকিত হবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। চেতনা কই? জোরালো একটা অসন্তোষ সাড়া দিচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, এইটুকু শুধু সে অনুভব করতে পারে। অধিকারের দাবী কেউ তুলছে না। কয়েকটা অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু চাইছে।'[৪৩] কৃষ্ণেন্দুকে সাহায্য করতে ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বর আসে। বীরেশ্বর এবং ঠিকাদার হেরম্ব চক্রবর্তীর মধ্যে তুমুল বিরোধ শুরু হয়। হেরম্ব ঝুমরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাস্তা তৈরির ব্যাপারে কুলি সংগ্রহের জন্য এলাকার চাষীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। বীরেশ্বর আর গ্রামের লোক হেরম্বর অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিতে গেলে বীরেশ্বর

নানাভাবে তাকে শায়েস্তা করেছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে গ্রামের নিগৃহীতরা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সাহায্যে সে প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দেয়া হয়। খুন হলো বীরেশ্বর। এভাবে কাহিনী এগোতে থাকে। মমতা শ্রমিকপল্লীতে আশ্রয় নেয় কিন্তু পারে না তাদের সঙ্গে মিশে থাকতে। কৃষ্ণেন্দু বীরেশ্বর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৎপর হয়। সারা গ্রাম আলোড়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামবাসীদের এবার ভবিষ্যৎ কি হবে সেই উত্তর আর লেখক দিতে পারেন নি।

'তারাশঙ্করের পঞ্চগ্রামবাসী 'চারহাজার বৎসর ব্যাপী' মুখ বুঁজে যে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে এবং যে গ্রামের দৌলত শেখ নিঃসম্বল হবার দুঃখে বীরেশ্বরের মতো তেজী হওয়া সত্ত্বেও গলায় দড়ি দিয়েছে, তেমন ভারবাহী জীবের ঐতিহ্য মানিকের ঝুমুরিয়াবাসীদের জন্য নয়। *দর্পণ*-এ রয়েছে ঘটনাকালীন সময়ে সমগ্র দেশের যথাযথ অনতিরঞ্জিত রাজনৈতিক, সামজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছায়া। এ উপন্যাসে সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং তার পাশে হীরেনের মতো উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অপরিত্যাজ্য স্বার্থপরতা ও স্বশ্রেণীতে প্রত্যাবর্তনের গোপন অথচ স্বাভাবিক ইচ্ছার অনবদ্য বিবরণ।[৪৪]

সাম্যাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত মানিক এ সময়ে তাঁর লেখা ছোটগল্পেও বিপ্লবী চেতনাকে তুলে ধরেছেন। *আজ-কাল-পরশুর গল্প* (১৯৪৬) এর ভূমিকায় মানিক বলেছেন–'গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরস্পর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে *আজ-কাল-পরশুর গল্প* নামটির সঙ্গতি হয় তো আরেকটু পরিষ্ফুট হবে মনে করেছিলাম।'– এই বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। আজকের চলতি গল্প হচ্ছে দুর্ভিক্ষ মহামারী কবলিত দারিদ্র্য ও অসহায়তা। কালকের গল্পগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে অসন্তোষের ধূম্র রেখা দিয়ে। কিন্তু পরশুর গল্প একেবারে ভিন্ন চেতনাশ্রয়ী। মানিকের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বক্তব্যগুলো এ রকম–

> চাঁপার আর্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়। হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, চল যাই'।
>
> আজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে।'
>
> 'লাঠির কাছে বন্দুক, বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।[৪৫]

পরবর্তী গল্প সংকলন *পরিস্থিতিতে* (১৯৪৬) বিপ্লবী চেতনার প্রয়োগ ছিল অনেক বেশি। ক্রমেই মানিক অধিক বিপ্লবী ও সংগ্রামী করে এঁকেছেন তার চরিত্রদের। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো ক্রমেই একটির চেয়ে অন্যটি অধিক সাহসী হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রসিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে। ছাত্র ও জনতার ওপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগনের একান্ত প্রতিবাদ প্রকাশের এক অসামান্য প্রতিবেদন এ উপন্যাসের উপজীব্য। *চিহ্ন*-এর ঘটনার গতি দ্রুত, চরিত্রের সংখ্যাও বেশি। প্রধান ঘটনা প্রবাহে চরিত্র-মিছিলের স্রোত অবশ্য একাভিমুখী। মানিক বহুজনের হৃদয়ে ধৃত দেশপ্রীতি ও আদর্শকে নিরীক্ষণ করেছেন নিজের জীবনাদর্শের আলোকে। নিরীক্ষাকেন্দ্র হচেছ রসিদ আলী দিবসে কলকাতা।

অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করে *চিহ্ন* লেখা হয়নি। বরং অহিংস হৃদয়, নির্বিকার চিত্ত কিভাবে গর্জন করে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্তই এখানে উপস্থিত। ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর সময় গণেশ মারা যায়, সে কুলি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণেশ একাগ্র উৎকণ্ঠায় জানতে চেয়েছে সংগ্রামী জনতা সব উপেক্ষা করে 'এগোবে না?' এই গণেশের বাবা হচ্ছে যাদব। ভাগচাষীরা যখন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছিল তখন যাদব ছিল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। সেই আন্দোলন সম্বন্ধে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। ভাগচাষীরা আন্দোলন করেছিল বলেই বিপ্লবী চেতনার অধিকারী। যে জন্য ব্যারাকের লোক এসে যখন যাদবের যুবতী কন্যা রাণীকে তুলে নিয়ে গেল তখন গ্রামবাসীরা ব্যারাকে আগুন দিয়ে ছিনিয়ে আনল রাণীকে। এই ঘটনা দেখে যাদবের মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। সে ভাবল, 'চিরকাল সে নিজেকে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাংসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচনে মরলে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়।' যাদব অস্বীকার করে, শহরে বউ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে এসে, তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সুতরাং এরপর যাদবের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করে দেখতে শিখেছে। চাষাদের সংগ্রামে সে হবে একজন অংশীদার।

শহরের অধিবাসীরাও নিরীহ প্রতিবাদী জনতার ওপর গুলিবর্ষণের নৃশংসতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জনসাধারণ লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের আপসমুখী আকুল আবেদন কানেই তোলেনি। মিছিল এগোবেই, 'সবাই এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয়নি নেতাদের।' এমন প্রতিবাদের

বিস্ফোরণ তৈরী হয়েছে বহুযুগ সঞ্চিত ক্ষোভ থেকে। মানিকের উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনে গ্রাম ও শহর অভিন্ন।

উপন্যাসে মানিক সভা-সমিতির উপযোগিতার কথা বলেছেন। *চিহ্ন*র সংগ্রামী জনতা ও মানুষের রূপায়ণ ঘটেছে এভাবেই। তাঁর আগের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় *চিহ্ন*র ভাষার ব্যবহার অধিকতর তীর্যক। তিনি নির্ভুল লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরবাসীকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার প্রস্তুতির চিত্র তুলে দেখিয়েছেন। লড়াইয়ের বাধা যেমন হোক না কেন লক্ষ্য একই। তারাশঙ্কর এই একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন *ঝড় ও ঝড়াপাতা* (১৯৪৬)। রসিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতার বুকে যে উদ্দামতা, তেজের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল সেটাই *ঝড় ও ঝড়াপাতার* উপজীব্য। জীবিকা যুদ্ধে নিম্ন মধ্যবিত্ত গোপেন সরকারি অত্যাচারের নমুনা দেখে জ্বলে উঠল ক্রোধে, 'এ যে কি ক্ষোভ– এ যে কি বুকের আগুন– সে অন্যে বুঝতে পাবে না। ভারতবর্ষীয়-বাঙালী–কলকাতার বাঙালী না হলে অন্যে বুঝতে পারবে না। গোপেনের সম অবস্থার লোক হলে আরও ভাল বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি তা গোপেন জানে না– কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতায় আর মৃত্যুতে কোণ প্রভেদ নেই। সেই স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেপে উঠেছে।'

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির কথা গোপেন ভাবেনি। রসিদ আলী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল কোনো রাজনৈতিক পন্থার অনুসারী হয়ে নয়, সে গিয়েছিল আকস্মিক উন্মাদনার ঝোঁকে অর্থাৎ ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে। সরকারী অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় সে বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ। গোপেনের 'সম অবস্থা'র লোক না হলে ঐ জ্বালা কেউ বুঝতে পারবে না– এ কথাটি লেখক নিজেই বলেছেন।

তারাশঙ্করের *ঝড় ও ঝড়াপাতার* চেয়ে মানিকের *চিহ্ন* অনেক পরিপক্ব। কারণ মানিক এখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি এবং সে যে কোন পেশা বা অবস্থানে থাক না কেন সবাইকে তিনি সংগ্রামে শরিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। একেবারে যুক্তির সার্থক এবং শিল্পসম্মত প্রয়োগই এই উপন্যাসের একমাত্র উদাহরণ।

চলমান, বর্তমান ঘটনাবলী মানিকের সাহিত্যের উপাদান হয়েছে অনেক বার। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলাদেশের চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯) সম্ভবত মানিকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ছোটগল্প। রাজনীতি যে দেশে জীবন ও জীবিকার নিত্য সহচর সেখানে এই গুরুগম্ভীর বিধাতার অসঙ্গতিকে নিয়ে প্রহসন লেখার অবকাশ কম। তিনি বড় কমলাপুরের

চাষীদের ঘটনা দেখে লিখেছেন এই গল্পটি। মানিকের রচনা-তালিকায় গল্পটি বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর দেখা জীবন বাস্তব ও নিষ্ঠুর। সেই বাস্তব জীবনের সমস্যাবলীও নির্মম। এছাড়া *দর্পণ*, *জীয়ন্ত*, *অহিংসা* এসবই সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিকায় নির্মিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি রাজনৈতিক উপন্যাস *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১)। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন জনসাধারণকে। কারণ জনসাধারণই মানবতার প্রতীক। একজন মধ্যবিত্ত গৃহিণী মণিমালার উপলব্ধির মাধ্যমে লেখক তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যাবলীর মূল্য নিরূপণ করেন। মণিমালার চেতনার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সুবিন্যস্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অভিজ্ঞতাসমূহ সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে মণিমালা হয়ে উঠেছে খাঁটি জীবনবাদী এবং স্বচ্ছ বাস্তববোধের উত্তরাধিকারী। সে যে এমন হয়ে উঠতে পেরেছে এর একটা কারণ মেয়েদের মধ্যে শ্রেণি-চৈতন্য সঞ্চারিত হওয়াটা সহজ, শ্রেণি সমাজে মধ্যবিত্তের ভূমিকা একদিকে যেমন শোষকের, অন্যদিকে তেমনি শোষিতের। আবার এই শোষিতদের মধ্যেও আছে এক দল শোষিত–তারা হল পুরুষশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত নারী, বিশেষত ঘরের গৃহীণী। একদিকে তারা পুরুষশাসিত সমাজের কারণে শোষিত অন্যদিকে তারা নারী বলে– এই দুই কারণেই মেয়েদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা অধিক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খাঁটি মার্কসবাদীদের মতোই অসাম্প্রদায়িক। তাঁর লেখায় হিন্দু মুসলমান বলে কোনো আলাদা শ্রেণী নেই। 'তাঁর কাছে শ্রেণী দুটো, শোষিত আর শোষক।'[৪৭] একবারে প্রথম দিকের রচনায় *পদ্মানদীর মাঝিতে* তাঁর এমন ধারণার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। জেলেপাড়ার নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং অমুসলমান অধিবাসীদের ধর্ম কি, সে প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনে মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নেই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে–দারিদ্র।'[৪৮]

পদ্মানদীর মাঝি, *পুতুল নাচের ইতিকথা* কিম্বা *দিবা রাত্রির কাব্য* উপন্যাসগুলোতে লিবিডো তত্ত্ব প্রধান্য বিস্তার করে থাকলেও এখানে মানিকের একটা সামাজিক, মানবিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সকল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোতে তিনি একটি যুক্তির প্রয়োগ দেখাতে চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সৌন্দর্যলোক, তা সে যাকে ভিত্তি করেই হোক না কেন থাকতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য ও শান্তি বলে কিছু হতে পারে না। রাজনীতির ঢেউ শান্তির নীড়ে প্রবেশ করে বিপর্যস্ত করে তুলবেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচলিত ধারা তাঁর দেশের জনসাধারণের জন্য

কোনো বড় পরিবর্তন ঘটায়নি। ফলে জনসাধারণের ক্ষোভ বেড়ে উঠেছে। সঠিক পন্থায়, সচেতন প্রচেষ্টায় সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। তাঁর মতে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে, সেই সচেতনতা অবশ্যই রাজনৈতিক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী। সে জন্য সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়নি। জনপ্রিয়তা, সামজিক প্রতিষ্ঠা বা অর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনোটাই তিনি লাভ করেননি। সেখানে তার তারাশঙ্করের সঙ্গে একটা বিরোধও থেকে যায়।

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় পরবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল এবং মনোজ বসু। এদের রচিত কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী'র সারা জাগানো উপন্যাস *জাগরী* (১৯৪৫)। উপন্যাসিকে রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে আগস্ট আন্দোলনকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে উপন্যাসের মধ্য স্থাপন করেছেন। বনফুল'এর *অগ্নি* (১৩৫৩) উপন্যাসও আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। মার্ক্সবাদকে অপ্রয়োজনী ও ক্ষতিকর ভেবে *অগ্নির* নায়ক আংশুমানকে তৈরি করা হয়েছে। এখানে মুলত বনফুল নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহাওে অধিক সচেষ্ট হয়েছেন। মনোজ বসুর জনপ্রিয় উপন্যাস ভুলি নাই-এর কাহিনী কাহিনী গড়ে উঠেছে অহিংস গান্ধীবাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে উপজীব্য করে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন নিয়ে গোপাল হালদারের উপন্যাস *অমিত* (১৯৪৬)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নামেই উপন্যাসের নাম। মুলত আগস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করেই এই উপন্যাসে অমিত তাঁর বক্তব্য প্রচার করেছে।

আগস্ট আন্দোলনকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস *মন্দ্র-মুখর*। এখানে এই আন্দোলনে গণশক্তির ভূমিকাকে উপন্যাসিক স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *উপনিবেশ*। এখানে ঔপন্যাসিক রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে পর্তুগিজদের বাণিজ্য, উপনিবেশ গড়ে তোলা এবং সেখানকার ক্ষমতার পালাবদল- সমসাময়িক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রণিধানযোগ্য নাম। তাঁর লিখিত উপন্যাসের মুল উপজীব্য সমাজ কাঠামো, যেখানে কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করেছে রাজনীতি। রাজনীতেকে প্রধান অনুসঙ্গ করে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে এত উপন্যাস খুব কমই লিখিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যালোচনা করলে

দেখা যায় বেশিভাগ উপন্যাসই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ঘটনা বা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত। ঘটনা বা আন্দোলন ছাড়াও রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে ক্ষমতা কাঠামো। শ্রেণি বিচারে ক্ষমতা কাঠামোর পালা-বদল, সংঘ শক্তি, আইনের পরিবর্তন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম উপন্যাসগুলোর মূল কাঠামোকে ভূমিকা রেখেছে। এসব বিবেচনার পেরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোও বাংলা সাহিত্যেও মূল্যবান দলিল।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য*। উপন্যাস বিচারের ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স । ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ ৬৬

২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্পেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ ১১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *প্রসঙ্গ- বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। মার্ক্স-এঙ্গেলস, ‘প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, (মস্কো, ১৯৭১) মুক্তধারা। প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮০, পৃ ২৯

৬. প্রার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্পেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ ১৩

৭. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পৃ ৩৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

৯. সাম্য, *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৯৩

১০. *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (১৩৬৯) পৃ ৪২

১১. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৭১

১২. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫

১৩. ‘আনন্দমঠ’ *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড

১৪. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, পৃ ৩৬

১৫. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০

২০. *রবীন্দ্র রচনাবলী* ৬ষ্ঠ খণ্ড

২১. প্রাগুক্ত

২২. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬

২৩. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩

২৪. 'যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলাম। তাই জমিদারি ব্যবসায় আসার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসছে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।' চিঠিপত্র, গ্রন্থ পরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিংশ খণ্ড, পৃ ৪৫৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৪

২৬. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পৃ ৮৩

২৭. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, পৃ ১০৫

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬-১০৭

২৯. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ১৯৭০

৩০. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০

৩৩. আমার কথা, *শনিবারের চিঠি*, পৃ ২০৯। দ্রষ্টব্য: *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*।

৩৪. *চৈতালী ঘূর্ণি*, উপন্যাস পত্রিকায় (কার্তিক- চৈত্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৩৫. চৈতালি ঘূর্ণি, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড

৩৬. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২

৩৮. প্রতিভা, *লেখকের কথা*, পৃ ৫৩। ১৯৫৭

৩৯. সাহিত্য করার আগে, *লেখকের কথা*। পৃ ১৬

৪০. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২

৪১. 'বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই'–লেখকের বক্তব্য, পৃ ১৬৯

৪২. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯-৭০

৪৩. দর্পণ, *মানিক সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৬০

৪৪. *উপন্যাস রাজনৈতিক*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০

৪৫. শক্রমিত্র, আজ কাল পরশুর গল্প, *প্রসঙ্গঃ বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পৃ ১৮০

৪৬. ঝর ও ঝরাপাতা, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পৃ ২৪

৪৭. *স্বাধীনতার স্বাদ*- উপন্যাসের প্রধান একটি চরিত্র প্রণব মানিকের বক্তব্যই প্রকাশ করে বলেছ, 'হিন্দু বা মুসলমান বলে কোন শ্রেণী নেই কিনা, তাই মিছামিছি শ্রেণীর কথা বাড়াইনি' *মানিক সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৪৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. পদ্মানদীর মাঝি, *মানিক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতি

ত্রিশের দশকে খ্যাতিনামা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বকনিষ্ঠ। ত্রিশের কোঠায় পদার্পণের পরেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হতে থাকে। কল্লোল পরবর্তী যুগের হয়েও তিনি কখনো কল্লোল-বিরোধী ছিলেন না। বরং বাস্তবমুখীতা, সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি, কিংবা শিল্পের সমাজবোধ তাঁকে বারবার উৎসাহ যুগিয়েছে। তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়েও কখনও কোনো পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কোন নিদির্ষ্ট একটি পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে তিনি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করতেন পার্টিতে যুক্ত হলে সরাসরি পার্টির রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে, ফলে তাঁর সাহিত্যিক কাজ বাঁধাগ্রস্থ হবে। তাই তিনি শুধুমাত্র মতাদর্শিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেয়েছেন। মতাদর্শে অন্তর্ভুক্ত থেকে জনসাধারণের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি বিশেষ দিক হলো যেখানে কল্লোলপন্থীরা রবীন্দ্রচিন্তার বিরোধীতা ঘোষণা করে যাত্রা শুরু করেছেন সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। শিল্পীর স্বাধীনতা প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন–

> বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি-তাঁর জীবনসাধনা আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর অনুসরণ কিংবা কল্লোল-গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরো কিছু লেখকদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এমনকি প্রভাবিতও হয়েছেন কারো কারো দ্বারা। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরে বেশি প্রভাবিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা। তারাশঙ্করের উপন্যাসে জমিদার শ্রেণি, রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের সংস্কৃতি, গ্রাম বাংলার মানুষের মানসিকতা ইত্যাদি চিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন–তারই প্রতিচ্ছিবি তারাশঙ্করের উপন্যাসের মূল চেতনা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই চেতনা দ্বারা বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব, কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো থেকে শিল্পায়নের দিকে যাত্রা,

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক শ্রেণির সূচনা ইত্যাদি বিষয়গুলো তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন সুনিপুণ লেখনীতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলোতে এমন চিত্র বিশেষ লক্ষণীয়। কখনো তিনি ইতিহাসকে উপজীব্য করেছেন, কখনো সমান্তবাদী কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামোকে উপন্যাসের মূল চেতনায় নির্মাণ করেছেন আবার কখনো ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসেবে চিত্রায়ণ করেছেন। উপন্যাসের বিশাল বিস্তৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি আদিবাসী অথবা গ্রামের নিম্নশ্রেণির মানুষের কথা ভুলে যাননি। কখনও কখনও নিম্নশ্রেণিকে সংগঠিত করে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। আবার কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন কাঠামোর চিত্র অঙ্কণ করতে গিয়ে সেখানকার কৃষি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে ভোলেননি। এসব দেখে সহজেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি অনুধাবন করা যায়। তিনি যে একটি বিশেষ শ্রেণির চিত্র নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং সমাজের নিম্নশ্রেণির উপরে তাঁর একটি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় গতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের রূপকার ও ইতিহাসকে উপন্যাসে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তাঁর কলমে ফুটে উঠেছে রাঢ় বাংলার বিস্তৃত রূপ ও সামজিক জীবন। তেমনিভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনা, উত্তর বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলের (যেমন, দিনাজপুর) চিত্র উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *উপনিবেশ*, ইতিহাস চেতনা নিয়ে নির্মিত। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বাণিজ্য, সমুদ্রে মোহনায় গড়ে ওঠা তাদের জীবন-জীবিকা, মনোভাব ইত্যাদি মূল চেতনা হিসেবে উঠে এসেছে। *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসের মূল উপজীব্য ব্রিটিশ বিরোধী পূর্ববাংলা, সেখানকার রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষত বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা বর্ণিত হয়েছে। সামন্তবাদী সমাজ কাঠামোর শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার অবস্থান অঙ্কিত হয়েছে। *স্বর্ণ-সীতা* উপন্যাসেরও মূল উপজীব্য সামন্তবাদী কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি। *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী* উপন্যাসেরও মূল অবয়ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয় ভেঙ্গে নতুন সমাজ নির্মাণ। যদিও সেখানে রাজনীতি বা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। *বৈতালিক* উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। *সূর্য-সারথির* মূল উপজীব্য রাজনৈতিক, মুলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়া, বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং সমাজ বদলের আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যুক্ত করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। *শিলালিপি* উপন্যাসে এসেছে একজন সাধারণ ছাত্র কীভাবে নিজের শ্রেণি পরিবর্তন করে নিজেকে বিপ্লবী রাজনীতিকে সক্রিয় করেছে, অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাসের মূল উপজীব্য গান্ধীবাদী রাজনীতি। মুলত ভারত ছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এই উপন্যাসের কাহিনী

নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। *মহানন্দা* উপন্যাসটি অনেকটা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। *মহানন্দা* নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনবসতি, তাদের জীবনচিত্র, জেলেপাড়া, পাশাপাশি চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন–এই উপন্যাসের কাহিনী সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। *পদসঞ্চার*, *অসিধারা*, *লালমাটি*–এসব উপন্যাসের মূল উপজীব্য সামাজিক। সামন্তবাদী সমাজকাঠামোর পরিবর্তন, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন কাঠামো এবং সাংস্কৃতিতে তার প্রভাব– এসব উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। *অমাবস্যার গান*, *স্রোতের সঙ্গে*, *নতুন তোরণ*, *কলধ্বনি* উপন্যাস চারটির মূল উপজীব্য গ্রাম বাংলার নদীবিধৌত অঞ্চল, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন কাঠামো ও সংস্কৃতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক-সামাজিক চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের মনস্তত্ত্ব নির্মাণেও বিশেষ প্রয়াসী হয়েছেন। মনস্তত্ত্ব চিত্রায়ণে তাঁর সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস *নির্জন শিখর*। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একজন শিক্ষকের চিত্র তুলে ধরেছেন, যিনি নিজেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি নিয়োজিত করেননি। কিন্তু সর্বদা পার্টির কর্মীদের সহযোগিতা করেছেন, বিপদে আপদে পাশে দাঁড়িছেন। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে রাজনীতিতে যুক্ত হয় এবং তারই মতো শিক্ষক হয়। ঔপন্যাসিক সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বয়ানে পিতা-পুত্র দুই জেনারেশনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাসগুলোতেও কখনও সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, নাগরিক জীবন আবার কখনও মানবিক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সবগুলো উপন্যাসের মধ্যেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, রাজনৈতিকবোধের স্বাক্ষর মেলে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সমসাময়িক অন্য কোনো কথাসাহিত্যের কথা উঠলেই স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে তারাশঙ্করের কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় দু বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম হলেও দুজনের মধ্যে পার্থক্যও আছে বিস্তর। তারশঙ্কর যেমন উপন্যাসে রাঢ় বাংলার জীবন চিত্র অঙ্কণ করেছেন তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও বরেন্দ্র অঞ্চলের নিসর্গ ও মানসরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর বিপ্লবী রাজনৈতি বা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক জীবন চিত্র উপন্যাসে তুলে আনলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ততোটা জোরালো ভাবে আনতে পারেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক মতাদর্শ, পার্টির ভেতরের দ্বন্দ্ব কিংবা রাজনৈতিক বিষয়াবলী ইত্যাদি প্রসঙ্গ সূক্ষ্মভাবে তুলে আনতে পেরেছেন। সম্ভবত রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণেই সম্ভব হয়েছে। তবে তাঁরা দুজনেই কালসচেতন তথা ইতিহাস সচেতন শিল্পী। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁদের দুজনের কালসচেতনতা সম্পর্কে বলেছেন–

> নারায়ণের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার একটি কারণ আমরা দুজনেই তারাশঙ্করের ভক্ত। নারাণ ছিল তারাশঙ্করের যোগ্যতম উত্তরসূরী।[২]

সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার একটি প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন–

> তিনি যখন সাহিত্যরচনায় নেমেছেন তখন তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, মানিকের জীবনবোধ ও শিল্পকৌশলের উত্তরসূরী হয়েই তিনি এসেছেন। তার ওপর বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও গল্প-লেখকদের জীবনদৃষ্টি ও কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তাঁকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছে। উপন্যাস ও গল্পের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের পর দশক ধরে যে নতুন নতুন বাস্তবতা নিরীক্ষা-পরীক্ষা হয়েছে তার সমস্ত তরঙ্গই তাঁর গল্প উপন্যাস সাহিত্যে স্পর্শ করেছে।[৩]

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরণ করলে কিংবা তাঁর বিস্তৃত রচনার মধ্যে কারো কারো সূক্ষ্ম অনুপ্রেবেশ থাকলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আপন মৌলিকত্বের গুণে স্বকীয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি তারাশঙ্করের উত্তরসূরী বললে একথা বোঝায় না যে তিনি পুরোপুরি তারাশঙ্করকে অনুসরণ করেছেন। বরং পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যিকদের তিনি সচেতন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেই পর্যবেক্ষণই তাঁকে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কালচেতনা তাঁকে যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কথাসাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর প্রতিভার শুরু *উপনিবেশ* উপন্যাস দিয়ে, যেখানে ইতিহাসচেতনাই মূল, যদিও সেটা রাজনীতির বাইরে নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভার ক্রমশ স্ফুরণের পরিচয় পাওয়া যায় একে একে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে। তিনি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো চারিদিক স্ফুরিত করেননি। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছেন, পরিণতির দিকে এগিয়েছেন, বারবার নিজেকে পুনর্গঠন করেছেন। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজিমুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারীদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা। সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড়–যেন মহাপ্রলয় আর তার সন্ধিক্ষণে নরক গুলজার। অন্যায়, অসত্য আর মিথ্যার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। শুকনো জীবনে মানুষের কাছে যেন একমাত্র আশ্রয় হিসেবে উপস্থিত হয় প্রতিবাদ ক্ষোভ আর বিক্ষোভ। মানুষের যেন হারাবার কিছু নেই, সব হারিয়ে আজ সে পথে নেমেছে। যেখান থেকে পেছনে

ফিরে যাবার আর কোনো রাস্তা নেই। হয় মৃত্যু নয় বেঁচে থাকা। এমন কালের মধ্যে যুগমন্ত্র ধারণ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পও বাংলা কথাসাহিতের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রকাশিত বারো খণ্ডের রচনাবলীতে (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স) উপন্যাসের সংখ্যা আঠাশটি। আলোচনার জন্য আমরা শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলো নির্বাচন করেছি। যদিও সে নির্বাচন কতটা যুক্তিযুক্ত সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ কাল সচেতন শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতি, সমাজচেতনার বাইরে তেমন কোনো উপন্যাস লেখেননি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁর সব উপন্যাসকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামোর আওতায় নির্ধারণ করা যায়। সমাজকাঠামো আমাদের মূল বিষয় না থাকায় আমরা রাজনীতিকে প্রাধান্যে রেখে উপন্যাস নির্বাচনে প্রয়াসী হয়েছি। আর রাজনীতি বললেও যে উপন্যাসগুলোতে রাজনৈতিক মতাদর্শকে বা চেতনাকে মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, রাজনৈতিক আদর্শ যেখানে সমগ্র জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে সেগুলোই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হলো *উপনিবেশ* উপন্যাস। আমরা এই উপন্যাসকে গুরুত্ব দিয়েছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের বিবেচনায়। *উপনিবেশ*-এর মধ্যে সমগ্র জনসাধারণকে নিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রক্রিয়া থাকলেও এটাকে ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় *উপনিবেশ* উপন্যাসে পর্তুগিজ জলদস্যুদের উপমহাদেশে আগমন, বাণিজ্য এবং তাদের জীবনসংগ্রামে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রভাব থাকায় তা বিবেচনায় এসেছে। মার্কসীয় রাজনীতির নানা মিল-অমিল, গান্ধীবাদী রাজনীতির প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত স্বকীয়তা নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম লিখিত উপন্যাস *তিমির-তীর্থ*। কিন্তু *তিমির-তীর্থ* প্রকাশিত হয় *উপনিবেশ*-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশের পরে। আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম উপন্যাস হিসেবে আলোচনার জন্য *উপনিবেশ*-কেই নির্বাচন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্ঞান, প্রজ্ঞা স্বতন্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠ। তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে ইতিহাসের অনুসন্ধানানের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। তথ্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সঠিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *উপনিবেশ* অনন্য মাত্রা দান করেছে। তিন খণ্ডে লিখিত এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের পাশাপাশি ইতিহাসের বাস্তব তথ্য ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যতার ছাপ রেখেছেন।

উপনিবেশ [প্রথম খণ্ড]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *উপনিবেশ* প্রথম খণ্ড (১৯৪৪ সালে)। গ্রন্থটি ১৩৪৯ সালে রচিত এবং ১৩৪৮-১৩৫০ পর্যন্ত ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *উপনিবেশ* গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে। পরে বাক্ সাহিত্য প্রাং লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রোড থেকে তিনখণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়, ১৩৭৮ সালে।

উপনিবেশ প্রথম খণ্ডে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্নবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণির চলমান অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে সপ্তদশ শতাব্দীর পর্তুগিজ জলদস্যুদের কথা ঐতিহাসিকভাবে তুলে ধরেছেন। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ বিশেষত বরিশাল, নোয়াখালি অঞ্চল প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে সৃষ্টি। ঔপন্যাসিক প্রকৃতির আবহকে তুলে এনেছেন এভাবে–

> নদীবিধৌত এ অঞ্চলে প্রাকৃতির কারণেই মাঝে মাঝে চর জেগে ওঠে। কখনও পুরাতন চর মিলিয়ে যায় নদীগর্ভে, কখনও বা কোনো চরের জীবদ্দশা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। চর ইসমাইল এই রকমই একটি চর। এই চর, তার বিচিত্র অধিবাসী, তাদের বিচিত্রতর জীবনযাত্রা, চরের চার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খ্যাপাটে নদী তেঁতুলিয়া–এদের সকলের কথা নিয়েই এই উপনিবেশ উপন্যাস। এই চরের অধিবাসীদের মধ্যে আছে যেমন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, তেমনি আছে আরাকানী মগ, পর্তুগীজদেও অবলুপ্তমান বংশধরেরা। আছে কার্যোপলক্ষে শহরের সরকারী কর্মসারীদেও সাময়িক উপস্থিতি, তেমনি আছে গাঁজা-আফিমের চোরাই চালানকারীদের গোপান আসা-যাওয়া। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে কাহিনীর গোড়াপত্তন। উপনিবেশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবার-কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে ও বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মানুষদেও নিয়ে এই চরের অধিবাসী সমাজের যে জীবন-প্রবাহ চর ইস্মাইলে অহরহ স্পন্দিত, তা-ই এই উপন্যাসের নায়ক বা প্রাণ।[৪]

উপনিবেশ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট নয়, বাস্তবতাই এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। 'চর ইস্‌মাইল' নামের জায়গাটি অবশ্যই প্রতীকী। তবে প্রতীকী এই ভাবনাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, যা কখনই বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। কল্পনা দিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাস্তবতাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

> উপনিবেশ প্রকাশিত হবার পর জনৈক পাঠকের চিঠির জবাবে ঔপন্যাসিক ৯.৪.৪৫ সালে উপন্যাসটির বাস্তবতা সর্ম্পকে জলপাইগুড়ি থেকে লেখেন–'চর ইস্‌মাইল' নামটি বাস্তবতা না হইলেও বরিশাল ও নোয়াখালি সামুদ্রিক-মোহোনায় অনুরূপ স্থান বিরল নহে এবং কাহিনী বর্ণিত অপরিচিত ধরনের মানুষগুলিকেও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি গল্পই লিখিয়াছি সুতরাং কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর তবে উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি।[৫]

তিন খণ্ডে বিভক্ত *উপনিবেশ* ঔপন্যাসিক সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করেছেন। তিনটি খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত হলেও কাহিনীর কোথাও ছেদ পড়েনি বা অসামঞ্জস্যতা লক্ষণীয় নয়। বরং তিনিটি খণ্ডের প্রতিটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যেমন প্রথম খণ্ডটির দুটি অংশ, দ্বিতীয় খণ্ডটিরও দুটি অংশ এবং তৃতীয় খণ্ডটি একটি অংশে বিভক্ত। উপন্যাসের সময় পরিক্রমার মধ্যেও বিভক্তি লক্ষ করা যায়। তবে পূর্বাপর হলেও ঔপন্যাসিক সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর।

উপনিবেশ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড দুটি অংশে বিভক্ত–'মৃত্তিকা' ও 'ফসল'। 'মৃত্তিকা' অংশটি আবার পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী বর্ণনা করেছেন আবার কখনও পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কাহিনীর বৈচিত্র্যের জন্য নানা উপাদান ও দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে হঠাৎ "মণিমোহনের ডাইরী থেকে" বিবরণীর মধ্য দিয়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে আবার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। *উপনিবেশ* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হওয়ায় উপন্যাসের শুরুতে লেখক মূল উপন্যাস শুরুর আগে কৈফিয়তের আঙ্গিকে নিজের উপন্যাস বিষয়ক ভাবনার কথা জানিয়ে, আত্মস্বীকারোক্তি দিয়েছেন–

> উপন্যাস লেখবার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল– যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়ো।
>
> খুব পুরানো দিনের কথা খুব সহজ ভাষায় বলা হল। কিন্তু নিজের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন উপন্যাস লেখবার পক্ষে এই একমাত্র কৈফিয়ৎই আমি খুঁজে পাই।[৬]

ভূমিকায় আরো লিখেছেন

> কাঞ্চন নদীর ধার থেকে বরেন্দ্রভূমির আচক্রবাল মাঠের দিকে পা বাড়ালাম, তখন এমন একটা পৃথিবীকে দেখলাম, যা আমার কল্পনাকে ছড়িয়ে তরঙ্গিত রাঙা মাটির টিলায় টিলায় মহাশূন্যতায় অগ্রসর। আর তার ওপর চোখ পড়ল আমার দেশের মানুষকে। তিন মাসের বেশি তার খোরাকীর ধান থাকে না, পাঁচ মাস পরে তার দু'পয়সার লবণ জোটে না এবং অন্তত তিন মাস তাকে বুনো ওল সেদ্ধ করে পেটের জ্বালা জুড়োতে হয়। আমার মহা-পৃথিবীতে এসে মিশল মহা-বুভুক্ষা; লাল মাটির ওপর বৈশাখী ঘূর্ণি আমার চোখ দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠল। আমার প্রথম উপন্যাস *উপনিবেশের* জন্মও এই ভাবেই।[৭]

উপনিবেশ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'মৃত্তিকা' ও 'ফসল'। 'মৃত্তিকা' পর্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করেছেন আর 'ফসল' পর্বে গিয়ে সেসব ঘটনা-চরিত্র-সর্ম্পকের কার্যকারণ ও পরিণতি উন্মোচন করেছেন। 'মৃত্তিকা' পর্বটি শুরু করেছেন এভাবে–

> পৃথিবী বাড়িতেছে।
> দিনের পর দিন নদীর মোহনা-মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে, আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি-অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।
> ... তেতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'শবের'জল ছুটিয়া আসে। তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলটিতে বসিয়া জীবনকীট অন্ধ-প্রেরণায় রচনা করে চলে।...তারপর আস্তে আস্তে সেই অর্থই জল ঠেলিয়া অতিকায় তিমির মতো একটা প্রকাণ্ড চড়া জাগিয়া ওঠে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে চড়ার নোনা ক্ষয় হইতে থাকে, আগাছা জন্মায়, তার পরে আসে মানুষ।...পৃথিবী বিস্তৃত হয়-নতুন মাটিতে নতুন নতুন ফল ও শস্য জন্মিয়া প্রয়োজনের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলে।
> ইহাই উপনিবেশ। জাতিভেদে নয়, দেশভেদেও নয়। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত সৌরজগৎ, মহাকাশ ও মহাকাল ব্যপিয়া এই উপনিবেশ রচনা হইয়া চলিয়াছে।[৮]

লেখকের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি পুরো *উপনিবেশ* উপন্যাসের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। একজন ভাস্কর্যশিল্পী যেমন তার মূল কাজ শুরু করবার আগে মাটি তৈরি করে নেন, মাটি কত ভালো ভাবে তৈরি হল তার উপরেই সেই ভাস্কর্যটির মসৃণতা নির্ভর করে। তেমনি লেখক *উপনিবেশ* সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে যেমন আত্মস্থ করেন তেমনি ব্যাখ্যাটা শুরুতে দিয়ে দিয়েছেন, নিজের অর্থাৎ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করে। কারণ পুরো উপন্যাসে তিনি যেমন নানা শ্রেণীর, নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তেমনি সেসব চরিত্রের শ্রেণী দ্বন্দ্ব, রক্তের/ বংশের আত্মঅহমিকা, রক্তলোলুপতা, যৌন জীবনের নিঁখুত চিত্রায়ণ করেছেন। তেতুলিয়ার 'চর ইসমাইল' উপনিবেশের ভূমি।

যেখানে একসময় পর্তুগিজ জলদস্যদের (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রতাপ ছিল। আজ তারা নাই, কিন্তু তাদের বংশের রক্তে বয়ে গেছে–যা ধারণ করে আছে তাদের নামে। তাদের রক্তের নেশায় হত্যা, নারী লুণ্ঠন কিম্বা মুখের সেই গালি সেই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। বাংলায় সে সময় শাসন ক্ষমতায় ছিলেন আলীবর্দী খান। ঔপন্যাসিক তাদের 'নিম্ন বাংলা' জলদস্যু বলে অভিহিত করেছেন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

> নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ– ইটের দেওয়াল দুদিনেই জীর্ণ হইয়া আসে, তবুও পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজ অবধিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। চরের দক্ষিণ দিকের যে অংশটা নদীতে ভাঙ্গিয়া নিয়াছে মাত্র দশ বছর আগে আসিলেও ওখানে তাহাদের প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ অন্তত দেখিতে পাওয়া যাইত। বালির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া একটা লোহার কামান দেখিয়া তাহাদের বলবিক্রম আজিকার দিনেও খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : এক, পৃ ২১৬]

পর্তুগিজদের সেই চল ইসমাইল এখন এটা সরকারী নিয়ন্ত্রণে। এখানে আছে সরকারী তহশীলদার (কোট অব্ ওয়ার্ডসের একটি কাছারী), ডাক্তারখানা, ডাকঘর আর এলাকার বাসিন্দা (যারা অধিকাংশ চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি থেকে আসা) দুঃসাহসিক ভাগ্যাচেষ্টা মুসলমান, কিছু মগ ও একদল জেলে। প্রায় দেড় হাজার লোকের বসতি। উপন্যাসে সরকারী তহশীলদার মণিমোহন, ডাক্তার বলরাম, হরিদাস সাহা পোস্টমাষ্টার, পর্তুগিজ দস্যুদের এলাকার ডি-সুজা, জোহান, লুসি, গঞ্জালেস, বর্মি ব্যবসায়ী, মুসলমান পীর বড় গাজী ইত্যাদি চরিত্রগুলোর মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক পুরো চরের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কণ করেছেন। চরের পাশে নদী, যা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। বর্ষাকালে চরের বাইরে যাতায়াত এতটাই ভয়ঙ্কর যে তা মৃত্যুর সামিল। উপন্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

> কিন্তু এত করিয়াও চর ইসমাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : এক, পৃ ২১৭]

চর ইসমাইলের বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের দুর্ধর্ষ জলদস্যু রয়েছে যারা মূলত পর্তুগিজের আধুনিক বংশধর আরাকানী ও মগ। উপন্যাসে তারা নারীহরণ ও নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত। আরাকানী ও মগ অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালিরা বসবাস করে। তারা মূলত এলাকায় প্রতাপশালী। ক্ষমতাকাঠামোর অংশীদার ও জমিজমার মালিক তাঁরা। উপন্যাসের অন্যতম বাঙালি চরিত্র বলরাম ভিষকরত্ন। পেশায় কবিরাজ হলেও সহায়-সম্পত্তিতে ছোটখাট জমিদার। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী

বলরামের মনস্তত্ত্বও বিচিত্র। বলরাম প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ক্ষমতাবান হলেও মানসিকভাবে প্রচণ্ড একা। ঔসন্যাসিক বলরামের একাকিত্ব, বন্ধুত্ব, শূন্যতা নিপুণ দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন। দশ বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছে। স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই বলরাম একা। একজন চাকর তার দেখাশুনা করে, রান্না করে দেয়। গ্রামের পোষ্টমাষ্টার হরিদাস সাহা এবং আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে মিলিয়ে মাঝে মাঝে তাস খেলে তাঁর সময় কাটে। যদিও তাদের সঙ্গ সব সময় বলরাম পায় না। মাঝে মাঝে তামাকের লোভ দেখিয়ে, ঠাট্টা তামাশা করে গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বিকেল-সন্ধ্যা কাটে। কিন্তু সারাদিন বলরাম একাকিত্বে ভোগে। মাঝে মাঝে তামাক খেয়ে ঝিম ধরে থাকে। তার চাকর বুঝতে পারে না বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে না ভাবনায় ডুবে আছে। উপন্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

> বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম আয়োজন হয়। যেদিন বেশি রাতে খেলাটা বেশ করিয়া জমিয়া যায়, সেদিন কবিরাজ মশাই মদনানন্দ মোদকের কৌটাটি নামাইয়া আনেন। সে অমৃত এক দলা পেঠে পড়িলে আর কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না-এই চর ইসমাইলকেও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কবিরাজের যে হাত যশ আছে সেটা মানিতেই হইবে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : দুই, পৃ ২২৭]

বাড়িতে দূর সম্পর্কের আত্মীয় মুক্তো আসায় বলরাম কবিরাজের যেন সমস্ত কিছুর পরিবর্তন ঘটে যায়। বলরামের মানসিক একাকিত্বে মুক্তো যেন একটি অবলম্বন হিসেবে উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বার্থপর বলরাম তাকে শুধু ব্যবহার করে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি দেয় না। মুক্তোকে বলরাম নিজের যৌন লিপ্সা চরিতার্থ করতে ব্যবহার করে। বলরামের স্বাভাবিক চরিত্রের মধ্যে মুক্তোর বিষয় ব্যতিক্রম। লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> কিন্তু ভালোবাসিবার ক্ষমতাটা তো আর সকলের সমান নয়। মানুষের চরিত্রগত তারতম্য বিচার করিয়াই ভালোবাসার পাত্রপাত্রী ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে বলরাম একখানি বন্ধুবৎসল, যে তামাক এবং মোদক ব্যয়ের দিকে তাঁহাকে একেবারে অকুণ্ঠ বলিলেই হয়, তিনি যে আত্মীয়াকে একটু অতিরিক্তই ভালোবাসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : তিন, পৃ ২৩৯]

বলরামের কেমন বা কোন সম্পর্কের দিক থেকে মুক্তোকেশী আত্মীয় তা ঔপন্যাসিক ব্যাখা করেন নি। মুক্তোর বর্ণনা দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এভাবে–

> বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। আঁটো-সাঁটো গড়ন, কপালটা অতিরিক্ত চওড়া। কিন্তু প্রশস্ত কপালটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে অশোভন রকমের বড় একটা মেটে সিঁদুরের ফোঁটায়। গ্রামের মেয়ে হইলেও সে পাতা পাড়িয়া সিঁথি কাটে, পুরু ঠোঁট দু'খানি পানের রঙে সর্বদাই রাঙা হইয়া আছে।
>
> [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : তিন, পৃ ২৩৯]

ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় মুক্তোকেশী ঠিক তেমনটা নয়। কিন্তু কোথায় যেন আলাদা একটা শ্রী আছে তাঁর। ছোটবেলায় বিয়ে হওয়ায় শরীরে কোথাও সে ছাপ পড়েনি, এখনো কুমারী বলেই বোধ হয়। ছয় বৎসর একান্ত নিষ্ঠায় স্বামীর ঘর করলেও স্বামী তাকে সুখি করতে পারেনি। কোনো সন্তান না আসায় তাঁকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হয়। কিন্তু সেখানেও বখাটেদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে হয়। বলরাম তাঁর দায়িত্ব নিতে স্বীকার করায় পিতা তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দেন। বলরাম শুধু মুক্তোর ভারই নেয়নি মুক্তের প্রতি বলরামের স্নেহটা একটু বেশিই উদগ্র হয়েছিল। আর সেই স্নেহপরায়ণতা শেষ পর্যন্ত স্বার্থপর একটা পরিণতিতে গড়ায়। প্রথম পর্বের শেষে মুক্তো সন্তান সম্ভবা হয়। ঔপন্যাসিক মুক্তোর চরিত্রের দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ব নির্ধারণেও ভুল করেননি। এক ধরনের বিষণ্নতা, অবসাদ মুক্তোকে ঘিরে ধরে, ডাক্তার হয়েও যা বলরামের অগোচরে। শারীরির সুস্থতা বাইরে থেকে দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে মুক্তো যে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা ডাক্তার হয়েও বলরামের নজরে আসেনি। মুক্তোর সামাজিক মর্যাদা, ভালোবাসার মূল্যায়ন স্বার্থপর বলরাম দেয়নি। এটা বলরামের শ্রেণির কারণেই সম্ভব হল অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি, সমাজের উচ্চ আসনের সম্মানিত ব্যক্তির কারণেই নিম্ন শ্রেণির চাষার মেয়েকে বলরাম স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত যা সুবিধাবাদী, ভণ্ড, চূড়ান্ত অসত্যতারই নামান্তর। ঔপন্যাসিক সামাজিক এই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামাজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গেছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের দৃঢ় গণ্ডিটির মাঝখানে যেখানে প্রাচুর্য আছে, চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গেছে। মগ কিংবা আরাকানী অথবা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েদের সত্যি সত্যিই এমন কিছু বিবাহ করা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের কোনো নিদিষ্ট পরিধি যেখানে নাই, সেখানে মুক্তে বলরামের স্বগ্রামবাসিনী অথবা আর কিছু ইহা লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : তিন, পৃ ২৪১]

উপনিবেশ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র মণিমোহন, তিনি খাসমহল কাছারীর নতুন তহশীলদার। মণিমোহন পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। সংগ্রামী, জীবনযুদ্ধে অংশ গ্রহণের নিমিত্তেই এমন চরে তাঁর

আগমন। সারা জীবন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে আসা শিক্ষিত মণিমোহনের এমন দুর্গম চরে আগমনের প্রধান কারণ অর্থ রোজগার করা। ঔপন্যাসিক মণিমোহনকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আরো অনেকের সঙ্গে এক ঝাঁকে বি এস-সি পাশ করিয়া মণিমোহন আদানুন খাইয়া জীবন সংগ্রামে ভিড়িয়া গেল। অবশ্য বাঙালীর জীবন সংগ্রাম বলিতে যা বুঝায় ঠিক তা নয়। সংগ্রামটা যে কাহার সঙ্গে করিতে হইবে আজ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিত করিয়া বলা গেল না। এ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই–সফলতার কোনো নিদিষ্ট লক্ষ্য নাই–বাঁচিয়া থাকার একান্ত শক্তিহীন প্রয়াস মাত্র [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : এক, পৃ ২২১]

শহরের ছেলে মণিমোহন, পড়াশুনা আর অনেকটা ঘরকুনো স্বভাবের জন্য চাকুরির আগে শহরের বাইরে পা বাড়ায়নি। বড়জোড় বর্ধমান মেদেনীপুর, ওপারে রাণাঘাট এর বাইরে পা বাড়ায়নি। চাকুরিতে এসে বুঝেছে বইয়ের বাইরে একটি জগৎ আছে–

> পৃথিবীর আলাদা রূপ আছে–সে-রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না-দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করলজিহবা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে-গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংঙ্কে থর থর করিয়া দুলিতে থাকে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : এক, পৃ ২২৩]

বিবাহিত মণিমোহন চর অঞ্চলে নিঃস্ব একাকিত্বে ভোগে, স্ত্রীর চিঠির জন্য পোস্টমাস্টারের কাছে ধন্না দেয়। একেক সময় একেক জায়গায়/ গ্রামে তাকে খাজনা আদায় করতে যেতে হয়। এমনইভাবে বর্মি মেয়ে মা-ফুনের সঙ্গে পরিচয়। মা-ফুনের দেশ বার্মা, আঠারো-উনিশ বছর বয়স, সুশ্রী, ছিপছিপে, নীল চোখের মণি। মা-ফুন, তাঁর স্বামী মদ খায় বলে ইট দিয়ে মেরে মাথা ফেটে দিয়েছে। গ্রামে তহশীলদার মণিমোহন এলে মা-ফুন তার কাছে বিচার চায়। সরকারি বাবু আজ এর একটা সুরাহা করে না গেলে তার যে রেহাই নেই সেটাও স্পষ্ট করে বলে। এমনই সংঘাতময় পরিবেশের মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বর্মি মেয়ে মা-ফুনের আবির্ভাব।

অনির্বাণ আগুনের মতো রূপ– মনটাও তেমনি, মা-ফুনের আকর্ষণ অনিবার্য ভাবে টেনে নিতে পারে যে কোনো পুরুষকে। মণিমোহন এমনই আদিম আকর্ষণে মা-ফুনের ঘরে পৌঁছে যায়। মা-ফুনের ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে কোনো বর্ম নেই, মণিমোহনকে তার মনে ধরেছে, সেটা প্রকাশেও তার কোন বাঁধা নেই। ঔপন্যাসিক চমৎকার উপমায় মা-ফুনের আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন–

> বাঁশের মাচাটির উপরে ভালো করিয়া বসিয়া মনিমোহন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কেন এ সব তুমি করতে গেলে?
>
> মা-ফুন ঃ কেন করতে গেলুম?

– মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল

এা-ফুন ঃ তোমার বড্ড সুবিচার আছে সরকারী বাবু, তাই তোমাকে মনে ধরেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৮৬]

বর্মি মেয়ের এমন আচরণ পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মণিমোহনের কাছে নতুন। মা-ফুনের কাছে বসায় মণিমোহনের মনে হচ্ছিল, ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহিয়া সে গন্ধ সমস্ত শিরা উপশিরাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৮৬]

আসন্ন ঝড়ে মণিমোহন চলে যেতে চাইলে মা-ফুন তাকে ঘরে তোলে। ঝড়ের অন্ধকারে হিংস্র আদিম উগ্রতায় সে মণিমোহনকে ভোগ করে। মা-ফুনের কাছে মণিমোহন হার মানে। মা-ফুনের সম্মোহনে মণিমোহনের কেবল তার স্ত্রী রাণীর মুখই মনে আসে। বর্মিদের নারী হরণ যেমন নেশা তেমনি নারীদের পুরুষ কামনাও উগ্র। উপন্যাসে পাশাপাশি এমন দুটি দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুন জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে-মণিমোহন স্পষ্ট একখানা জ্বলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৮৭]

উপন্যাসের আর এক ব্যতিক্রমী চরিত্র পোস্টমাস্টার হরিদাস। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটি দার্শনিক বোঝাপড়ার মধ্যদিয়ে নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতির অখণ্ড সত্তার সঙ্গে মানব মনের মিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করাই যে প্রকৃত সুখ। সেই অনুসঙ্গকে উপজীব্য করে চরিত্রটি নির্মিত। প্রথম পর্ব মৃত্তিকাতেই আমরা হরিদাসের দর্শনের, চিন্তার পরিচয় পাই। যাযাবর জীবন কাটিয়েছে পোস্টমাস্টার। জীবনকে নিজের মতো করে উপভোগ করাই তার কাছে মানব জন্মের প্রকৃত সার্থকতা। ঔপন্যাসিক হরিদাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার দর্শনকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই সুযোগ ও সুবিধামতো তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কত নতুন প্রকৃতির মানুষ কত বিচিত্র রকমের রীতি-নীতি। নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : তিন, পৃ ২৩৭]

চর ইসমাইলে সঙ্গীহীন জীবন কাটালেও তিনি বিপত্নীক নন। রাগের মাথায় স্ত্রী চণ্ডীর গায়ে একদিক হাত তুলেছিলেন বলে ছেলেপিলে নিয়ে স্ত্রী জন্মের মতো বাপের বাড়ি চলে যায়। এসব নিয়ে তার আক্ষেপ নেই। অফিসের পিয়ন কেরামদ্দিকে সে বলে–

> ছেলেমেয়ে রয়েছে তো সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি ওই কাকের বাচ্চাগুলো পিচ্ছি দেবে, এই আশংকায় আমার বাপ ঠাকুরদা গয়ার প্রেত-শিলা থেকে মুক্ত কচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : চার, পৃ ২৪৫]

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও হরিদাসের স্ত্রীকে বারবার মনে পড়ে। হাঁপানির রোগী সে। হাঁপানির টানে যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে তখন চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে স্ত্রীর মুখখানা। বুকের উপর কোমল হাত বুলিয়ে দিলে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব হবে, এটা ভাবতে ভাবতে তাঁর দিন কাটে। সন্তানদের মুখ মনে আসে কিন্তু তবুও সে নিজের অবস্থান থেকে সরে না। তাদের খবর নেয় না বা নিজের কোনো খবর দেবার চেষ্টা করে না। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টারের মতো। একই নিঃস্ব হয়ে নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে থাকে। সব কিছুর উপরে এক ধরণের উদাসীনতা।

সময়ের ক্রমবিকাশের ধারায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চর ইসমাইলের ইতিহাসকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন পর্তুগিজ চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে। পর্তুগিজ পাড়ায় ডি-সুজা সকলের চেয়ে বয়সে বড় একটি চরিত্র। বাণিজ্য তার পেশা ও নেশা। ডি-সুজা আফিমের ব্যবসা করে বর্মিদের সঙ্গে মিলে। সুপারির কষ থেকে পাওয়া নেশা দ্রব্য ছাড়াও নদী পথে চালান হওয়া আফিম দলের সহযোগী হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব দীর্ঘদিন থেকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। নাতনি লিসিকে নিয়ে তাঁর সংসার। উপন্যাসের অন্যতম উজ্জ্বল নারী চরিত্র লিসি। পর্তুগীজ মেয়ে হলেও খানিকটা মগের রক্ত আছে লিসির মধ্যে। লিসির নাকটা একটু খর্বাকার এবং ভ্রূরেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। সবটা মিলিয়ে একটা অপরিচিত বৈশিষ্ট্য মুখে। বৃদ্ধ, দুর্ধর্ষ ঠাকুরদা ডি-সুজা লিসিকে ভয় পায়। অবশ্য এই ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে স্নেহ-ভালোবাসা। শৈশবে বাবা-মা হারা লিসি একটু জেদী কিন্তু স্বভাবে কোমল। ডি-সুজাকে সারাক্ষণ সে চোখে চোখে রাখে, শারীরিক খোঁজ খবর নেয়। জেদ, কোমলতা, দৈহিক সৌন্দর্য সব মিলিয়ে লিসি আকর্ষণীয়। লিসি চরিত্রের আর একটি দিক, উচ্চ কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। নিজের কথাটা স্পষ্ট করে বলার পাশাপাশি সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেও তৎপর। তাদের খোঁজখবর নেয়, বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। লিসির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণে পুরুষরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদিও তার আরো একটি কারণ হলো ডি-সুজার গোপন কারবার। তাই রূপ এবং রাজত্ব একত্রে পাওয়ার লোভে অনেক পুরুষই

তার পাণিপ্রার্থী। তাই লিসিকে নিয়ে ডি-সুজা সারাক্ষণ চিন্তা করতে থাকে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> লিসি বড় বিবাহযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোর্টশিপ করিবার ইচ্ছা অনেকটাই মনে মনে চাড়া দিতেছে। লিসির রংটা তামাটে আর নাকটা খাঁদা হইলেও মোটামুটি সুন্দরীই বলিতে হইবে তাহাকে। তাছাড়া নেপথ্য হইতে ডি-সুজা ধন-ভাণ্ডরের একটা দীপ্তি লিসির মুখে পড়িয়া তাহাকে আরো বেশি সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, লিসি ছাড়া ত্রিসংসারে ডি-সুজার আর কেউ আছে বলিয়া কাহারো জানা নাই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : চার, পৃ ২৪৪]

পাশের বাড়ির জোহানের সঙ্গে লিসির প্রেমের সম্পর্ক, যেটা কোনোভাবেই ডি-সুজা স্বীকৃতি দিতে নারাজ। জোহানও সেটা জানে যে, বুড়ো ডি-সুজা তাকে পছন্দ করে না। কোনো রকমের ফাক পেলেই ডি-সুজার অনুপস্থিতিতে জোহান লিসিকে দেখতে চলে আসে–

> ছেলেবেলা হইতেই সে ডি-সুজার বাড়িতে যাতায়াত করিতেছে, লিসির সঙ্গে একত্র হইয়া খেলা করিয়াছে। চট্ করিয়া তাহাকে কিছু একটা বলিয়া বসা যায় না। তা ছাড়া সে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া কখনো সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও ডি-সুজা অনুভব কওে তাহার অজ্ঞতার পশ্চাতে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে জোহান লিসিকে তাহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে, লিসির মনোজগতে ডি-সুজা এখন অনেকটা নেপথ্যে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : চার, পৃ ২৪৫]

প্রথম খণ্ডের শেষে লিসিকে বর্মিরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। মুলত পর্তুগিজদের রক্তে নারী হরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক লিসি চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। তাই সম্পূর্ণ উপন্যাসে লিসিকে পাওয়া যায় না, কোথায় যেন সে হারিয়ে যায়।

প্রতিবেশী জোহানকে ডি-সুজা পছন্দ করলেও লিসির জন্য মানতে পারেন না। কারণ নাতনির প্রণয়কেও তিনি ব্যবসার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান। নিজের আর্থিক উন্নতি, গোপন ব্যবসা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি লিসির ভালো মন্দকে একত্রিত করতে চান। লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> পাত্র হিসেবে জোহান নিতান্ত অযোগ্য নয়, কিন্তু দিনের পর দিন যে সে অধিকার বিস্তার করিয়া ডি-সুজার মন হইতে লিসিকে ছিনাইয়া লইতেছে এ অপরাধ ক্ষমা করিবার নয়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা : এক, পৃ ২১৮]

ডি-সুজার বয়স হয়েছে কিন্তু রক্তের জোর মরেনি। অত্যন্ত পরিশ্রমী ডি-সুজা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন –

> এই বয়সেও তাহাকে নৌকা লইয়া প্রায়ই ঘুরিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে শহরে যায়। দুইবার তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল। কিন্তু সে মরে নাই। প্রথম বারে রাতারাতি মাইল ত্রিশের সাঁতরাইয়া সে পটুয়াখালির এক চরে হোগলার বনে গিয়ে উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে শ্যামের হাটের খেয়া ডুবিলে সে এক বোঝা পানের সহায়তা তেঁতুলিয়ার ভৈবর রূপকে অস্বীকার করিয়াই পাড়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা: চার, পৃ ২৪৩]

ডি-সুজার গঞ্জালেসকে পছন্দ করে লিসির জন্য। কারণ গঞ্জালেসের ব্যবসা ডি-সুজার চেয়ে বড়। গঞ্জালেসদের ব্যবসা মুলত সুঁটকির। গঞ্জালেসের সুঁটকি মাছের কারবার চট্টগামের নিম্নবাংলা থেকে শুরু করে 'ঙাপ্পির' দেশ ব্রহ্ম এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। লেখক গঞ্জালেসকে উপন্যাসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

> গঞ্জালেসের পূর্বপুরুদের দস্যবৃত্তি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিটাকে গঞ্জালেস আজ পর্যন্ত জীয়াইয়া রাখিয়াছে। নানা ঘটনাচক্রে ডি-সুজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং সেই হইতেই ডি-সুজা তাহাকে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মৃত্তিকা: চার, পৃ ২৪৬]

লিসি জোহানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। জোহান ডি-সুজার হিংস্র গহ্বর থেকে লিসিকে বের করে পালিয়ে যেতে চায় মামার কাছে। মামা চিদাম্বরম মাদ্রাজে থাকে। জোহান লিসিকে নিয়ে নিজেদের একান্ত রাজ্য স্থাপন করতে চায়। যেখানে চর ইসমাইলের মতো উপকুল থাকবে না, হানাহানি থাকবে না। শান্ত মাদ্রাজ নগরীতে তারা শান্তিতে বসবাস করবে।

বর্মি ব্যবসায়ীরা ডি-সুজার কাছে ব্যবসার সূত্রে যাতায়াত করে। তদেরই একজন লিসিকে শেষ পর্যন্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। চুড়ান্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। জোহানের পালিয়ে যাবার স্বপ্ন বৃথা যায়। গঞ্জালেসের প্রতিপত্তি, বুড়োর গুপ্তধনসহ সুন্দরী নাতনি লিসিকে গ্রাস করবার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই থেকে যায়। আর তার প্রতিশোধ দিতে হয় খোদ ডি-সুজাকেই। নিজের খুনের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

'ফসল' অংশের পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে রূপক হিসেবে ঔপন্যাসিক ঝড়কে উপজীব্য করেছেন। সেই ঝড়ের মধ্যে জোহান নৌকা প্রস্তুত করে রাখে লিসিকে নিয়ে পালাবে বলে। কিন্তু ঘটনার ভয়াবহতা সেই স্বপ্নকে নষ্ট করে দেয়। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> পিছন থেকে ধারালো একটা দায়ের কোপে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিটকিয়া তিন হাত দূরে চলিয়া গেল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৯৩]

'মৃত্তিকা' পর্বে উপন্যাসের কাহিনী প্রাথমিক পরিচয় ও সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রাধান্য বিস্তার করলেও 'ফসল' পর্বে তা নানা দ্বান্দ্বিককতার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। সরকারি তহশীদার মণিমোহন বর্মি কন্যা মা-ফুনের যৌন লালসার স্বীকার হয়। মণিমোহন তেঁতুলিয়ার মোহনা ছাড়িয়ে 'চর কুকরার'র দীর্ঘ নারিকেল বীথি ডিঙ্গিয়ে মা-ফুনের ঘরে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে বর্মি কন্যা খুশি হয়। ঔপন্যাসিক 'ফসল' পর্বে পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদের মণিমোহনের মনস্তত্ত্ব চমৎকারভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মণিমোহন কেন যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এতদূরে মা-ফুনের ঘরে এসে উপস্থিত হয় সেটা যেন সে নিজেই জানে না। মণিমোহনের স্ত্রী রাণির কথা আবার মনে আসে– 'রাণি কি কলকাতার সুন্দর ঘরে বসে এই বিস্তৃত চরের অবস্থা কল্পনা করতে পারবে?' মণিমোহন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। আকাশে ঝরের আলামত দেখে উঠে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু বর্মি কন্যা মা-ফুন তো এত সহজে তাকে ছাড়বার পাত্র নয়। সে মণিমোহনকে ভয় দেখায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা থেকেই তা তুলে ধরা যেতে পারে–

> মা-ফুন মণিমোহনের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে টানিয়া আনিল। খোলা জানালা দিয়া ঝাপ্টায় বাঁশের পাতা আসিয়া, পাল্লা দুইটাকে ক্রমাগত আছড়াইতেছে। মা-ফুন জানালাটাকে বন্ধ করিয়া দিতে না দিতেই বার কয়েক দপ্ দপ্ করিয়া ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়া গেল।
>
> এমনি করিয়া ঝড় আসাটা পশ্চিমবঙ্গের ছেলের জীবনে অভিনব, তাই মণিমোহন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল– মুখ দিয়া তাহার অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ বাহির হইল শুধু।
>
> পরক্ষণেই সে অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কোমল-দেহের একটা অত্যন্ত কঠিন বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরিচিত সুগন্ধিটার গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মে রূপান্তরিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলির উপরে কাজ করিতে চায়।
>
> চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল–তাহার মনের সামনে রাণীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। শরীরের প্রতিটি লোমকূপে যেন অসহ্য অনুভূতি উগ্র হইয়া উঠিতেছে।

> কিন্তু ছাড়াইতে চাইলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল : এখন তুমি আমার–আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৮৮]

অন্যদিকে সন্তানসম্ভাবা মুক্তোর মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন বলরামের নজরেই আসেনা। মুক্তোর মন খারাপ দেখে তাঁকে খুশি করবার জন্য বলরাম ময়ুরকণ্ঠি শাড়ি নিয়ে আনে। কিন্তু শাড়ি দেখেও মুক্তো খুশি হয় না। বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করতে গেলে মুক্তো একটা ঝট্‌কা মেরে তাকে সরিয়ে দেয়। শান্ত মুক্তোর আকস্মিক এমন ব্যবহারে বলরাম বিমূঢ় হয়ে যায়। মুক্তো ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কেন, বলরাম তাঁর এমন করলো। ঔপন্যাসিক প্রকৃতি সঙ্গে মিলিয়ে স্থানটি বর্ণনা করেছেন–

> জানালা দিয়ে বিদ্যুতের আর এক ঝলক আলো আসিয়া মুক্তোর সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়ে গেল। বলারাম স্পষ্ট দেখিলেন, আসন্ন মাতৃত্বের স্নিগ্ধ কোমল একটা শ্রী-সম্পাতে সে যেন অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশীর্ণ মুখ, তাহার মলিন চক্ষু এবং পূর্বের ব্যবহারগুলি–সব কিছু মিলাইয়া বলরামের যেন কোথাও সন্দেহের আভাসমাত্র আর অবশিষ্ট রইল না। বিস্ময়ে ভয়ে যেন মূঢ় হইয়া গেলেন তিনি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৯০]

জোহান-লিসির সম্পর্কের একটা পরিণতিও এই পর্বে লক্ষ করা যায়। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত করে জোহান লিসির জন্য প্রতীক্ষা করছে। দুজনে পালিয়ে যাবে, চরের দূর্ধষ জীবনের বাইরে নতুন জীবনের দিকে। সে রেলে চাকুরি করবে, লাল ইটের ছোট্ট একটা কোয়াটার হবে তাঁর। সারাদিনের শ্রান্তি নিয়ে জোহান ঘরে ফিরলে লিসি তাকে গরম পানি এগিয়ে দেবে। জোহান এসব ভাবতে ভাবতে লিসি নৌকার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঔপন্যাসিক প্রথম খণ্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটির বর্ননা দিয়েছেন এভাবে–

> জোহান আগ্রহভরে তাঁহাকে (লিসিকে নৌকায়) তুলে নেয়, কথা শেষ করতে পারিল না... পেছন থেকে ধারালো একটি দায়ের কোপ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিট্‌কিয়া তিন হাত দূরে চলিয়া গেল।
>
> লিসি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শাদা হইয়া গেছে। অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করিয়া সে বলিল, একি হল?
>
> বর্মীটা হাসিতেই ছিল।
>
> লিসি বলিল, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।
>
> সে বলিল, না। কিন্তু দরকার ছিল।

> লিসি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডি-সুজাকে অপমান করার জন্য জোহানকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায় ভাবিয়াছিল ঘা কতক খাইয়াই শায়েস্তা হইয়া যাক লোকটা। কিন্তু যা ঘটিল তা প্রলয়–আকাশ-পটে অরণ্যকে ঝড়ের হুঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া তাহারও পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৯৩]

লিসি জ্ঞান হারালে শত্রু বাহিনী তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। ডি-সুজার কাছে লিসিকে অপহরণের বিনিময়ে তারা এখন মোটা টাকা দাবি করবে। এর পরে প্রকৃতিতে ঝড় আছে। ঔপন্যাসিক একেবারে শেষে সেই বর্ণনাই তুলে ধরেছেন–

> ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিয়াছে বর্জবার পাল। নদীর কালো জল বিদ্যুৎতের আলোয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্নদাঁত মেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অট্টহাসি করিতেছে। তিন শতাব্দী আগে বড় বড় কামান লইয়া হার্মাদদের বোম্বাটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নোনা-মোহনায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল। তাহার জের আজও মিটিয়া যায় নাই। দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর পার হইয়া তাহারই নিঃশব্দ ধারা বহিয়া চলিতেছে। বর্বরতা দিয়ে যে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছে বর্বরতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে আর একদিন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ফসল : পাঁচ, পৃ ২৯৩]

উপনিবেশ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে সরাসরি রাজনীতি দৃশ্যমান হয় না। যদিও দ্বিতীয় খণ্ডে ঔপন্যাসিক পর্তুগিজদের সঙ্গে মগ ও আরকানদের বিরোধের চিত্র তুলে এনেছেন। লিসিকে অপহরণের মধ্য দিয়ে চর ইসমাইলে ক্ষমতার পালাবদলের চিত্র অঙ্কন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। লিসি ছিল ডি-সুজা সম্পদ, সেটা বুঝেই বর্মীরা তাকে অপহরণ করে। এর ফলে ডি-সুজা মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে যায়। ব্যবসা থেকে মন উঠে যায়। ক্ষয় হতে শুরু করে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি। ঔপন্যাসিক এখানে পতুর্গিজ ও বর্মীদের চিরাচরিত দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে চর ইসমাইলের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। চর ইসমাইলে ডি-সুজায় ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে, বর্মীরা প্রথমে কেন্দ্রে আহত করে পরবর্তীতে পুরো চরের দখল নিয়ে প্রবৃত্ত হয়। ঔপন্যাসিক চর ইসমাইলের কাহিনীকে বড় পরিসরে তুলে দরবার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চর ইসমাইলের মতো একটি ক্ষুদ্র জায়গাতেও যে কত ভাঙন ঘটেছে-তার চিত্র ঔপন্যাসিক পরবর্তী খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। কেন্দ্রের পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র জেলে পাড়াতেও যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে, সেই চিত্র তুলে আনতেও ঔপন্যাসিক ভোলেননি।

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশ [দ্বিতীয় খণ্ড]

তিন খণ্ডে রচিত *উপনিবেশ* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রতিভার অন্যতম ফসল। 'চর ইসমাইল' নামক ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীর অবয়ব গড়ে তুললেও এখানে একই সঙ্গে তিনি নানা দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলো ঐতিহাসিক দিক থেকে তুলে আনায় এক্ষেত্রে লেখকের সচেতন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এক বিশাল জীবন ও জগৎকে তুলে ধরার প্রয়াসে ঔপন্যাসিক সময়ের বর্তমান পটভূমি অতিক্রম করে জীবনের এক বিস্তৃত অনাগত কালের দিকে যাত্রা করেছেন।

উপনিবেশ 'দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। প্রথম প্রকাশক-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে বা্ক সাহিত্য। এটিও ধারাবাহিকভাবে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথম খণ্ডের মতো দুইটি অংশে বিভক্ত; ১. বিভ্রান্ত বসন্ত ২. চৈতালী। প্রথম খণ্ডের কাহিনীর ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় খণ্ডের যাত্রা শুরু। বিভ্রান্ত বসন্ত অংশ আবার ছয়টি পরিচ্ছেদ বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে প্রথম খণ্ডের শেষের ছ-মাসের আগের ঘটনা থেকে। ঔপন্যাসিক প্রথম খণ্ডটি একটি ক্লাইম্যাক্স দিয়ে শেষ করলেও দ্বিতীয় খণ্ড সেখান থেকে শুরু করেন নি। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আশা দেবী ও অরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–

> চর ইসমাইল শিশু। শিশুর মতো অপরিণত–শিশুর মতো নিজেকে ভাঙ্গিয়া চলে। চূর্ণ খেলনার ধূলি ভাটার টানে নামিয়া যায় বঙ্গোপসাগরে। দেহ আর মনের ক্ষুধা আদিম অমার্জিত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অতীত নাই–কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাহর নিঃশ্বাস এখনো ফুলের গন্ধের মতো ছড়াইয়া আছে।[৯]

'বিভ্রান্ত বসন্ত'র প্রথম পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন–'মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাস? ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদিন?' উপন্যাসের শুরুতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পাঠককে- ইতিহাস যে মানুষকে রচনা করে সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মানুষের ইতিহাস নির্মাণের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ মানুষ কিভাবে ইতিহাস নির্মাণ করে সেটা সাধারণভাবে সবারই জানা। অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষ বারবার নিজের ইতিহাস নির্মাণ করেছে। সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে মানুষের পথ চলা শুরু হয়েছে। তারও আগে ছিল বরফ যুগ। শীতল পৃথিবী ক্রমান্বয়ে উষ্ণ হয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়েছে। আদিম সমাজ থেকে মানুষ ধীরে কৃষিভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করেছে। এরপরে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার মধ্য দিয়ে মূলত শুরু হয়

ইতিহাসের নতুন বাঁক পরিবর্তন। মানুষ নতুন দেশ আবিষ্কার করতে থাকে, ফলে বাণিজ্য বিকশিত হয়। এক দেশ আর এক দেশকে শাসন করে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল ঘটে। কৃষিভিত্তির সমাজ ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী সমাজের রূপ পায়। এখন বাণিজ্য সারা বিশ্ব পরিচালনা করে। পুঁজির নব নব রূপের বিবর্তন, পূনর্গঠন সংগঠিত হয়। কোথাও সভ্যতা ধ্বংস হয় আবার কোথাও নির্মিত হয়। মানুষের জ্ঞান, মেধা, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে নতুন ইতিহাসের সূচনা ঘটে। এখন সারা বিশ্বব্যাপী পুঁজির একক আধিপত্যের কারণে পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী রূপ পেয়েছে। এই ইতিহাস মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের নির্মাণের প্রয়াস।

কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। যে প্রকৃতিকে আজ মানুষ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে সেই প্রকৃতিই কোথাও কোথাও নতুন ইতিহাস নির্মাণ করেছে, পুরোনো ইতিহাস, জনজীবন, সংস্কৃতিকে ভেঙে দিয়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *উপনিবেশ* উপন্যাসে এই প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গটিই উত্থাপন করেছেন। তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন প্রাকৃতির কারণে মানুষের ইতিহাসের নবনির্মিতির প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের বাণিজ্য, আধিপত্য বিস্তার প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতেই বলেছেন–

> ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। দুশো বছর ধরিয়া পর্তুগীজেরা কী না করিয়াছে ভারতবর্ষের উপরে। ঝড়ের রাত্রে বাসুকির ফণার মতো নীল সমুদ্র যখন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোম্বেটে জাহাজের পালগুলি তখন ঝড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডানার মতো তাহারি উপর দিয়া উড়িয়া গেছে। অন্ধকার–স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে অন্ধকার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্র আর্তনাদ করিতেছে পিঁজরায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মতো। আর সেই সমুদ্র আছড়াইয়া পড়িতেছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় দৈত্যের মতো গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে। মৃত্যুর প্রতীক কালো অ্যাল্‌বাট্রসের কান্না ছাপাইয়া উঠিতেছে সমুদ্রের মত্ত হুংকারকে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : এক, পৃ ৩]

মানুষের ইতিহাস নির্মাণের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন–

> ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। কোথায় ককেসাস্ পাহাড়ের তলা হইতে প্রথম আসিয়াছিল যাযাবর মানুষের দল। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত পশুশৌর্য গেল তলাইয়া। শক আসিল, হূণ আসিল, গ্রীক্ আসিল, মুসলমান আসিল–কুম্ভকর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিন দিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না। পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্তমানের সূর্যও তো একদিন অস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না–এমন ভবিষ্যবাণী আজ কে করিতে পারে? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : এক, পৃ ৪]

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে এসেছে ডি-সুজা, লিসি এদের প্রসঙ্গ। ঔপন্যাসিক তার স্বভাবসুলভ রসবোধ প্রয়োগে দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীকে একটু পেছন থেকে শুরু করেছেন। পুরো উপন্যাস (৩ খণ্ড) তিন শ্রেণির, তিন ধরনের জীবন যাত্রার চক্রাকারে আবদ্ধ। ক্ষমতা কাঠামোকে অর্থাৎ রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কাহিনীকে পরিচালনা করেছেন। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, দক্ষতায় উপন্যাসটি বুনন করেছেন তিনি। ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে যুগ যুগ ধরেই যে মানুষের ইতিহাস বদলে গেছে তারই রূপায়ন *উপনিবেশ* উপন্যাসের মূল সুর। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ঘটনার মধ্য দিয়ে *উপনিবেশ* উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তুললেও সমকালীন রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রকেই এর মধ্য দিয়েই প্রতীকি হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে নিজস্ব অবস্থান তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যেমন 'চৈতালী' অংশের পাঁচটি পরিচ্ছেদ–যার প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে 'মণিমোহনের ডাইরী থেকে'। আবার পঞ্চম পরিচ্ছেদে মণিমোহন তাঁর স্ত্রী, রাণীকে চিঠি লেখে। এই চিঠি লেখার ছলে মণিমোহন নিজের মনের সঙ্গে হিসেব নিকাশ মিলিয়ে নেয়, সেখানে লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, বোঝাপড়াটা যেন লেখক নিজের সঙ্গে নিজেই করেছেন। মণিমোহন কিংবা তার ডাইরী সেখানে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি অংশেই ঔপন্যাসিক দার্শনিকতা এবং তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। শুরুর প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, ঔপন্যাসিক এখানে গভীর কোনো সত্য, যা নিজের উপলব্ধিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চান। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত- চিরায়ত এই দার্শনিক সত্যকে ঔপন্যাসিক তিনটি খণ্ডের মধ্য দিয়েই তুলে ধরার সচেতন চেষ্টা করেছেন। যেমন, প্রথম খণ্ডে–পোস্টমাস্টার হরিদাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'প্রকৃতি ও মানুষের অখণ্ডতা' উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। আর দ্বিতীয় খণ্ডে দার্শনিক বোধের প্রকাশ ঘটে মণিমোহনের মধ্য দিয়ে। 'মণিমোহনের ডাইরী থেকে' উদ্ধৃত করলে দেখা যায় সেখানে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন, বলেছেন–

> জীবনকে যদি প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তো বিচ্ছিন্ন করা যায় না-তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে ঘুরিয়া চলিবে। তাই এই চর ইসমাইলে, এই কালুপাড়ায়-তেঁতুলিয়ার মোহনায় এই সবটা জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে।
>
> মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্বুদ। তবু পৃথিবী লইয়া মানুষ আর মানুষ লইয়া পৃথিবী। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী : এক, পৃ ৫৩]

চর ইসমাইল ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ও পরিবেশ নিয়ে *উপনিবেশ* উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। তবে *উপনিবেশ* ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাসুলিবাঁকের উপকথা* (আষাঢ় ১৩৫৪), সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোড়াই চরিত মানস* (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১) অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬), এবং সমরেস বসুর *গঙ্গা* ইত্যাদি উপন্যাসে একটা অঞ্চল ও পরিবেশ এবং সমাজ-সংস্কার যেভাবে চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক তেমনভাবে *উপনিবেশে* 'চর ইসমাইল'-এর চিত্র অঙ্কন করেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত প্রতীকী তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়। তিনি সারাসরি না বলে প্রতীকের মাধ্যমে, কখনও রূপকের মাধমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তবে একথা স্বীকার্য যে *উপনিবেশে* নিম্ন বাংলার সেই অঞ্চল যেখানে নদী আর সমুদ্র এক হয়ে গেছে, আধুনিক সভ্যতার কোনো ছাপ সেখানে নেই। সেখানকার মানুষ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দুর্ধর্ষ জলদস্যু পোর্তুগিজদের ক্ষয়িষ্ণু অথচ উগ্র জীবনধারার শেষ অস্ত-আভায় লালিত, সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের সংস্কার, কামনা-বাসনা, প্রেম-অনুরাগ, হিংসা, ঈর্ষাকে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনিবেশ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন–

> বাঙালীর জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশে আধুনিক যুগের যে সমস্থ ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতুহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও শ্রেষ্ঠতম।[১০]

সব ছাড়িয়ে *উপনিবেশ* একান্তই আঞ্চলিক উপন্যাস না হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় আঞ্চলিকতা ও ইতিহাসের ধারাকে ধরবার স্বচ্ছন্দ ইচ্ছে তিন খণ্ড জুড়েই লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডে এসে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ প্রীতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস তাঁর রচনায় বারবার বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের উপসংহারে এসে দেখি পুরোনো উপনিবেশ ও সমাজ-শাসন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর সেখানে সামুদ্রিক বহুভূজের মত কালো কালো বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে নব্য-সভ্যতা। আদি সত্তার রক্তে এ রীতিনীতিতে রাঙানো পর্তুগিজদের সেই সব উপনিবেশ আজ মিলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অজানা গর্ভে অথবা কালস্রোতে। এখন সেই উপনিবেশ ক্ষীণধারায় প্রবাহ পেরিয়ে ডি-সিলভা, ডি-সুজা কিংবা গঞ্জালেসদের রক্তে কিন্তু তারাও নবযুগের স্রোতে ভাসমান জমিতে লাঙ্গল ঠেলে শুটঁকি মাছের ব্যবসা করে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনের দ্রুত পরিবর্তনের ইঙ্গিতও উপন্যাসে আছে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> কিন্তু চর পড়িয়াছে নদীতে। গঙ্গার ব-দ্বীপের প্রাণ প্রবাহিনীতে শিরা উপশিরা গুলিতে মৃত্যুর মন্থরতা। সামুদ্রিক বহুভূজের মতো, কালো কালো বাহু বাড়াইয়া দিতেছে নূতন সভ্যতা, কলে কারখানায় বন্দী বিদ্যুৎতের আর্তনাদ। আরো দশ বছর পরে যারা এখানে আসিবে, তারা দেখিবে কত বড় হইয়াছে চর ইসমাইল। সভ্য শিক্ষিত মানুষ। নদী শান্ত এবং অহিংসা, এখানে ওখানে চর পড়িয়া গোটা চেহারাটাই তাহার বদলাইয়া গেছে। আর এস. এন কোম্পানির নূতন লাইন স্টিমার যাতায়াত করে, ফাস্ট ক্লাসের ডেকে বসিয়া প্রেমালাপ জমায় আধুনিক দম্পতি। শহর আর শিক্ষার প্রভাবে উপনিবেশ সমুজ্জ্বল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী : এক, পৃ ৮৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন পাওয়া যায় বর্তমান কাল ও নব্যকালের দ্বন্দ্ব – সেখানে পুরোনো কাল পরাভূত, মাথা তুলেছে নতুন কাল, যেটা সময়ের একটা চিরন্তন সত্য রূপ। তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও পাওয়া যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অঞ্চল অনুযায়ী চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে ভোলেননি। উপন্যাসের প্রথম পর্বে তিনি পুর্তগিজদের এ অঞ্চলে আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি গাজী-র পরিচয় দান করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস নির্মাণের কলাকৌশল এখানে নজরে পড়ে। দ্বিতীয় অংশ 'চৈতালীর' তৃতীয় পরিচ্ছেদে গাজীর চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর ঐতিহাসিকতা ব্যাখ্যা করেছেন–

> খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মুসলমান ক্ষাত্র-শক্তির প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্য-সমাগত সেন-বংশের রাস্ট্রিক কাঠামোতে তখন ঘূণ ধরিয়াছে; হিন্দু ধর্মের নবীন-অভ্যুত্থানের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার চলিতেছে, লৌকিক সংস্কারের কঠিন-নাগপাশে জাতির শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় এবং কামতন্ত্রতার প্রশ্রয়ে রাজসভায় রসের স্রোত বহিতেছে।...মুসলমান রাজারাই যে কেবলমাত্র তখন দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা নয়। এতদল ধর্মোন্মত্ত ফকির এই ভারটি গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইসলামের ছত্র-ছায়ায় আনিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরেরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবদের মতো অহিংস ছিলেন না–তাঁহাদের কোরাণ আর তরবারি পাশাপাশি চলিত। বাহুবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইসলামের দীক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের কীর্তি-কলাপের সীমা-সংখ্যা নাই। নিম্ন বাংলার দুর্গমতম স্থলেও অভিযান করিয়া এই ফকিররা যেভাবে তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছেন–একমাত্র আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদেরই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বাংলা দেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্যেও বিরাট কৃতিত্ব বহু পরিমাণে এই ফকিরেরাই দাবি করিতে পারেন।
>
> এই অসিধারী ফকিরেরাই সে যুগে গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী : তিন, পৃ ৬১-৬২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে বা বঙ্কিমীরীতির ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণত ঐতিহাসিক ঘটনা-কাহিনী ও ইতিহাস স্বীকৃত চরিত্রগুলির দ্বারাই ঐতিহাসিক কাহিনী অংশটি র্নিমিত হয়। আবার এর সঙ্গে থাকে লেখকের জীবনদর্শনপুষ্ট একটি উপকাহিনী বা কল্পিত কাহিনী। এই ব্যাপারটি মোটামুটি ১৯৩০ সাল অবধি প্রচলিত ছিল। তারপর ঐতিহাসিক উপন্যাস এলো সমকালীন বস্তুসচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা নিয়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই পর্বে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলিকে নবরূপ দান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সচেতনভাবে দেখালেন যে, ইতিহাসের ঘটনা বা কাহিনী কিংবা চরিত্র থাকলেই একটি কাল বা সময়ের পরিমণ্ডল নির্মিত হয় না। একটি কালের ইতিহাস বলতে সেই সময়ের সামজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় সংস্কার ও প্রথার পূন্য নবীকরণ। ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নব কাঠামো, নতুনতর গৌবর দান করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ডি-সুজার গোপন ব্যবাসার পরিচয় আমরা প্রথম পর্বেই পেয়েছিলাম। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এসে ঔপন্যাসিক সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেছেন। বর্মীদের সঙ্গে মিলিয়ে ডি-সুজা আফিমের কারবার করে। সেটার গ্রাহক গাজী (গাজী নামে পরিচিত),নূরুল গাজী। গাজীর কাছে কলকাতা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে আফিম নিয়ে যায়। শুধুমাত্র গাজীদের এই করবার নয়, এর পাশাপাশি তাদের ডাকাতি, নারী লিপ্সা কিংবা নিজের কাজের জন্য যখন তখন যাকে তাকে জবাই করে দিতেও পটুতা লক্ষণীয়। সদরের পুলিশ–সরকারি লোক, তাদের ভয়ে থাকে। তাদের অঞ্চলের জলপুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে। ডি-সুজা যখন এই কারবার থেকে অব্যাহতি চায় তখন তাকে ভয় দেখানো হয়। বর্মিরা তাকে বিশ্বাস করতে চায় না। যদি সে বের হয়ে গিয়ে সবাইকে ধরিয়ে দেয়? ফলে এক অলঙ্ঘনীয় বন্ধন আবদ্ধ হয় ডি-সুজা। যেখান থেকে মৃত্যু ছাড়া বের হবার কোনো উপায় নেই তাঁর। বুড়ো ডি-সুজা সম্পর্কে তাঁর অন্য কারবারিদের মনোভাব বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে–

> সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন। অবিশ্বাস, মিথ্যা আর অন্যায় লইয়াই যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালাইল, বুড়ো বয়সে দলকে ধরাইয়া দিয়া সে যে মোটারকম একটা কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিবে সেটা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক হয় না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : চার , পৃ ২৮]

নূরুল গাজী সুপারির কারবারের পরেও নতুন কারবার খোঁজে। কিভাবে আফিমের কারবার করা যায় তা নিয়ে আলাপ করছিল ডি-সুজার সঙ্গে। ডি-সুজাকে নিয়ে বর্মিরা যখন নৌকা করে গাজীর আস্তানায় যাচ্ছিল তখন এসব নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ হয়। চালাক ব্যক্তি গাজী সাহেব। ডি-সুজা বলে, এদিকে

তো ঢের জমিদারী আছে, আফিমের কাজেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না। আবার ডাকাতির ব্যবসাও চলছে বেশ। বর্মিদের বলে ডি-সুজা যদি আরো কিছু কোকেনের ব্যবস্থা করে তাহলে ব্যবসাটা আরো ভালো জমতো। কারণ কলকাতার পার্টির কাছে কোকেনের চাহিদা আছে। সুতরাং যে বিক্রি সমস্যা হবে না।

ঔপন্যাসিক গাজীদের অবস্থা তুলে এনেছেন মূলত ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে। পর্তুগিজদের অবস্থানে কিভাবে মুসলমানরা এসে বাণিজ্য দখল করছে সেই দ্বন্দ্বপূর্ন পরিস্থিতিকে তুলে ধরবার জন্য। পর্তুগিজদের সহায়তায় প্রথমে বাণিজ্য দখল করে মুসলমানরা এরপরে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মুসলমানদের বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার প্রসঙ্গেও পাশাপাশি তাদের চরিত্র্যের দিকগলোও তুলে এসছেন। বিশেষত সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনাচারণ, স্বভাব ইত্যাদি দিকগুলো নানা ভাবে নানা মাত্রায় অঙ্কিত করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন, গাজী বনেদী কায়দায় আপ্যায়নের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে–

> ভালো পোলাও মাংস, আস্ত মুরগীর রোস্ট, পায়েসের বন্দোবস্তও আছে। সর্বশেষে আসিল বোতল। গাজী সাহেব নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, মদ স্পর্শ করেন না। সবটাই ডি-সুজার জন্য। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : চার , পৃ ২৯]

গাজী সাহেবের নারীর প্রতি কৌতুহলের চরিত্রও আমরা এ পর্বে পাই। তিনি কবিরাজ বলরামের বাড়ি যান ঔষধ নিতে। তার বয়স পঞ্চাশ বছর কিন্তু তার জীবনীশক্তি বাড়ানো চাই। ঔপন্যাসিক একই মধ্যে নারীর প্রতি গাজীর আগ্রহের মানসিকতা জানিয়েছে। কারবারিদের সঙ্গে আলাপে পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে জানা যায়, গাজী মুসলিম ধর্মের রীতি অনুযায়ি চারটি বিয়ের বৈধতা প্রসঙ্গে বলেছেন। শরীরকে আরো সুস্থ্য রাখার জন্য গাজী বলরাম ডাক্তারের যায়। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> গাজী সাহেব দ্বিধা করলেন, কাশিলেন একটু, কহিলেন, এই যাতে-মানে-জীবনী-শক্তিটা একটু-মানে বাকিটা তিনি চাপা স্বরে বলরামের কানে কানে কহিলেন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : চার , পৃ ৩৩]

কবিরাজের বাড়িতে মুক্তোর সঙ্গে গাজী সাহেবের দেখা হয়। প্রথমে দুই একবার হালকা দেখা হয়। পরবর্তীকালে গাজী ঘন ঘন কবিরাজের বাড়িতে আসা শুরু করে। কবিরাজ কখন বাড়িতে থাকে না সেই

সুযোগ বুঝে গাজী মুক্তোর কাছে আসে। শেষ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, মুক্তো গাজী সাহেবের সঙ্গে চলে গেছে স্বেচ্ছায়। কবিরাজের চাকর বলরামের কাছে সেটাই জানা যায়। বলরামের চাকরের ভাষায়–

> ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে দিদিমণি? তোমাকে খরব দিতেও নিষেধ করলে। বললে বাবুকে বলিস, আমি চলে গেলাম গাজী সাহেবের সঙ্গে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : পাঁচ , পৃ ৮৩]

প্রথম পর্বেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন কবিরাজ বলরামের আশ্রিতা মুক্তো সন্তান ধারণ করেছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে মুক্তোর মানসিক অবস্থা লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। আগের ঘরে দশ বছর সংসার করলেও মুক্তোর কোনো সন্তান হয়নি। তাই গর্ভের সন্তানের প্রতি একধরনের মমতাবোধ করে সে। সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলেও তাই এই সন্তানকে সে নষ্ট করতে চায় না। মুক্তোর মাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন লেখক এভাবে–

> তাহার দেহের অভ্যন্তরে ছোট একটি মাংসপিণ্ডের আকারে একটা নূতন বিস্ময় রূপ পাইতেছে। নিজের রক্ত দিয়া, আয়ু দিয়া মুক্তো পালন করিতেছে তাহাকে-গড়িয়া তুলিতেছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাকে পূর্ণ করিয়া। নিজের মধ্যে এই বিরাট শক্তি– এই বিশাল সৃষ্টি- ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আজ আর মুক্তোর বিস্ময়ের সীমা রইল না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : পাঁচ, পৃ ৩৯]

মুক্তো আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েও করতে পারেননি। আবার মনের মধ্যে ভয় কবিরাজ সন্তানটিকে জীবিত থাকতে দেবে না। তাই বলরামের সঙ্গে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত মুক্তো। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ঔপন্যাসিক একটা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিষয়টির মীমাংসা করেছেন। বলরাম মুক্তোর ঘরে গেলে মুক্তো তাকে ধাক্কা দেয়, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে সিঁড়িতে পড়ে যায় মুক্তো। ঔপন্যাসিক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> টর্চের আলোয় বলরাম দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিঃশ্বাস তাহার উবুড় হইয়া খুবড়াইয়া পড়া দেহটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর গল্ গল্ করিয়া নামিয়া আসা কাঁচা রক্তে যেন স্নান করিতেছে সে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী : তিন , পৃ ২১-২২]

প্রথম পর্বে *উপনিবেশের* নায়ক মণিমোহনকে এ পর্বে আরও বিভ্রান্ত, আত্মমগ্ন অবস্থায় লক্ষ করা যায়। ঝড়ের রাতে সেই বর্মী মেয়ের যৌন ক্ষুধার স্বীকার মণিমোহন এখন পর্যন্ত নিজের কাছে বিশ্বাস করাতে পারে না যে সেটা রাণী (তার স্ত্রী) ছিল না। ঝড়ের পরে সেখান থেকে বেড়িয়ে এলেও তাঁর নিজের শরীরটাকে অশুচি মনে হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর মনের অবস্থা তুলে ধরেছেন এভাবে–

> ক্ষুধা কেমন তীব্র হইতে পারে মানুষের, আর কেমন অসংকোচেই সেটা যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিধা নাই, ভাবনা নাই। কী করিতে পারে এবং কী যে হইতে পারে না তাহা লইয়া বিচলিত হওয়া অসম্ভব এবং অবান্তর। রূপকে যদি আগুন বলা যায় হইলে সে রূপের দাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর একটুকু সংশয় নাই মণিমোহনের মনে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : তিন , পৃ ২০]

বারবার মণিমোহনের 'চর ইসমাইল'-এর প্রতিটি কাজে, নিজের চিন্তায়, মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। সরকারি কোষাগারকে পূর্ণ করবার দায়িত্ব তাঁর কিন্তু কলকাতার ছেলে মণিমোহন, তার নিজের বি.এ পাশের ডিগ্রি, কলকাতার পরিবেশ কোনো কিছুকেই খুঁজে পায় না। খাজনা আদায় শেষ হলে তাদের ট্রলার গঞ্জে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই রাতেই বর্মী মেয়ে মা-ফুন মণিমোহণের কাছে মাঝ রাতে আশ্রয়ের জন্য আসে। এই কদিনের ক্লেশ, ক্ষোভ, রাগ সব ঝেড়ে ফেলে তাকে ট্রলারে আশ্রয় দেয় মণিমোহন। হিন্দুর ছেলে হয়ে যার রক্তে 'বিশুদ্ধ আর্যশোণিত বহিতেছে' সে প্রস্তাব করে 'নাপ্পিখাওয়া থ্যাবড়া-মুখো' মগের মেয়েকে নিজের সঙ্গে যাবার।

> মণিমোহন মা-ফুনকে ছাড়া থাকতে পারবে না। শুনে বর্মী মেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলিল, এসব কথার কোনো মানে নেই সরকারী বাবু। তোমার সমাজ আর জীবন আলাদা। কোনোখানে মিলবে না আমাদের। পথে যেতে যেতে যা পাওয়া সেটুকুই লাভ। কোথাও দাঁড়ালেই ঠকতে হয়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী: পাঁচ, পৃ ৭৯]

মা-ফুনকে সঙ্গে নিয়ে মণিমোহন যখন তার গন্তেব্যের দিকে রওনা দেয় তখন তার সঙ্গীরা এটা মেনে নিতে না পারলেও কোনো কথা বলে না। ঔপন্যাসিক এখানে যুগের সত্য উচ্চারণ করেছেন। জলপুলিশ গোপীনাথের (দপ্তরি) মুখ থেকে সেই সত্য উচ্চারণ হয়েছে-

> কী একটা বইতে গোপীনাথ পড়িয়াছিলেন সত্যযুগ আসিয়া পড়িছে। আর এই সত্যযুগে আবির্ভূত হইতেছেন স্বয়ং কল্কি অবতার, যত ম্লেচ্ছ এবং ম্লেচ্ছাভাবাপন্নদের তলোয়ার দিয়া কচুগাছের মতো তিনি কচাকচ্ শব্দে সাবাড় করিবেন। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিবে, রাতারাতি তাহারা ষাট হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে– সত্যযুগের মানুষ কিনা। আর পৃথিবীতে অসাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকিদারী ট্যাক্স কিছুই নাই–একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতালী : পাঁচ , পৃ ৭৯]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুদিন পর বোট 'চর ইসলাইল'-এ আসে কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে নাই, সে কোথায় জানি নামিয়া যায়। সেটা আমরা আর জানি না। দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল লিসি গঞ্জালেসের প্রেম। প্রথম খণ্ডে যে লিসিকে বর্মীরা অপহরণ করে সেই কাহিনীর পূর্বের কাহিনী এটি। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ

'বিভ্রান্ত বসন্ত'-এ সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর স্যামুয়েল গঞ্জালেসের দেখা পাওয়া যায়, সে শুঁটকীর ব্যবসা করে, পথে ডি-সুজার সঙ্গে তার দেখা। ডি-সুজার বন্ধু গঞ্জালেসের বাবা। সেই সূত্রে বাড়িতে আগমন। লিসির দুরন্ত চেহারা আর অস্বাভাবিক আচরণে সে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাড়ি ফিরে যাবার পরে আবিষ্কার করে সে লিসির প্রেমে পড়েছে। ফলে ব্যবসার কাজ শেষে আবার ফিরে আসে চর ইসমাইলে, দেখে ডি-সুজা পাগল হয়ে গেছে নাতিকে হারিয়ে। প্রেমকে পাবার সংকল্প নিয়ে আসলেও লিসিকে আর পায় না গঞ্জালেস। তার পৌরুষত্ত্ব, বংশ মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস বর্মীদের কাছ থেকে লিসিকে ফিরে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। 'চৈতালী' পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে–

> আরাকান-আরাকান সে আর কতদূরে। কাজের তাড়ায় সে বহুবার আরাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। আর দূর! দূর হইলেই বা ক্ষতি কী। তাহার পূর্ব পুরুষেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙ্গাইয়া অবলীলাক্রমে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেছে। আর সে এই সামান্য পথটুকু ডিঙাইতে পারবে না। পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিভ্রান্ত বসন্ত : এক , পৃ ৫]

বনিক গঞ্জালেস্ ভেবেছিল লিসির প্রতি তাঁর আকর্ষণ হয়ত কমে যাবে। সব ভুলে সে আবার নতুন করে বাণিজ্য শুরু করতে পারবে। এবার এদিকে কাজ শেষ হবার পরে সে যখন জানল, লিসিকে অপহরণ করা হয়েছে–তখন তাঁর মাথায় প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠল। যে প্রতিশোধ বঞ্চিতের প্রতিশোধ। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষদের সময় থেকে পর্তুগিজদের সঙ্গে আরাকানীদের লড়াই। সে এই লড়াই ছেড়ে দিলে তাঁর বংশের অমর্যাদা হবে। লিসির প্রতি গঞ্জালেসের প্রেমকে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> গঞ্জালেস্ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, একমাত্র তাহারই জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের। শরীরের দাবি মিটাইবার জন্য নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন সে অভাব হইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার আন্দোলন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হইয়া। কিন্তু আঘাত লাগিয়াছে তাহার পর্তুগীজ অহমিকায়। তাহার সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজাতীয়া বঞ্চিতাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রেঙ্গুনী আর আরকানী আসিয়া। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, চৌলী : চার , পৃ ২৯]

তাই গঞ্জালেস ছাড়িবার পাত্র নয়। সে নাতনি হারানো বৃদ্ধ ডি-সুজার সঙ্গে দেখা করে। ডি-সুজা গঞ্জালেসের প্রতিশোধ স্পৃহা আরো বাড়িয়ে দেয়। জোহানের অপঘাতে মৃত্যু হবার পর থেকে 'চর ইসমাইল'-এ পুলিশের নজরদারি বেড়েছে। অন্যদিকে গাজীদের ব্যবসার সীমানাও সম্প্রসারিত হয়েছে। আফিমের ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। জল পুলিশ বাহিনী এসব তথ্য সংগ্রহ করে,

আগামী দিনে আরো হত্যা, খুন হবে– এই সত্য বুঝতে পারে। তাই তারা আরো সজাগ ও সতর্ক হয়। সব মিলিয়ে চারদিক থেকে ঔপন্যাসিক কাহিনীকে এক ধরণের এডভেঞ্চারের মধ্যে নিয়ে যান। আবারও নতুন যুগের প্রত্যয়ে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়।

উপনিবেশ [৩য় খণ্ড]

উপনিবেশ তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় **১৯৪৭** সালে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, **২০১.১.১** কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা এর প্রকাশক। উপন্যাসটির তৃতীয় পর্বও *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটি পর্ব অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করায় তৃতীয় পর্বটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত খুশি হয়েই লিখেছেন।

'সূর্য স্বপ্ন' নামে মোট এগারো পরিচ্ছেদে *উপনিবেশ* তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত। এই পর্বেও আছে মণিমোহনের ডায়েরি, যদিও এবার সেটা একেবারে তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে। *উপনিবেশ* তৃতীয় খণ্ডের মধ্যেও সময়, কালের অনিবার্য বিবর্তনের ধারা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। দশ বছরের মধ্যেই অনেক কিছুই বদলে যায়। মানুষ, সমাজ, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা, জীবনযাত্রা সবকিছুতেই পরিবর্তিত জীবনের ছাপ। 'চর ইসমাইল' এর জীবনেও দ্রুত পটভূমি পরিবর্তনের স্পষ্ট চিহ্ন। তৃতীয় খণ্ডের শুরুতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবর্তিত সময়ের আবহ ভাষারূপ দিয়েছেন–

> চর ইস্‌মাইল!
>
> চারশো মাইল দূরে বসিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছি। ছবির মতো মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা অপরিণত তটরেখা–নারিকেল আর সুপারীবনের ঠিক নিচেই যেখানে তেঁতুলিয়ার জল মাথা কুটিয়া মরিতেছে। যেখানে বোম্বেটে পর্তুগীজদের শেষ চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে–জলের তলায় ছয় ফুট উঁচু মানুষগুলির শাদা কঙ্কালের পঞ্জরেও জমিতেছে জলজ শৈবাল, মোটা মোটা হাড়ের রন্ধ্রগুলির মধ্যে কুচো চিংড়িরা নিরাপদ বাসা বাঁধিয়াছে। আর করোটির মাঝখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার আস্তানা–নীল রঙের দাড়াগুলি দিয়া যাহারা সন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতো দিগ্বিজয়ী জলদস্যুদের মস্তিষ্কে ছিদ্র করিতেছে। চর ইসমাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়া নামিযাছে স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা–আর যেমন করিয়া চারশো মাইল দূরের নাগরিক শান্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর ইস্‌মাইলের গল্প লিখিতেছি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: এক, পৃ ৮৯]

চারশো বছর আগের সেই সভ্যতায় নাগরিক জীবনের প্রভাব পড়েছে। আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা দ্রুত প্রসারিত হয়ে চলেছে। কবিরাজের দৃষ্টি দিয়ে সেই দ্রুত পট পরিবর্তনের চালচিত্রকে মূর্ত করেছেন ঔপন্যাসিক–

> কত দ্রুতবেগেই না বড় হইতেছে চর ইসমাইল। একটা ছোট ইস্কুল হইয়াছে, সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকবাংলো, ছোট একটি বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে।
>
> মানুষ যে কত বাড়িয়াছে তাহার আর সীমা সংখ্যাই নাই।
>
> অথচ!
>
> এই তো সেদিনের কথা! সমুদ্রের মত নদী। শহর হইতে যাহারা আসিত, আসিত হাতে প্রাণ লইয়া। যে কয়জন মানুষ ছিল, মুখচেনা ছিল তাহাদের সকলের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশির ভাগের সঙ্গেই। আর আজ!
>
> এই চর ইসমাইল যেন শহর হইয়া উঠিতেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্নঃ এক, পৃ ৯১]

তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে 'চর ইসমাইল'-এর পরিবর্তিত পরিস্থিতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলরামের মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। বলরাম বসে বসে স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে নিজের জীবনের, চর ইসমাইলের পূর্বস্মৃতি স্মরণ করছেন। তাঁর নিজের বয়স বেড়ে গিয়েছে, মাথার টাকের আশেপাশে স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলিতে সাদা রঙ ধরেছে, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। বন্ধু পোস্টামাস্টার হরিদাসের কথা মনে পড়ছে, 'কী আশ্চর্যভাবেই না বলরাম তাকে ভালোবেসেছিল।' আর সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে মুক্তোর কথা। কোন এক গোধূলি বেলায় বলরামকে ফেলে সে চলে গেছে, কোন খরব না দিয়ে। কোথায় আছে-বেঁচে আছে না মরে গেছে, তার কোনকিছুই বলরাম জানে না। জানবার কোনো চেষ্টাও অবশ্য করেনি বলরাম। যে এসেছিল নিজের ইচ্ছায়, সে আবার নিজের ইচ্ছেতেই চলে গেছে। মাঝখানে কতগুলো গ্লানি, হতাশা, কষ্ট জমা পড়েছে। মাঝে মাঝে বলরামের মনে হয় এসব কী সব দুঃস্বপ্ন ছিল। স্মৃতির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বলরাম সেইসব দিনের কথা মনে করবার চেষ্টা করে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> নোনা জল নোনা মাটির দেশ, নদী প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়া জাগাইয়া তুলিতেছে দিকে-দিগন্তে। সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও ছিনাইয়া লইয়া গেছে, বলরামের বুকে ভাঙা গাড়ির মতোই রাখিয়া গেছে খাঁ-খাঁ করা একটা শূণ্যতা। নতুন চড়ার মতো কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাঁধিয়াছে মুক্তো বলরাম তাহা জানেন না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্নঃ এক, পৃ ৯১]

বলরামের এই অনুভব, দুঃখ প্রকাশ কিংবা ক্ষোভের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এমন নিরপেক্ষতা খুব কম কথাসাহিত্যিকের মধ্যেই দেখা যায়। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে নারায়ণের একেবারে কাছাকাছি বিবেচনা করলেও তাঁর মধ্যে এমন নির্মোহতা খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না। তারাশঙ্কর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ও পরিবর্ধিত পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কার, প্রচলিত বিশ্বাস, জনজীবনের চিন্তাধারা ও প্রচলিত ইতিহাস ও গ্রামের আজীবন প্রবাহিত জীবনকে ভুলতে পারেননি। তবু পরিস্থিতির নাভিমূল স্পর্শ করবার যে শিল্প-প্রতিভা তারাশঙ্করের ছিল তার অনেকটাই অনুভব করা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়।

ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথাসম্ভব ধরতে চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করেছেন। দুরন্ত একটা শক্তি যুগে যুগে নবরূপ ধারণ করে। 'চর ইসমাইল'-এর মাটিতে যে দুরন্ত যৌবন পর্তুগিজ দস্যুদের জীবন ধারায় জেগে উঠেছিল ঠিক সেই শক্তিই আধুনিক সাম্যবাদের, শোষিত মানুষের প্রতিনিধি জমিরের মধ্যে জেগে উঠেছে। সময় ও ইতিহাসের অনিবার্য কারণে জমির শেখের মতে মানুষ ইতিহাসের ধারায় জন্ম নেয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই জমির শেখকে তাঁর সমাজ-অভিজ্ঞতার আলোকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। জমিরের বাস্তব পরিচয় অবশ্য স্পষ্ট নয়, সে অনেকটা আইডিয়ার জগতের বাসিন্দা। জমিরের সাহসের দৃষ্টি প্রথম সরকারি তহশীলদার মণিমোহনের নজরে আসে। মহাজনের ধানের ভাগ আদায় করবার প্রসঙ্গে জমিরের সাহস প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> জমিরের চোখ ঝকঝক করিয়া উঠিল: তা হলে বাকিটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না। বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: পাঁচ, পৃ ১২২]

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক সারা বিশ্বের পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। বলরামের মধ্য দিয়ে যেমন *উপনিবেশ* উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের দশ বছর পরের অবস্থা জানিয়েছেন নির্মোহ ভাবে, তেমনি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিশ্বের পরিবর্তন এবং চর ইসমাইলের পরিবর্তন তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিপট পাল্টে যেতে থাকে। সমুদ্র পথেও বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নতন নতুন জাহাজ বন্দরে ভিড়তে থাকে। জাপানের বোমা পড়ে, এমনকি চরইসমাইলে আকাশেও বিমানের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঔপন্যাসিক বৈশ্বিক এই পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে–

> বাইরের পৃথিবীতে কী যে ঘটিতেছে বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মধ্যে মধ্যে কিসের যে বার্তা লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে না তাঁহাদের কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাম জানিতে পারিয়াছেন–পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর এবার যুদ্ধটা কেবল সুদূর ইংলণ্ড আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, তাহার তরঙ্গটা ভারতবর্ষের কূল-উপকূলেও আসিয়া ঘা মারিয়াছে। বার্মা নাকি বেদখল হইয়া গিয়েছে–কলিকাতায় বোমা পড়িতেছে। চর ইসমাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখির মতো ডানা মেলিয়া দিয়া সারে সারে বিমান উড়িয়া যায়–গুরুগর্জনে চর ইসমাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন চমকাইয়া মর্মরিত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বই কি। তেল পাওয়া যায় না, লবণ পাওয়া যায় না, কাপড়ের জোড়া দুই টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: এক, পৃ ৯৩]

'চর ইসমাইল' বরাবরই বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। আর সেই বাইরের দুনিয়ার কারণে তারা ক্ষেত্রের ফসলের দাম পাচ্ছে না। ধানের দর নেই বলে মজুতদাররা গোলায় ধান মজুত করে রেখেছে। এখন ধানের যা দাম সেখান থেকে ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারছে ভবিষতে আরো দাম বাড়বে। তাই তারা বিক্রিও করছে না। কিন্তু বাজারে চালের দাম বেশি। ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করে তাদের তেমন একটা সমস্যা না হলেও বিপদে পড়েছে জন-মজুর আর ছোট ছোট আধিয়ারেরা। বাজারের এই অবস্থার মধ্যে আবার চারদিকে মরক লেগেছে। ম্যালেরিয়া হয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ দাড়াবে কোথায়!

দশ বছর পরে তহশীলদার মণিমোহনের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে, এবার চর ইসমাইলে মণিমোহন এসেছে স্ত্রী, পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। পুত্রের অসুস্থতার কারণে বলরাম তাঁকে দেখতে চায়। সেখানেই মণিমোহনের পরিবর্তন বলরামের নজরে আসে। বলরামের জবানিতে ঔপন্যাসিক বর্ননা করেছেন–

> বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনে মধ্যে উছলাইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: তিন, পৃ ১০৫]

ডি-সুজাকে সঙ্গী করে গঞ্জালেস লিসির সন্ধানে বের হয়েছিল। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তারা লিসির কোনো খোঁজ পেল না। দেখা পাওয়া তো দূরের কথা। লিসিকে খুঁজে না পেয়ে জীবনের যাবতীয় দুঃখ,

বঞ্চনা আর হতাশাকে সঙ্গী করে একদিন ডি-সুজা আত্মহত্যা করে। ঔপন্যাসিক চিত্রটি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এক বড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই মেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল–নিজের হাতেই সে আলোক সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: তিন, পৃ ১১২]

এদিকে বৈশ্বির পরিবর্তনের ছাপ চারদিকে স্পষ্ট হতে থাকে। জাপানে বোমা পড়ার আতঙ্কে চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যেও অভাব দেখা দেয়। জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায়। না খাওয়া মানুষ কঙ্কালসারে পরিণত হয়। এরই মধ্যে গোপন বিপ্লবী পার্টি ভাগচাষীদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। পুলিশের ভাষায় তাকে বলা হয় ফেরারী। চারিদিকে লোকে তাদের সাহস আর জয়ের প্রশংসা করে। ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে তিনি এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না–মণিমোহন চান না, চর ইসমাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?
>
> সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার! কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।
>
> অত্যন্ত করুণভাবে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি কথাই সে বলিয়াছিল–উপনিবেশ, বাণিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা–বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রেও প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার! [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: ছয়, পৃ ১২৮]

উপন্যাসের শেষ দিকে এসে দারোগা মণিমোহনকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে 'রেইড' দেয়। জলদস্যুদের ধরা তাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের ধরা, যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে দিচ্ছে। ঔপন্যাসিক উপনিবেশ উপন্যাসের শেষ খণ্ডে বিপ্লবীদের সঙ্গে গান্ধিবাদী রাজনীতির আদর্শকে হাজির করেছেন কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মণিমোহন এমনই একটি চরিত্র। দারোগার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মণিমোহন যেন গান্ধীবাদী রাজনীতির নতুন দীক্ষা পেয়েছে। ঔপন্যাসিক বর্ননা করেছেন এভাবে–

> হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে মনে পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি : আমার দেহ শুধু শহর নয়, আমার দেহ শুধু নাগরিক-সমষ্টিও নয় ; ভারতবর্ষেও প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী জনপদের প্রান্তে প্রান্তে, সেখান হইতে একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই– [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: সাত, পৃ ১৩৫-৩৬]

দারোগার এই অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হয় দুইজন। এতেই সরকার- পুলিশ বাহিনী নিজেদের সফল বলে দাবি করে। যদিও সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। মানুষের ক্ষুধার হাকাহার গ্রামে গ্রামে আরো গভীর হয়। অন্যদিকে মহাজনদের ধানের গোলা কিন্তু ফুরায় না, বরং কোথাও কোথাও বাড়তে থাকে। বিপ্লবী জমির গ্রামের নিরন্ন, অনাহারি মানুষদের সঙ্গে নিয়ে রাতের আধাঁরে কাছারি বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মহাজন, জমিদার কিংবা আড়তদারদের তখন আর কিছু করবার থাকে না। বিপ্লবী জমিরের মহাজনদের গোলা আক্রমণের ঘটনাকে ঔপন্যাসিক শোষিতদের জেগে ওঠা প্রত্যশ হিসেবে দেখেছেন। ঔপন্যাসিক এটাকে 'চর ইসমাইল'-এর মানুষের মনে বিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ননা করেছেন এভাবে–

> শুধু মজঃফ্‌র মিঞার বাড়িতেই আগুন লাগিল না। চর ইসমাইলেও আগুন জ্বলিল। আদিম পৃথিবীর আত্মগ্রাসী আগুন নয়, নতুন যুগের হোমাগ্নি। মাথার উপরে চর ইসমাইলের রক্তাক্ত সূর্য চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, সূর্য স্বপ্ন: নয়, পৃ ১৫১]

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোকেও ঔপন্যাসিক একটি পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাধান করেছেন। যেমন, গঞ্জালেস আর লিসিকে ফিরে পায় না কিন্তু বলরাম মুক্তোকে ফিরে পায়। নতুন করে এবার মুক্তেকে গ্রহণ করতে বলরামের কোনো আপত্তি থাকে না। কালের প্রতিনিধি, সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি, সম্মিলিত জনতার ও দুরন্ত যৌবনের প্রতিনিধি, নব্যকালের প্রতিনিধি জমিরের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ বাঁধে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীর নিপেক্ষতা নিয়ে বলিষ্ঠ মেজাজে স্পষ্টতই জমিরের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। জমিরের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক লক্ষ করেছেন, নতুন কালে নতুন রূপে চর ইসমালের দুরন্ত ও জাগ্রত যৌবন। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসের মধ্যেই তিনি সময়ের বিবর্তনের রথের চাকার নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দিয়েছেন জনতার হাতে এবং সেই গণশক্তির মধ্যেই দেখেছেন নবযুগের সম্ভাবনা এবং উপন্যাসের সমাপ্তিতে লেখকের এই আশাবাদী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে যে, নতুন যুগের মানুষ এসে তাকে সমাপ্ত করবে।

নতুনতর ভঙ্গিতে ইতিহাস অবতারণা এবং বিশ্লেষণ *উপনিবেশ* উপন্যাসকে যেমন ব্যাপ্তি দান করেছে, তেমনি প্রতীকধর্ম বা সঙ্কেতধর্ম উপন্যাসটিকে দান করেছে বাড়তি মাত্রা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতীকী বা সাংকেতিক লেখক নন। তবু *উপনিবেশ* উপন্যাসে প্রতীকের প্রয়োগকে অস্বীকার করা যায় না। *উপনিবেশ* উপন্যাসে শুধু 'চর ইসমাইল'-এর পরিচয় নয়, সামগ্রিকভাবে তা মানবজীবনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে উপনিবেশ যেমন মানুষের স্থায়ী বাসভূমি নয়, জীবনও তাই। মানুষ কোনোদিনই স্থায়ীভাবে এক জায়গায় দীর্ঘসময় তাঁর প্রাণ প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না। তাকে স্থান ত্যাগ করতে হয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে কিংবা নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করতে সে স্থান ত্যাগ করে। জীবনের ক্ষণিকতা এবং উপনিবেশের ক্ষণিকতা– এই দুইয়ের সমতায় আছে প্রতীকের ব্যঞ্জনা।

নদীর বুকে নতুন চড়া হঠাৎই যেন জেগে ওঠে, সেখানে গড়ে ওঠা উপনিবেশ–আবার সেই চড়া হঠাৎ একদিন নদীবক্ষে হারিয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতি নতুন করে প্রাণখণ্ড গড়ে, আবার কখনও তা ভেঙে দেয়। জীবনেও তাই, জীবন যেন নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা চড়ার মতো। সবই অস্থায়ী, নতুন কাল আসে পুরাতনের অবসাদ হয়। জীবনের নানা জটিলতা মধ্য দিয়ে এর পরিবর্তন ঘটে। নতুন কাল আসে পুরোনোকে সরে দাঁড়াতে হয়। এই চিরন্তন সত্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার শেষ কথা শোষণ। নির্দয়ভাবে শোষণ যদিও *উপনিবেশ* উপন্যাসে নেই কিন্তু উপনিবেশের উর্বর জমিকে ব্যবসায়িক দিক থেকে ভোগ বা শোষণ করা হচ্ছে। বর্মিরা স্থানীয় বাসিন্দা না হয়েও জোর করে বসবাস করে এবং স্থানীয় জনগণের উপর শোষণ করে। মণিমোহন, বলরাম কবিরাজ, পোস্টমাস্টার কেউই চর ইসমাইলের স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও তাদের সঙ্গে চর ইসমাইলের সম্পর্ক স্বার্থের। এই সম্পর্ক ঔপনিবেশিক সূত্রে গ্রথিত। ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো নীতিবহির্ভূত ভোগপ্রবৃত্তির সঙ্গে উপনিবেশের মন ও মেজাজ যুক্ত। এইজন্য বমি মেয়ে মা-ফুনের জৈব কামনার কাছে জোর করে মণিমোহনকে বিসর্জন দিতে হয়। বলরাম কবিরাজের লোলুপ বাসনার কাছে মুক্তোকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়। বর্মিদের নারীলুণ্ঠনের পৈশাচিকতার জন্য জোহানের মুণ্ড উন্মত্ত নদীর কূলে গড়াগড়ি খায়। উপনিবেশে জীবনের প্রবহমানতার কাছে কোনো ন্যায় নীতি, নিয়ম কানুনের ঠাঁই নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তথ্য নানা জায়গা থেকে আহরণ করলেও তার প্রতিটি লেখায় স্বাতন্ত্র্যতা ছাপ স্পষ্ট। তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক উপন্যাস কোন না কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সমাজ কাঠামো, ব্যক্তির অন্তদ্বন্দ্বকে সন্নিবেশিত করে গড়ে তুলেছেন নিজস্বতা।

তিমির-তীর্থ

তিমির-তীর্থ উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ। কিন্তু উপন্যাসটি রচিত হয় আরও পাঁচ বছর আগে। অর্থাৎ ১৩৪৬ ইংরেজি ১৯৩৯ সালে। *উপনিবেশ* উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পরে *তিমির-তীর্থ* প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ভূমিকাতেই ঔপন্যাসিক বলেছেন-

> *তিমির-তীর্থ* লিখেছিলাম ছাত্র-জীবনে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। নানা কারণে লেখাটি এতদিন তিমিরেই নিহিত হয়ে ছিল। কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক লেখাটিকে উদ্ধার করে 'শারদীয়া দৈনিক কৃষক' (১৩৫১ সালে)-এ পত্রস্থ করেন এবং শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী মনোজ বসু এই যুদ্ধের দুমূর্ল্যতার বাজারেও বইটিকে শোভন ও সুন্দর করে প্রকাশিত করবার দায়িত্ব নেন।

তিমির-তীর্থ উপন্যাসটি স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ববাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় *তিমির-তীর্থ* নিয়ে বলা হয়েছে–

> *তিমির-তীর্থ* লেখকের প্রধান রচনা, যদিও এটি প্রকাশিত হয় উপনিবেশ ১ম খণ্ডের পরে। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের পটভূমিকায় *তিমির-তীর্থে*র কাহিনী রচিত। সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল। তখন একই সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আর একদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় বঙ্গভূমি উত্তাল। এমনই সময় প্রফুল্ল–এই উপন্যাসের নায়ক–এল শিক্ষক হয়ে সেই গ্রামে, যেখানে স্বাধীনতা-আন্দোলনের দীপ্তি ছড়ায়নি এখনো। প্রফুল্লের প্রকৃত পরিচয়–সে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ছদ্মবেশী সৈনিক।[১১]

তিমির-তীর্থ উপন্যাসের মূল উপজীব্য রাজনীতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি এবং গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণি যেমন, কৃষক, জেলে, বেবাজিয়া ইত্যাদির সমন্বিত প্রয়াসে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রফুল্ল যিনি গ্রামে স্কুল

হেডমাস্টার হয়ে আসেন। কিন্তু মুলত তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন সংগঠক। তার প্রধান কাজ ছাত্র পড়ানো নয়, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করা।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি শুরু করেছেন প্রফুল্ল'র আগমনের মধ্য দিয়ে। আশ্বিন মাসের অল্প কুয়াশায় লঞ্চ ঘাটে সনাতন ও মুকুন্দ প্রফুল্ল'র অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র তারা দুজন নয় একটা বড় দলই তাদের শিক্ষককে নেবার জন্য অপেক্ষা করছে। লঞ্চ ঘাটের সাধারণ পরিস্তির মধ্যে ছেলের দলের আলাপচারিতা চলে। আলাপে তারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলে। ঔপন্যাসিক দীর্ঘ লঞ্চ ঘাটের চিত্রটি ক্যামেরা শট টু শট - এর মতো করে খণ্ড খণ্ড ভাবে তুলে ধরেছেন। এভাবে খণ্ড খণ্ড জনতার কথোপকথন কিংবা কাজের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেশের চলমান পরিস্থিতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। একটি আলাপের অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি অর্থবহ হবে–

> এ পাশে তিন-চারটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া পলিটিক্‌স্ আলোচনা করিতেছে। বয়সে তাহারা সকলেই তরুণ, একজনের মাথায় আবার একটা খদ্দরের টুপি। সব চাইতে বেশি উত্তেজিত হইয়াছে সে-ই। মনে হইতেছে দেশের দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত এমনি টগবগ করিয়াই ফুটিতেছে যে সে নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।
>
> প্রবলভাবে সে বলিতেছিল : প্রোগ্রাম তো আমাদের সামনে মেলাই আছে। এই কথাটাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে জানতে হবে, যারা অস্ত্রবলে দেশ জয় করে নেয়, আবেদন-নিবেদন বা অহিংসার নরম বক্তৃতায় তারা কখনও জয়ের সে অধিকার ছেড়ে দিতে চায় না। রেজোলিউশন তো বহু করেছ, দাবিদাওয়াও কম হয় নি, কিন্তু কি উত্তর পেয়েছ তার? উত্তর পেয়েছ–জালিয়ানওয়ালা, উত্তর পেয়েছ–চৌরিচৌরা, উত্তর পেয়েছ---[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল পৃ ৮]

এমনই উত্তেজনাময় কথাবার্তা চারিদিকে। সেখানে মুকুল, সনাতন, রবিসহ আরো অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঔপন্যাসিক এসবের মধ্য দিয়ে সময়কে, সংস্কৃতিকে, রাজনৈতিক আন্দোলনের কালকে ধরবার সচেতন চেষ্টা করেছেন। পরে লঞ্চ থামলে প্রফুল্ল নামে। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়। ঔপন্যাসিক *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসের শুরুতেই সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। কখনও উত্তম পুরুষে আবার কখনও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে পাঠকের সামনে আবহটি তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন।

ছেলেদের দল প্রফুল্লকে নিয়ে গ্রামের পথে হাঁটা দেয়। হাঁটতে হাঁটতেই তাঁরা গ্রামের সামগ্রিক অবস্থা প্রফুল্লকে বর্ণনা করে, পরিচয় করিয়ে দেয় নানা জনের সঙ্গে এবং আশেপাশের গ্রামের অবস্থা, স্কুলের অবস্থা– কোনটাই অবহিত করতে ভোলে না। মুকুল স্কুলের অবস্থা তুলে ধরে এভাবে–

> আমাদের গ্রামটা বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ প্রধান, কয়েক ঘর সাহা সম্প্রদায়ের বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন। প্রতি বছর গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য স্কুলে প্রেসিডেন্ট হয়ে আসছেন। কিন্তু এবার এক সাহা ভদ্রলোক প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁকে প্রেসিডেন্ট করলে তিনি ইস্কুল-বাড়িটা পাকা করে দেবেন। লোকটিও নিতান্ত অযোগ্য নন–গ্র্যাজুয়েট, বিশিষ্ট ধনী–' [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল পৃ ১১]

ঔপন্যাসিক চলমান অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি গ্রামের সামাজিক কাঠামোর দ্বন্দ্ব যা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে প্রতীয়মান হয়েছে–তা তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক ভোলেননি। সে অর্থে *তিমির-তীর্থ* কে রাজনৈতিক উপন্যাসের পাশাপাশি সামাজিক উপন্যাসও বলা যেতে পারে। পুরো উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রে স্কুল থাকলেও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিমানস ও চরিত্র নির্মিত হয়েছে নিখুঁতভাবে। বিভিন্ন চরিত্র বিশেষত নায়ক প্রফুল্লর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক (কংগ্রেসীয়) আদর্শে পুরো গ্রামকে উজ্জীবিত করাই উপন্যাসটির মূলমন্ত্র। সে অর্থে *তিমির-তীর্থ*প্রধানত রাজনৈতিক উপন্যাস। কংগ্রেসের সে সময়ের পার্টি লাইনকে অনুসরণ করে প্রফুল্ল কাজ করে গেছেন। গ্রামে প্রফুল্লর সহযোগীদেও অন্যতম রবি, তিনিও স্বদেশীদের চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবি স্পাই হয়ে পুলিশে খবর দিয়ে আনে। ফলে প্রফুল্ল ধরা পড়ে। স্কুল কমিটির সদস্যদের সমাজের বিত্তবান শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রামের সামন্ত প্রধান রামকমল, রামু সেন, সুরেন মজুমদার–এরা কেউ সরাসরি প্রফুল্লর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেননি। আবার প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করেননি। একবার সুরেন মজুমদার হাটে তাঁর লোকজন দিয়ে স্বদেশীদের বক্তৃতার স্থানে হামলা চালালেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। উপন্যাস শেষ হয় গ্রামে একটি সভার মাধ্যমে। প্রফুল্ল গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে একটি সভার আয়োজন করে। সেই সভার খবর পুলিশের কাছে চলে যায়। তখন পুলিশ হামলা চালায়। প্রফুল্ল ও তার দলকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত– চক্রবাল, অরণ্য ও তিমির-তীর্থ। প্রতিটি অংশ পরস্পর যুক্ত এবং একই কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। উত্তর বাংলার আড়িয়াল খাঁ নদীর বর্ননা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু আবার নদীর বর্ণনা দিয়েই শেষ। 'চক্রবাল' খণ্ডের শুরুতে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> আড়িয়ল খাঁ বর্ষার যে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে জল এখন প্রত্যেকদিন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। বর্ষার সময় স্টিমারটা একেবাওে সোজা ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের বড় রাস্তাটার গায়ে আসিয়া লাগে; প্যাডলের মুখ উছলাইয়া-ওঠা জল আর তক্তার ঘা খাইতে খাইতে রাস্তাটা খাড়াখাড়িভাবে অনেকখানিই জলের

> মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ঝুরো মাটি আর ঘাসের শিকড় নদীর বাতাসে তির তির করিয়া দোলে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল পৃ ৩]

আর *তিমির–তীর্থ* অংশের শেষে প্রফুল্ল ও তার দলবল নিয়ে ইন্স্পেক্টর যখন শহরের দিকে যাত্রা করেছে তখনও নদীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে–

> আড়িয়াল খাঁর কালো জল কলকল করিয়া বাজিতেছে, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় ফেনায়িত তরলতা গজরাইয়া উঠিতেছে, তীর ক্রমশ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান অন্ধকার। সাহেবপুর হাটের এলোমেলো সুপারিবন বাতাসে দুলিতেছে, মনে হইতেছে হাত বাড়াইয়া রক্তবিন্দুর মতো অসংখ্য তারা–ঢেউয়ের আঘাতে আঘোতে তাহারা ভাঙিয়া পড়িতেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৮]

উপন্যাসের শেষে নদী হয়ে উঠেছে মানুষের শুভস্বপ্নের উজ্জ্বল প্রতীক। প্রফুল্লর বিপ্লবী, নিজের জীবনকে সে দেশের মানুষের জন্য নিবেদন করেছে। তাই তার হারাবার কিছু নেই। নিজের পার্টির লোক রবির কারণে যখন প্রফুল্ল ধরা পড়ে তখন আপাতত পরাজয় মেনে নেয়। পুলির সঙ্গে জেলখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল প্রফুল্ল, তখন নিজের হতাশা, দুঃখ, ক্ষোভ, নিজের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও আড়িয়ল খাঁর প্রবহমান জলের উপর ভাসতে ভাসতে সমস্ত অভিযোগ ভুলে অলস মনে তাকিয়ে ছিল। ঔপন্যাসিক প্রফুল্লর সেই মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> কাহারো উপর রাগ নাই, অভিমান নাই, অভিযোগ নাই একবিন্দু। ক্লান্ত প্রশান্তি সমস্ত মনটাকে অলস করিয়া দিয়াছে। অনেক দূরে–যেখানে অন্ধকারের মধ্যে প্রায় মিলাইয়া আসা তীর-তটের গায়ে আড়িয়ল খাঁর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, সুপারি-নারিকেলের বীথিতে বাতাসের মর্মর বাজিতেছে এবং নির্জন চড়ার গায়ে একলা দাঁড়াইয়া থাকা মুন্সী সাহেবের শাদা জামাটা বাতাসে উড়িতেছে, সেদিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলিয়া সে আর এক পৃথিবীর স্বপ্নই দেখিতেছিল হয়তো। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৮]

তিমির-তীর্থ উপন্যাসের নায়ক প্রফুল্ল। ঔপন্যাসিক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা সাংগঠনিক কাজ নিয়ে সরাসরি কোনো কথা জানাননি। এমনকি কেন্দ্রের কার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, সাংগঠনিক কোন দায়িত্ব নিদিষ্টভাবে সে পালন করছে সে সম্পর্কেও ঔপন্যাসিক পাঠককে অভিহিত করেননি। কিন্তু প্রফুল্লর কাজ দেখে বোঝা যায় সে স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ কংগ্রেসের রাজনীতির ধারক বাহক। তার কাজের ধরনটা এমনই ইঙ্গিত করে।

উপন্যাসের শুরুতেই বাসুদেবপুর গ্রামে প্রফুল্ল স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আসে। তার থাকবার ব্যবস্থা হয় স্কুলের সেক্রেটারী রাসু সেনের বাড়িতে। রাসু সেনের মেয়ে নীলিমা প্রফুল্লর সঙ্গে হৃদয়গত সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু প্রফুল্লর এখন এসবের সময় নেই বলে নীলিমাকে প্রত্যাখান করে। নীলিমার প্রেম নিবেদনে প্রফুল্ল ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। ঔপন্যাসিক সেই অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রফুল্ল কয়েক পা সরিয়া গেল। কহিল, ছেলেমানুষি করবেন না এখন। আপনি যা বলছেন তার মানে যে আপনি বোঝেন না তা নয়। ওসব কথা শোনা আমার যেমন অন্যায় আপনার পক্ষে বলাও তার চাইতে কম অন্যায় নয়। আর দেখছেন তো হাতে বিস্তর কাজ আমার, এ নিয়ে বিলাসিতা করবার মতো অবকাশ আমার নেই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, অরণ্য, পৃ ৪৯]

প্রফুল্লর চিন্তায় প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। স্কুল কমিটির সঙ্গে মিটিং-এ প্রফুল্ল স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য প্রস্তাব রাখে। হিন্দু-মুসলমান স্কুল কমিটির সবাইকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রফুল্ল কোরান শরীফ থেকে উদাহরণ দেয়– 'যে নিজের ধর্ম বা জাতিকে সম্মান দিতে জানে না, সে আল্লার কাছে গুনাহ্গার হয়।' সুতরাং জাতীয় পতাকার মতো এমন একটা দেশগত ধর্মগত ব্যাপারে আপনারা কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন? পরে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রস্তাব পাশ হয়, স্কুলে ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্লর এমন সংস্কারবাদী কাজ, আচরণ ও কথায় ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে। সংস্কার কাজের পাশাপাশি প্রফুল্ল ছাত্রদের সঙ্গে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে এবং এতে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সেই সচেতনতা রাজনেতিক মনোভাবের পথকে প্রশস্ত করে। গ্রামের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বর্ণনাতে দেখা যায়–

> এ ইতিহাস গতানুগতিক–বার বার করিয়া বলবার হয়তো নয়; কিন্তু গ্রামের দিকে একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেই এই পুরাতন, অতি পুরাতন সত্যগুলিও অত্যন্ত নির্মমভাবে দৃষ্টিকে আহত করিতে থাকে। নূতনত্ব হয়তো নাই, হয়তো নূতন করিয়া শোনানোটা ক্লান্তিকর, কিন্তু ক্লান্তিকর হইলেই এ সত্যকে আজ আর কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখা চলিবে। যন্ত্র-চক্র-মুখরিত নাগরিক জীবন, বিদ্যুৎতের রূপসজ্জা, সিনেমার রুপালি পর্দায় স্বপ্নিল জীবনের বহুবর্ণিল প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেই পর্দার পিছনে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার খাঁ-খাঁ করিতেছে। আশা নাই, আলো নাই, প্রতিকারও হয়তো নাই। সবাই জানে, এক বেশি করিয়াই জানে এবং এত বেশি করিয়াই শুনিতে পায় যে, সেজন্য এতটুকু কিছু করিতে যাওয়াও আজ অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল, পৃ ১৯]

কলকাতার নাগরিক জীবনে বেড়ে ওঠা প্রফুল্ল গ্রামে এসেছে যুগ-যুগান্তের সেই কলুষতাকে, অন্ধকারকে অপসারণ করতে। প্রফুল্ল শুধুমাত্র স্কুলের উন্নতির জন্যই কাজ করে না। সে গ্রামের ছাত্র ও সমবয়সীদের একত্রিত করে আরও নানা ধরণের সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ করতে থাকে। হাটে যাবার মুখে প্রধান সড়কে বর্ষার সময় মাটি ফেলা হয়, কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরটাকে সবাই মিলে পরিষ্কার করলো– এমনই আরো কিছু। এসব করতে গিয়ে প্রথমেই প্রফুল্লর তর্ক বাঁধে স্কুল সেক্রেটারির সঙ্গে। কিন্তু অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় কোনো তর্কে প্রফুল্ল কখনও অংশগ্রহণ করে না। গ্রামের সবার প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা-মমতা তার আছে। নীমিলার সঙ্গে প্রফুল্লর আলাপচারিতায় এ কথাগুলো জানা যায়। ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন কোনো বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে। যেমন: প্রফুল্লর চিন্তা-দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ সম্পর্ক অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা যায়। লেখক আমাদের জানিয়েছেন–

> যেদিন আমার দেশকে, আমার পৃথিবীকে আমি এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারব, যেদিন যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব। তার আগে পর্যন্ত আমার জন্যে ঘর নেই, বিশ্রাম নেই, প্রেম নেই। অনেক ভুলে আমাদের পৃথিবী ভরে উঠেছে; ভয়ে আর অত্যাচারে, ক্ষুধায় আর অপচয়ে লোভে আর দুর্ভিক্ষে! এই পৃথিবীটাকে রসাতলে পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামাত পারব না–আমার থামা অসম্ভব। The war is waged and I am a soldier! [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, অরণ্য, পৃ ৬৬]

উপন্যাসে 'অরণ্য' অংশে ঔপন্যাসিক প্রফুল্লর চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন আর সে নির্মাণের প্রয়োগ করেছেন 'তিমির-তীর্থ' অংশে। 'অরণ্য' অংশে ঔপন্যাসিক প্রাত্যহিকতার সঙ্গে পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। সময়ের পরিবর্তনের কারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল বটে কিন্তু সব কিছু নতুনভাবে সাজলো না। পুরোনোটাই থেকে গেল শুধু সময়টা পাল্টে গেল। কিন্তু পাল্টে যাওয়া সময়ে অনেকে শুধুমাত্র সময়ের বদলকে মানতে পারলোনা। নতুন ভাবে পরিবর্তন চাইলো । এই পরিবর্তন চাওয়ার প্রত্যাশিদের মধ্যে প্রফুল্ল একজন। ঔপন্যাসিক বলেছেন–

> কিন্তু কাল তাহার পুনরাবৃত্তি না হয় করুক, এই কালের চাকাটাকেই উল্টো-মুখে ঘুরাইয়া দিয়া নতুনত্বের প্লাবন আনিবার কল্পনা যাহারা করে, চিরন্তনকে যাহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যমুখী করিতে চায়, তাহারা এই পুনরাবর্তের দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজী হইল না।

> এবং রাজী হইল না বলিয়াই এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোড়ন জাগিল। প্রফুল্ল আসিল বিপ্লবের অগ্রদূত হইয়া; তাহার পাশে দাঁড়াইল মুকুল, রবি এবং আরো অনেকে। এমন কি তাদের মধ্যে নন্তও। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, অরণ্য, পৃ ৫৫]

নন্ত, যে কিনা চোর, খেজুরের রস চুরি করে, মদের পয়সা বেশি দিলে তাকে দিয়ে ডাকাতিও করানো যায়।

প্রফুল্ল নিজেও ব্রত গ্রহণ করেছে দেশ গড়ার। উদ্যমী কর্মী হয়ে সারা গ্রামে সাড়া ফেলেছে সে। তার উদ্যোগে স্কুলে খেলাধুলায় সুনাম এসেছে। গ্রামটি এখন অন্য সব গ্রামের তুলনায় পরিষ্কার দেখায়। মানুষ সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন। এমনকি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য গ্রামবাসীরা যে মজা পুকুর পরিষ্কার করেছে তা অন্য গ্রামের মানুষও অনুসরণ করেছে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও চরিত্রটি ঠিক দ্বন্দ্বমুখর নয়। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক তাঁর মনস্তত্ত্ব ঠিক সফলতার সঙ্গে চয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কাজগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেগুলো সবই সামাজিক-সংস্কারমূলক কাজ, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক কাজের জন্য, পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি কাজের সামনে যে পরিকল্পনা থাকতে হয় প্রফুল্লর মধ্যে ঠিক তেমনটা দেখা যায় না। রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক কিংবা কখনও পার্টির অন্য কারও সঙ্গে বা তাঁর নিজের রাজনৈতিক পরিকল্পনা কোনোটাই পরিষ্কারভাবে ঔপন্যাসিক প্রফুল্লর মধ্যে হাজির করেননি। পুরো উপন্যাসে প্রফল্লকে বিশেষ কোনো সংকটময় মুহূর্তেও উপস্থিত হতে দেখি না। এমনকি নিলীমা, যখন নিজের ভেতরে প্রফুল্ল গভীর ছায়া ধারণ করেছিল তখন প্রফুল্লর এই গ্রাম্য-অশিক্ষিত মেয়েটির প্রতি কোনো আকর্ষণ দেখা যায় না। রোমান্টিক একটি অনুভূতিক বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এভাবে–

> নিচের ঘরে একখান জরুরী চিঠি লিখিতে গিয়া সৈনিক প্রফুল্ল অন্যমনস্ক হইয়া গেল, চেয়ার ছাড়িয়া জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সে। অন্ধকারে কোথায় হাসনাহেনা ফুটিয়াছে, বাড়ির দোতলাতে কে যেন সেতার বাজাইতেছে, বাহিরের বনকুঞ্জ রাত্রির বাতাসে যেন স্বপ্নমর্মরিত হইতেছে। এই মুহূর্তটি বিচিত্র,–এমন একটি মুহূর্তে জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্যকেও হয়তো ভুলিয়া যাওয়া চলে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, অরণ্য, পৃ ৬৭]

প্রফুল্লর স্থির, শান্ত স্বভাবের মধ্যে ঔপন্যাসিক তাঁকে সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে এক নিস্পৃহতা এবং কবি-দার্শনিকের ভাব বিভোরতাপূর্ণ মানুষ হিসেবে তুলে এনেছেন। অনাথ কবিরাজ, নন্ত, প্রফুল্লর কাছে মকরধ্বজ বিক্রি করে। প্রফুল্লর মকরধ্বজ দরকার না হলেও অনাথ কবিরাজের মনে হয় পশুর মতো মূঢ়

ওই চোখের দৃষ্টি যেন তাকে সর্বদা জ্বালা দিচ্ছে। প্রফুল্ল আট আনার মকরধ্বজ এক টাকায় কেনে। বৃদ্ধ, দারিদ্রচিন্থিত, কঙ্কালসার কবিরাজ চলে যাবার সময় অন্ধকারে লাঠিতে ঠুকঠুক করে চলার সময় প্রফুল্লর মায়া জন্মে কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে; 'এই জীবন, এই প্রাত্যহিকের সংঘাতই যাহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, এত সুখ তাহাদের সহিবে না।' বৃদ্ধকে আলো নিয়ে এগিয়ে দেবে কি না সেই চিন্তা করতে করতে প্রফুল্ল কথাটি বলেছে।

বিপরীতভাবে প্রফুল্ল গ্রামের এই সব অনাথ, দুঃখি মানুষদের ভালোবাসা পেয়েছে। তাদেরও ভালোবাসা দিয়েছে, স্নেহ দিয়েছে। ঔপন্যাসিক প্রফুল্লর অন্যের প্রতি স্নেহপরায়ণ মানসিকতা সম্পর্কে বলেছেন–

> স্নেহ নাই, সহানুভূতি নাই, শুধু ধূসর সন্ধ্যায় তাঁহার ম্লান অবকাশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া প্রেতমূর্তিরা নামিয়া আসে; এই মৃতের জগতের বাহিরে তিনি যাহাদের স্নেহ পাইয়াছিলেন, প্রফুল্ল তাহাদেরই একজন। বিনা প্রয়োজনেই সে তাঁহার কাছ হইতে কতবার ঔষধ কিনিয়াছে, আট আনার জিনিস কিনিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছে; দয়া করিয়াছে, দান করিয়াছে। মরা-মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে যাহার আর কেহই নাই বলিলেই হয়, নিজের এই শেষ আশ্রয়টিকেও সে হারাইবে কেমন করিয়া?
>
> [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৮৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হলেন তখন 'শরৎচন্দ্রের যুগ' অনেক আগেই গত হয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক–এই দু'জন কথাসাহিত্যিক গ্রামীণ সমাজ, গ্রামীণ জীবনধারাকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার উপন্যাস রচনা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে কিছুটা তারাশঙ্করের প্রভাব লক্ষ করা যায়, যার কিছুটা ছাপ *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসে দৃশ্যমান হয়। এটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস, সেজন্য অন্য কারও রচনার প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু বিষয়বস্তু বা বয়ানরীতিতে কিছুটা মিল থাকলেও দুই জনের মেজাজ আলাদা। তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করেছেন আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপজীব্য করেছেন বরেন্দ্র অঞ্চলকে। কিন্তু শিল্পী ভেদে দুইজনের আঙ্গিক একেবারেই দু'রকমের। শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ* উপন্যাসের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যবাদিতা ও আভিজাত্যকে তুলে আনতে চেয়েছেন। বাসুদেবপুর, গ্রামের দ্বন্দ্বটা ছিল ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে। কে স্কুলের প্রেসিডেন্টে হবেন- এটা নিয়ে সামন্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। ঔপন্যাসিক ব্রাহ্মণ্যবাদের অহমিকা আভিজাত্যেবোধ ব্রজবিহারীর উক্তিতে তুলে ধরেছেন–

> বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মরক্ত এখনো ঠাণ্ডা হয়নি হে। মুখুজ্জেদের সমস্ত তালুকদারিই যদি বন্ধক দিতে হয়, তবুও এমনটা হতে দেব না। শুদ্দুরের টাকার জোর হয়েছে : ও অহঙ্কারের পয়সা কদিন থাকবে? আমি পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল, পৃ ২২]

আবার নিম্ন শ্রেণি বেবাজিয়া-বেদে সম্প্রদায়, মালী এদের জীবনচিত্র চমৎকারভাবে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন একবারে উপন্যাসের শুরুতে। বেদে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র নারী পুরুষের সম্পর্ক, তাদের আচরণ কিংবা পালিত কুকুরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কেও একটা নিখুঁত ছবি খুটিয়ে খুটিয়ে অঙ্কন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। হাটকে ঘিরে তাদের নারী-পুরুষের সম্মিলিত কোলাহল, নেশা করবার দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখের সামনে। ঔপন্যাসিক বলেছেন এভাবে–

> নেশা জমিতে লাগিল এবং হল্লাও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। মানবতার শ্রীক্ষেত্র বলিতে হয় তো ইহাকেই। অনভ্যস্ত চোখে জিনিসটাকে যতো অপ্রীতিকরই মনে হোক, ইহাদের জীবনের আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হইতে এটাকে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া পাওয়া চলে না। বহুদূরের শিক্ষা-সভ্যতা-বিবর্জিত গ্রামে নোনা জলের নিভৃত আশ্রয়ে চরের মধ্যে যাহারা বাস করে, সপ্তাহের মধ্যে এই একটি দিনবিশেষের জন্য তাহারা যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া থাকে, এবং যে বিকৃত আনন্দ-তৃষ্ণা এই মদের দোকানের সামনে আসিয়াই উদ্দম হইয়া ওঠে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৭৩]

উপন্যাসে নায়ক প্রফুল্ল চেষ্টা করেছে সবাইকে সংস্কার কাজে অংশ গ্রহণ করানোর। সেবা পরায়ণ মনোভাব নিয়ে সে সবার পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানে দেশের অবস্থা সম্পর্কে তেমন অবহিত কররার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক সুনিপুণভাবে *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসে নারী-পুরুষের হৃদয়ঘটিত সম্পর্ককে গুরুত্বারোপ করেছেন। উপন্যাসের 'তিমির-তীর্থ' অংশে প্রফুল্লর চলে যাবার খবর শুনে নীলিমা এসে তাঁর জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায়। প্রফুল্লর দেয়া বইটা সে পড়েছে। সর্বস্বার্থ নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছে যে, সে যে দৃষ্টিতে প্রফুল্লকে দেখেছে, প্রফুল্ল সেভাবে তাকে দেখতে চায় না। নীলিমা জানালার গরাদ ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। প্রফুল্ল কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারে না। দৃশ্যটিকে ঔপন্যাসিক বর্ননা করেছেন এভাবে–

> ধীরে ধীরে সে জানালার কাছে সরিয়া আসিল, নীলিমার মাথার উপর হাত তুলাইয়া দিয়া কহিল, শান্ত হোন, যা ঘটবেই তার জন্য বিচলিত হয়ে লাভ নেই। ভবিষৎতের আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৪]

রাজবন্দী হয়ে লঞ্চে যাবার সময়-নন্ত যখন প্রফুল্লকে বলে- 'আসলে বরি'দাই বড় স্পাই, সেই পুলিশে খবর দিয়েছে।' নিজের গ্রুপের লোক হয়েও বরি এমন কাজ করল এটা শুনবার পরেও প্রফুল্লর মনে কোন ক্ষোভ বা রাগের প্রকাশ দেখা যায় না। এ যেন হিংসা দমনের প্রবৃত্তি নিয়ে অহিংস নীতিতে নামা বিপ্লবীর কাজ। কোথাও হিংসা, হানাহানি সৃষ্টি করা নয়, সবখানে মানবতার ধর্ম অনুসরণ করা। প্রফুল্লর শান্ত স্থীর দৃষ্টিকে ঔপন্যাসিক এঁকেছেন এভাবে–

> কাহারো উপর রাগ নাই, অভিমান নাই, অভিযোগ নাই একবিন্দু । ক্লান্ত প্রশান্তি সমস্ত মনটাকে অলস করিয়া দিয়াছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৯]

প্রফুল্ল ছাড়া উপন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ন পুরুষ চরিত্র তপন। তপন ভাববাদী কবি। নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন নয়, শিশুর মতো সরল, অসম্ভব খেয়ালি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তার মনে হয় এটা ভদ্রলোকের কাজ। পরে সে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়, সেখানেও তাঁর মনে হয়েছে প্রতিভার চেয়ে অনুকরণের আবদার এখানে বড়। পরে কিছুদিন নিরুদ্দেশ হয়। বোম্বাইয়ের এক কাপড়ের কলে শ্রমিকের মিটিং থেকে আত্নীয়-স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে। একবার নোয়াখালিতে হেডমাস্টারি করতে যায় কিন্তু অঙ্কের ক্লাসে সে ছাত্রদের 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' কোরাস শেখাচ্ছিল। এটা কোনো একজন সেক্রেটারিকে এসে অভিযোগ জানায়। তখন সেক্রেটারি সদ্য 'রায়সাহেব' উপাধি পেয়েছে। পরে তপনের সঙ্গে সেক্রেটারির কথা কাটাকাটি, মারধর– পরে জেলখানা। সব ছেড়ে এখন সে মূলত কবি। ঔপন্যাসিক লিখেছেন এভাবে–

> তাহার ভাগ্যকে সে নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়াছিল। ভাবপ্রবণ, তীক্ষ্ণ, তীব্র–সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক, আত্মবিস্তৃত, কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত আত্ম-সচেতন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল, পৃ ২৯]

কিন্তু রাজনীতি সচেতন, দার্শনিক তপনকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে প্রফুল্লর দলে দেখা যায় না। প্রফুল্লর দলের অন্য কারো সঙ্গেও তপনের রাজনৈতিক আলাপ কিংবা সম্পর্ক দেখা যায় না। তপনের ভূমিকা উপন্যাসে অনেকটা 'নিরোর বাঁশি বাজানো মতো'। উপন্যাসের শেষে যখন পুরো গ্রাম সভায় একত্রিত, তখনও তপনকে সেখানে দেখা যায় না। তাকে বলতে শোনা যায়–

> fools, they are all fools.
> কারণ ওরা যা করল তার মূল্য কে বুঝবে? এরা অন্ধকারের জীবন, এরা যক্ষ্মারোগী। এদের বাঁচিয়ে কী হবে– মরুক ; মরুক–সব মরে শেষ হয়ে যাক। অনেক ভেবে এইটেই আমি বুঝেছি যে পৃথিবীতে Nero রই

> জয়জয়াকার। If I could turn a second nero! [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৬]

একমাত্র শুক্লার প্রেমেই সে ধরা দেয়। সাহস করে বলেই পালিয়ে চলে যায়, কোন দায়িত্ব নেবার চিন্তা অনুভব করে না। তপনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কবি মানসিকতার পরিচয় তুলে আনবার চেষ্টা। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> তপন দুই বাহু বাড়াইয়া দিল– তারপর শুক্লাকে কাছে টানিয়া আনিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত যা দেরি! দেহের ঘন সান্নিধ্যে সে অনুভব করিল, তাহার বক্ষোবদ্ধার ভয়ার্ত হৃদস্পন্দন, তাহার নিজের উত্তেজিত রক্তধারার মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯৭]

উপন্যাসে অনেকটা গুরুত্ব দিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কণ করেছেন দুটি নারী চরিত্র–নীলিমা ও শুক্লাকে। এরা কেউই তেমন বিকশিত বা মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। নীলিমা প্রফুল্লর সঙ্গে যুক্ত থাকায় শুক্লার চেয়ে মূল নায়িকা হবার বেশি দাবিদার সে। গ্রামের স্কুলের সেক্রেটারি রাসু সেনের মেয়ে নীলিমা সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের সাধারণ মেয়েদের মতোই একজন। শহর থেকে বেড়াতে আসা শুক্লাকে পায়ে জুতা পরে রাস্তায় বেড়াতে দেখে সে অবাক হয়। তাকে গ্রামের সামষ্টিক নারীদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু প্রফুল্লর সঙ্গে প্রেমের আবহে নীলিমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক নীলিমাকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে–

> গ্রামের আরো পাঁচটি মেয়ে তাদের জীবনের যে পরিণতিকে অনিবার্য বলে বরণ করিয়া লইয়াছে, নীলির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম যদি না ঘটে তবে সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করার কারণ নাই। ইহাদের রক্ত ধারায় যে জন্মার্জিত সংস্কার চিরটা কাল ধরিয়া বহিয়া চলিতেছে, তাহকে অস্বীকার করিবার মতো মনের জোর ইহাদের যদি না থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রেই বা অভিযোগ করিয়া কী হইবে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৯২]

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শুরু থেকেই যে নারী চরিত্রটিকে ব্যক্তিবান করে তুলতে চেয়েছেন সে হলো শুক্লা। শুক্লা সুন্দরী, শিক্ষিত, রুচিবান। তপন বলেছে–

> ‘শুক্লা বিচিত্র নাম! গানের মতো সুন্দর ছন্দের মতো লীলায়িত। এই নামটির সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ জড়াইয়া আছে, এই নামটিই যেন মূর্তিমান কবিতা। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চক্রবাল, পৃ ১৯]

শুক্লার পরিচয় পাঠকদের সামনে ঔপন্যাসিক বর্ননা করেছেন এভাবে–

> গ্রামে সে কখনো থাকে নাই। জন্মিয়াছে পাটনায় এবং মানুষ হইয়াছে কলিকাতাতে। তাহার বাবা অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে কি একটা প্রকাণ্ড চাকরি করিতেন, গ্রামে সে এসেছে হাওয়া পরিবর্তন করতে। গ্রামের মেয়েদের দেখে সে হতাশ হয়। একমাত্র তপনের সঙ্গেই তার মনের মিল হয়। কিন্তু তপন সম্পর্কে শুক্লার নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ প্রখর।
>
> – কিন্তু তপনদা কবি, তপনদা আইডিয়ালিস্ট। ভাবের প্রেরণায় মন যাহাদের চলে, জীবনকে ব্যাখ্যা করে তাহার কল্পনার অত্যন্ত কাছ ঘেষিয়া; অল্পে আহত হয়, অল্পে খুশি হইয়া উঠে। কিন্তু এমন স্পর্শকাতর মন লইয়া তো বস্তু পৃথিবীতে চলে না। তপনদাকে সে কি এই মাটির পৃথিবীর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। নিজের শক্তির উপর একটুকু বিশ্বাস তাহার নাই? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, অরণ্য , পৃ ৪৯]

তপনের মতো শুক্লাকেও ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক আবহ থেকে দূরে রেখেছেন। এখানে আরও একটি অবস্থান খুবই অসংলগ্ন, স্ববিরোধী মনে হয়, তা হলো– একই বাড়িতে থেকে সংস্কৃতে এম.এ পড়া বাস্তববাদী শুক্লার সঙ্গে প্রফুল্লর কোনো বাক্য বিনিময় হয় না। শুধু একবার মাত্র শুক্লার সেতারের সুর প্রফুল্ল শুনতে পায়। তাও তখন পর্যন্ত তাদের কোনো পরিচয়ই হয়নি। গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো শুক্লার সঙ্গে প্রফুল্লর এমনকি প্রফুল্লর কোনো কংগ্রেসী বন্ধুদেরও দেখা হয় না। শুধুমাত্র তপনের সঙ্গেই তার দেখা-কথা হয়। তপন শুক্লার ঘরে আসে। চোখ-কান-খোলা সচেতন এমন চরিত্রকে ঔপন্যাসিক কেন মূল দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রাখলেন তাঁর কোনো প্রমাণ বা কারণ ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে বলেননি।
উপন্যাসের শেষে সভার সময়ও আমরা শুক্লাকে সভাতে পাই না। সভার বাইরে তপনের সঙ্গে তখন তার প্রেমের বোঝাপড়া চলছে। ঔপন্যাসিক অবস্থাটা বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> বাইরের এই ঝড়ে সে বিশেষ বিচলিত হয় নাই, কলিকাতার পথেঘাটে এ দৃশ্য দেখা তাহার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নিজের চোখের সামনেই লাঠির আঘাতে এমন বহু ছেলেকে সে রক্ত দিতে দেখিয়াছে। কিন্তু শুক্লা নাগরিক-সে ভাবপ্রবণ নয়। বুদ্ধিবাদের আশ্রয়ে সে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সে কতখানি মূল্য দেয় কে জানে, কিন্তু বিচলিত হয় না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৮৮]

সমগ্র উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, প্রফুল্ল স্বাধীনতার কথা বলে, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখে। সে রাজনৈতিক দলের সদস্য, যদিও ঔপন্যাসিক প্রকাশ্যে তাঁর দলের নাম বা কর্মপন্থা নিয়ে কিছুই বলেননি। অথচ প্রফুল্লর গোপন ইতিহাস যে ইঙ্গিত দেয় তাতে করে তাকে কোনো নরমপন্থী পার্টির সদস্য বলেও মনে হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তিনি অল্প বয়সে ‘যুগান্তর’ পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে একাত্মতা

অনুভব করেন। কাজেই ঔপন্যাসিকের প্রথম বয়সে লেখা উপন্যাসে প্রথম যৌবনের ভাবাদর্শের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। উপন্যাসের দু-একটি অংশে এই সত্যের কিছুটা ইঙ্গিত মেলে। যেমন, প্রফুল্ল মাস্টারের একটি সভার আয়োজনের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

> চাষী–মজুরের মোটামুটি একটা ভিড় জমিয়াছিল ভালোই। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহাদের দুয়ারে আরো দু-একবার না আসিয়াছিল তা নয়, এবং সে তরঙ্গও তাহাদের জীবনকে কম আলোড়িত করে নাই; তাহারা সাড়া দিয়াছিল, তাহাদের সাধ্যমতোই সাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ হয় নাই। অভাব-অভিযোগের শূন্য পাত্রটি হাতে লইয়া ব্যর্থ বেদনায় তাহারা ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতে সমাজের অগ্রগামী দল, এই চিরন্তন ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছি। ইহাদের প্রতিটি কল্যাণ চেষ্টাকেই তীক্ষ্ণ সন্দেহে বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া কাজের তো কেউ তাহাদের বলিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের অতি-বাস্তব দুঃখবেদনার কাহিনী তো কেউ এমন করিয়া তাহাদের কোনো দিন শুনাইতে আসে নাই। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, তিমির-তীর্থ, পৃ ৬৯]

উপন্যাসের এই শেষ পর্যায়ে এসে আমরা সম্মিলিত জনতার কথা পেলাম। উপন্যাসিক স্পষ্টভাবেই দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন– শাসক শ্রেণি (যারা তথাকথিত ভদ্রলোক) ও শোষিত শ্রেণি (চাষী-মজুরের দল)। ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক আদর্শ অনেকটা শোষিত শ্রেণির পক্ষে, সেটা তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় তেমনি *তিমির-তীর্থ* পাঠেও অনুধাবন করা যায়। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সভার আয়োজন করে প্রফুল্ল ও তাঁর দল। সেই সময়ে সরকার সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। এটা জানবার পরেও প্রফুল্ল কেন কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না, তার সঠিক কারণ বোধগম্য হয় না। সভার আগেই প্রফুল্ল ঘোষণা দিয়েছিল 'সে বাসুদেবপুর থেকে চলে যাবে'–কিন্তু কেন চলে যাবে? প্রফুল্ল সেনগুপ্তের এখানে কী কাজ শেষ, এখন সে অন্য কোথাও কাজ করবে!–সেটাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একটি চেতনা, একটি আবেগ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। যেটা সেই সময়ের দাবি, গণমানুষের দাবি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্দ্র-মুখর উপন্যাসটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক ঘটনাকে অনুসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঘটনা এবং চরিত্রের সম্পর্কেও মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন মানব মনোস্তত্ত্ব। রাজনৈতিক ঘটনাকে বিপ্লবী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক।

মন্দ্র-মুখর

স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা উপন্যাস *মন্দ্র-মুখর* ১৩৫২ (১৯৪৫) সালের চৈত্র মাসে প্রগতি প্রকাশন থেকে মুদ্রিত হয়। কাহিনীর সময় অর্থাৎ বাস্তব যে বিষটিকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে, সেই ঘটনার তিন বছর পরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাটি রচনা করেন। উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে মূলত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। '১৯৪২ সালের ১২ আগস্ট'[১২] আন্দোলনকে কেন্দ্র করে *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠেছে।

১৯৪২ সালে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যপনা করতেন। সেই সময়েই তিনি 'প্রগতি সাহিত্যান্দোলনে'[১৩] যোগ দিয়েছিলেন। তখন কলকাতায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা আর তার কয়েকমাস পরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সুচনা। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের সময় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে, সেটা সর্ম্পকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কী বক্তব্য ছিলো তা আমরা জানতে পারি না। তবে 'নির্যাতন ও কারাবাস যাঁর বিদ্রোহী প্রাণকে অবদমিত করতে পারেনি, যেই অক্লান্ত দেশকর্মী মেজদা 'শ্রীশেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'[১৪] কে তিনি *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন। 'শেখরনাথ' সম্পর্কে জানা যায় যে, ঠিক একই সময়ে তিনি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কি না তার প্রমাণ যোগ্য কোনো তথ্য-পত্র পাওয়া যায় না। তবে সরোজ দত্তের কাছ থেকে আমরা এই সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়ে থাকি, তিনি বলেছেন–

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত জলপাইগুড়িতে বসেই আগষ্ট আন্দোলনের উত্তাপ গ্রহণ করছিলেন, অনুভব করছিলেন বিপ্লবীদের উত্তেজনা, বিরম্বনা। তাই তার ভূমিকা দর্শকের মতো। ফলে *মন্দ্র-মুখর* রিপোর্টাজ হিসেবে মূল্যবান হলেও উপন্যাস হিসেবে তেমন দানা বাঁধেনি।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

মন্দ্র-মুখর-এর ঠিক আগে লেখা *তিমির-তীর্থ* উপন্যাসের মতো এখানেও ভাবীকালের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি–

> তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।
>
> ভাতারমারীর মাঠ; মরা দীঘির উচুঁ পাড়ি আর টিলার নিচে এক সংগ্রামের রক্তাক্ত-স্বাক্ষর রয়ে গেল। জ্বলে-যাওয়া গ্রাম আর মরা মানুষের ভাঙা পাঁজরে যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রইল তা উদ্ধার করবে অনাগত কালের প্রত্নতাত্ত্বিক, স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক। এখানে তা লেখাবার অধিকার নেই। এই আখ্যায়িকায় যে ফাঁক রয়ে গেল তা পূর্ণ হয়ে উঠবে সেইদিন, যেদিন দুশো বছরের শৃঙ্খল দু-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে–যেদিন বন্দীশালার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে ভাবী ভারতের দেশ-নায়ক।
>
> খবরের কাগজে বহুদিন পরে সেন্সারের ছাপ-মারা যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে জানা যায় : 'সশস্ত্র পুলিসের সহিত জনতার সংগ্রামে চারিজন নিহত ও বহুব্যক্তি আহত হইয়াছে।'নিশ্চিন্তনগরে যাদের চোখের সামনে গোরুর গাড়িতে করে লাশের চালান এসেছে–এই খবরে একটুখানি বিষণ্ন হাসি মাত্র হেসেছে। তারা যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার পক্ষে এ অপরিহার্য প্রয়োজন, সুতরাং নীরব থাকাই ভালো।
>
> তবু সান্ত্বনা আছে তাদের–। যাদের সামনে পথ ছিল না, যারা শুধু নতুন সূর্যের আলোতেই প্রাণ পেয়েছিল, প্রেরণা পেয়েছিল, তাদের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তের ছাপ আর পুড়ে-যাওয়া ঘরের কালো কালো খুঁটিগুলো দিক-নির্দেশক হয়ে রইল আগামীকালের সৈনিকের জন্য। রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই– এ বাণী কবির নয়, দার্শনিকের নয়, মৃত্যুজয়ী মানুষেরই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫২]

তবে এটা ঠিক যে আগস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। 'শান্ত নিমিন্তে-নিরুদ্বিগ্ন ভারতবর্ষ, মনু পরশের ভারতবর্ষ'কে বুঝি আর রক্ষা করা সম্ভব নয়। আগস্ট বিপ্লবের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে আরও বড়ো বিপ্লবের সম্ভাবনা আর কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ সেই ভাবেই দেখেছিলেন এই বিস্ফোরণকে–

> যা হারিয়েছে, যা ত্যাগ করেছ-যতখানি রক্ত দিয়েছ–তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভাণ্ডারী। কিন্তু ভুল করেছিলে ভাই–বিপথে গিয়েছিলে! আত্মস্থ হও–প্রকৃতিস্থ হও। বিপ্লবের প্রদীপকে নিবিয়ো না– বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রাখো–ঐক্যবদ্ধ হও–শক্তি অর্জন করো। আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়–গণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৬]

উত্তরবঙ্গের একটি ছোট মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাসের পটভূমি। নিশ্চিন্তনগরকে ঠিক শহর বলা যায় না। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি শাখা নদী, যা শহরকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এর একটি অংশে আছে কিছু কোঠাবাড়ি, কতগুলো টিনের বাড়ি, বাকি প্রায় সবই খড়ের

নয়তো বা খোলার ছাউনি দেওয়া। পথের তেমন কোন কৌলিন্য নেই, খোয়া দেয়া সরু রাস্তা। নদীর অপর পাড়ে গড়ে উঠেছে অভিজাত অঞ্চল। আধুনিক প্যাটানের কিছু বাড়িও সেখানে গড়ে উঠেছে–সেইসব বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। ছেলেদের জন্য হাই স্কুল মেয়েদের এম.এ স্কুল। লাইব্রেবি, ক্লাব, শিশুদের পার্ক সবই আছে। সব মিলিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থার নাগরিক একটি রূপ। নিশ্চিন্তনগরের নাগরিক রূপটির পাশাপাশি উপন্যাসে শহরের ঝিমিয়ে পড়া রূপটিও প্রকটিত। উকিল পূর্ণবাবু, স্কুল শিক্ষক রমাপদ বাবু, সার্কেল অফিসার বিনোদবাবু, মোক্তার কালীসদনবাবু–এরা সবাই ঝিমিয়ে পড়া শহরের এক একটি দিক। তবু এরই মধ্যে আলোর ঝলকানি স্বরূপ হয়ে আছে লেডি ডাক্তার এডিথ, আছে উন্নতিকামী মহিলা সমিতি। ঔপন্যাসিক শান্ত, নিস্তরঙ্গ শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন–

> বাংলো প্যাটার্নের কয়েকখানা মনোরম বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান। ছেলেদের হাই স্কুল, মেয়েদের এম.ই ইস্কুল। ত্রিলোকেশ্বর শিব আর মহামায়ার পুরোনো মন্দির। পোস্টাপিস, সাব-রেজিস্ট্রি, মুন্সেফ আর সাব-ডিভিসন্যাল অফিসারের আদালত, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটা শাখা। উকিল আর অফিসারের ক্লাব–আড়াইশো বইয়ের পাবলিক লাইব্রেরী। তার ওপারে নদী, স্নানের ঘাট–একরাশ নৌকো, জেলেদের গ্রাম, শ্মশান-ঘাট। মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগরের সীমানা। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ২, পৃ ৯৬]

বাস্তবতার ছোয়া লাগল এই শহরে একদিন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এলো। নিস্তরঙ্গ, আড্ডাপ্রিয়, পরনিন্দা, পরচর্চা প্রিয় নিশ্চিন্তনগরের জীবনে সময়ের পরিবর্তনে হয়ে উঠল উত্তাল। রাজভক্ত সরকারি অফিসারের সন্তানও সেই উত্তাল বন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই জোয়ারে দরিদ্র রাজবংশী এবং বাহে সম্প্রদায়ের দেহাতী মানুষেরাও যোগ দিল। মেয়েদেরও কেউ কেউ ঝাপিয়ে পড়ল। শহরের প্রাত্যহিক জীবনযাপন ভেঙে নতুন সময়ের জোয়ারে মুখুরিত হলো। *মন্দ্র-মুখর* সেই মুখরিত সময়ের কলতান গাঁথা।

বিষয় বিচারে *মন্দ্র-মুখর*কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যেতে পারে কিন্ত রাজনীতি কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল রাজনীতি অথবা তার পরিণতি লেখক কতদূর নিয়ে যেতে পেরেছেন সেটা বিবেচ্য বিষয়। কারণ অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও রাজনৈতিক সংগ্রাম বা রাজনীতির সমস্যাগুলোকে তেমনভাবে তুলে ধরতে দেখি না। বরং ঔপন্যাসিকের বেশি আগ্রহ কাহিনীর বয়ান এবং সেই কাহিনীর একটা সমাধানযোগ্য পরিণতির দিকে। তাই এটাকে পুরো মাত্রায় রাজনৈতিক উপন্যাস বলাটা হয়ত গ্রহণযোগ্যও হবে না। তবে ঔপন্যাসিক একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনার আলো ফেলেছেন পুরো নিশ্চিন্তনগরে। যেখানে শহরের কোন শ্রেণিই বাদ পড়েনি। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, সমাজকর্মী, মধ্যবিত্ত

শ্রেণি যারা শুধুমাত্র একক নিজের ভাবনাতেই নিজেদের সময় কাটায়, তারা প্রত্যকেই এখানে এসেছে সুতরাং সেই বিচারে এটাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায়।

মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই সবাই আবর্তিত হচ্ছে। কাহিনীর 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ'-এ পাবলিক লাইব্রেরির বারান্দায় উকিল পূর্ণবাবু, ইস্কুল মাস্টার রমাপদ বাবু, সার্কেল অফিসার বিনোদবাবু, মোক্তার কালীসদন বাবু এঁরা সবাই একত্রিত। যাদের কাছে রাজনীতিটা নেহাৎ আলোচনার জন্য আলোচনা করা। তাঁরা দেশের জন্য চিন্তিত নয় বরং একটু দূরে থেকে সমালোচনা করারই পক্ষপাতি। দেশে এই রকম সুবিধাবাদী মানুষের অভাব আসলে কোনো কালেই ছিল না। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় এই সব সুবিধাবাদী মানুষের প্রতি ঔপন্যাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের একদল মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠকে প্রকাশ করেছেন। কালীসদন বাবুর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে রাখার মতো–

> শেষে দেখলাম- বাবা, কিছুতেই হয় না। কত ছাব্বিশে জানুয়ারি এল গেল, অনেক ফ্ল্যাগ উড়ল, কিন্তু স্বাধীনতা এল না। তা ছাড়া পাকিস্তান, পকিস্তান আর গুলিস্থানের যে নমুনা দেখছি, তার চাইতে ইংরেজিস্তান ঢের ঢের ভালো। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ২, পৃ ১০০]

সুবিধাবাদি এমন বাঙালির চরিত্র বাংলা উপন্যাসে বিরল নয়। রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আলোচিত উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* র কথা বলা যেতে পারে। এ উপন্যাসে সুবিধাবাদি মধ্যবিত্ত চরিত্র 'মিত্তির মশাই'-এর একটি কথা মনে পড়ে। সতীনাথ ভাদুড়ীকে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন–

> স্ত্রী, পুত্র পরিবার আছে। একেবারে আগে পিছে না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া কি ভালো? ভারতবর্ষের জন্য সব জায়গা যদি স্বরাজ হয়, তাহা হইলে পুনিয়াতে হইবে। এ জায়গাটুকু বাদ দিয়ে তো আর স্বরাজ হইবে না।[১৭]

স্বাধীনতা লাভ যে শুধুমাত্র পুরুষের নয় নারীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সত্যকে তুলে ধরতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভোলেননি। সামাজের নারীরা কোনো না কোনো ভাবে অবহেলিত। সেটা সামন্তবাদী সমাজে যেমন পুঁজিবাদী সমাজেও তেমন। সুতরাং নারীদের প্রতি সমাজের এই অবহেলায় যে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে অগ্রবর্তী করছে সে বিষয়ে ঔপন্যাসিকের কোনো সন্দেহ নেই। *মন্দ্র-মুখর* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে নারীর স্বরাজ ভাবনা, রাজনৈতিক অগ্রসরতাকে তুলে আনতে ভোলেননি। উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলনে পিছিয়ে নেই সন্ধ্যা, পূরবী, কিংবা এডিথ। এরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ও

পেশার হলেও তারা সবাই রাজনীতি করে, সংগঠন করে। ঔপন্যাসিক চমৎকার সংকেতময়তায় নারীর বন্দিত্বের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিকের ভাষায়–

> সামনে দিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে লোহার পুলের ওপর। আর সেই পুলের রেলিং ধরে নীচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। একটি তরুণী,–দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা এবং রূপবতী। নীচের খালের নতুন বর্ষার জলে সাঁওতাল মেয়েরা পোলো ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, মেয়েটির লক্ষ্য বোধ হয় সেই দিকে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ২, পৃ ১০০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন তা উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র এডিথকে নিয়ে বলা। নাগরিক নিশ্চিন্তপুর জীবনে সকলের ব্যতিক্রম এডিথ–সে খ্রিষ্টান, সুন্দরী। অন্য সবার চেয়ে শারীরিক বৈশিষ্ট্যে আলাদা বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঔপন্যাসিক এডিথের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> মেয়েটি এইবারে এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে–বিজয়িনীর মতো সুঠাম পদক্ষেপে হেঁটে আসছে লোহার পুলটা পার হয়ে। রঙীন শাড়ির আঁচল বাতাসে পরীর পাখার মতোই উড়ছে––আশ্চর্য সুন্দর দেহটিকে যেন গানের তালে তালে দোলা দিয়ে এগিয়ে আসছে সে। আর ওপরে মেঘ-মেদুর আকাশ, লোহার পুলের নীচে জলের কলধ্বনি, বাতাসে কদমফুলের রেণু উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় কাঁপছে শালের পাতা,– [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ২, পৃ ১০৩]

এডিথ ডাক্তার, এই মহল্লার সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সে। ঔপন্যাসিক এডিথকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রচ্ছন্নভাবে তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন। মাছ ধরবার রূপকটি সেই ইঙ্গিতই বহন করে। এছাড়া অন্যান্য নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে সন্ধ্যা, পূরবী অন্যতম। তারা কেউ কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন, কিংবা মহিলা সমিতি অথবা বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। নারীর পাশাপাশি ঔপন্যাসিক কিশোর, যুবক– এরাও যে সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে সেটা চিত্রায়ন করতে ভোলেননি।

উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হলো, হাজার হাজার বছর ধরে নিরক্ষর থাকা ক্ষুধার্ত শোষিত মানুষের একত্র হবার ঘটনাটি। ঔপন্যাসিক তাদের মধ্যেই নব যুগের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। 'ভাতারমারীর মাঠ'-এ সেই নব চেতনার জয়রব উঠেছে। উপন্যাসে 'ভাতারমারীর মাঠ' আত্ম্যাগের প্রতীক। একদিন এই মাঠেই এক কৃষক পানির জন্য আর্তনাদ করতে করতে মারা যায়। সেই মৃত্যু থেকে

আজ এখানে অনেক মৃত্যু সঙ্গী একত্রিত হয়েছে। মূলত লেখক মানুষের সংঘবদ্ধতার চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

> দেহাতী মানুষ, যারা কখনো চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি– যারা চিরদিন মার খেয়েছে, পশুর মতো মরেছে; যাদের কাছ থেকে আট আনা ভাড়ার বদলে একটা টাকা আদায় করেছে সে, এবং একটি মাত্র ধমকেই যারা ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের নীচে শুয়ে পড়েছে–আজ তাদের এত শক্তি, এত আত্মবিশ্বাস দিলে কে? ম্যালেরিয়া আর অভাবের পীড়নে যারা শুধু মৃত্যুর জন্যই দিন গুনেছে, আজ বাঁচবার এই অমোঘ মন্ত্র তারা পেল কোথায়? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৭, পৃ ১৫১]

সংঘবদ্ধ শক্তির প্রকাশকে মূর্ত করতে ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র গ্রামবাসীকেই একত্রিত করেন নি, একত্রিত করেছেন অন্যান্য আদিবাসীদেরও। সবাইকে একত্রিত করে ঔপন্যাসিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জয়ধ্বনি তুলেছেন। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> ভাতারমারীর মাঠে ডঙ্কা বাজল সাঁওতালদের। ডুম–কড়ু-র্-র্–আকাশের ভীতি সংকীর্ণ বুক চিরে মন্দ্রিত হল রণবাদ্য। পায়ের তলায় যেন মাটি থর্-থর্ করতে লাগল, শিউরে উঠতে লাগল ধানের শীষ!
>
> –কড়ু-র্-র্–ক্র্যাং–
>
> চারদিক থেকে প্রবল কল্লোল। জনসমুদ্রে জোয়ার। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে–গ্রাম ছড়িয়ে–মাঠ পেরিয়ে। দূরে কাছে নাচছে রাশি রাশি মশাল। পৌণ্ডবর্ধনের সমাধিস্তূপ ভেঙে ছুটে আসছে গৌড়ীয় বাহিনী। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৫, পৃ ১৩৮]

এমন দৃশ্য কেউ আগে দেখেনি। ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছে, ইতিহাসকে মনে করবার চেষ্টা করেছেন। উনিশ শতক জুড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল ছিল। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলন। ভাতারমারীর মাঠে সবাইকে এক করে প্রতিবাদ করে ব্রজেন। তিনি চেয়েছে মানুষ অন্তত প্রতিবাদ করতে শিখুক। দেশের অবস্থা জানুক, নিজেদের চিনতে শিখুক। ঔপন্যাসিক পাঠকদের স্মরণ করবার জন্য বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> এমন দৃশ্য কেউ আর কখনো দেখেনি। কিছু দেখেছিল তিরিশ সালের সত্যাগ্রহে, কিন্তু এর তুলনায় সে কিছুই নয়। সে যদি প্রাণস্রোতে হয়–এ প্রাণ-সমুদ্র। যে যুগে মরা, ঘুণে-ধরা বাংলাদেশ এমন করে সামগ্রিকরূপে জেগে উঠত, তা বহুকাল আগেই বিস্মরণের তমসাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৬, পৃ ১৪৬]

এ সময়ে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে জন-মানসে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, তারই বিরুদ্ধে কখনো কখনো সাধারণ মুক্তিকামী মানুষের ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করতো। উপন্যাসটিতেও সেই বিন্দু বিন্দু ক্ষোভ জন-মানসে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হাজার হাজার সম্মিলিত জনতা হিংসাত্মক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দুপক্ষের সংঘর্ষ রক্তাক্ত রূপ নেয়। দুর্দিনের জন্য অশান্ত নগর আবার শান্ত হয়ে যায়, জীবনযাত্রা আবার আগের মতোই বয়ে চলে। ক্লাবে আড্ডা জমে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে শান্ত নিশ্চিন্তনগরের বর্ননা করেছেন এভাবে–

> তিন-চারদিন পরে একটু একটু করে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে নিশ্চিন্তনগর। আর দুর্ভাবনার কারণ নেই কিছু। ইংরেজ-রাজত্ব সত্যিই বানচাল হয়ে যায়নি। ধর্মরাজ্যে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে–সরকারী ফৌজ নিমকের গুণ ভোলেনি।
>
> সত্যিই কি ভারতবর্ষ আবার ঘুমিয়ে পড়বে। যে আগুন জ্বলেছিল–তার শিখা একেবারেই নিভে যাবে চিরদিনের জন্য। হয়তো আজ পথ ভুল হয়েছে– কিন্তু পথ চলার প্রেরণা কি সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে! ভুলের মধ্য দিয়েই তো সত্যের রূপ ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে–অনেক ব্যর্থ আত্মবলির অবসানে সাধনা সার্থকতার জয়মাল্য লাভ করে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৬]

মন্দ্র-মুখর উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতির দিকে ইঙ্গিত বহন করেছেন। উপন্যাসে অন্য সব চরিত্রের চেয়ে একজন ব্যক্তিকে রাজনীতি সচেতন করে সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক। রাজনীতি সচেতন এই ব্যক্তিটির নাম প্রভাস। আপতত পরাভূত, হতাশ মানুষের কাছে গিয়ে সে আবার নতুন করে তাদের বোঝানোর তাগিদ অনুভব করে। আকস্মিক, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়, প্রভাস সকলকে গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানায়। প্রভাসকে বিপ্লবী আখ্যা দান, গণসংগ্রামের প্রসঙ্গ এবং গণসংগ্রামের সৈনিক প্রভাষের পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে উপন্যাসে কিছুটা বাইরের দিক থেকে রাজনৈতিক রঙ দিয়েছে। উপন্যাসে মূলত রাজনৈতিক জীবনাদর্শের কথা বলা হলেও সেটা গান্ধীবাদী রাজনৈতিক আদর্শ না বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শ সেটা পরিষ্কার নয়। সব ছাপিয়ে ঔপন্যাসিক মানুষের সংঘবদ্ধতার শক্তিকেই বারবার বড় করে তুলেছেন। যেই সংঘ শক্তি কিছুটা হলেও গান্ধীবাদী রাজনীতির ইঙ্গিত বহন করে।

উপন্যাসে প্রভাস ছাড়াও সিংজীর কথায় মাঝে মাঝে রাজনৈতিক কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, সবাই যখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত এবং রাজনীতিতে পিছুটান দিতে শুরু করে তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> এ বড় চমৎকার কথা। আমরা কিছু করব না- চাকুরি চলবে, ব্যবসা চলবে– আর কলকাতা বম্বাইতে লড়াই হয়ে স্বাধীনতা এসে যাবে। এমন মুফৎ স্বাধীনতা আসে না কালীবাবু। সবাইকে দিতে হয়, সবাইকে কাজ করতে হয়। অনেক শিখের কলিজার রক্ত দিয়ে পাঞ্জাব বড় হয়েছিল- খবরের কাগজে পড়ে নয়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৫, পৃ ১৩৩]

উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র প্রভাস ও রেখা সান্যাল। বিপ্লবী প্রভাসকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যৌবনের প্রতীক, যুবশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সত্যিকার প্রতিনিধি কী সেটা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। প্রভাস আপাত পরাজয় মেনে নিলেও সে আবার মার্কসীয় বস্তুবাদি দর্শনের মতো নিজেদের গুছিয়ে পরিকল্পনা করে। সবাইকে নিয়ে আবার শুরু করার– আশাবাদের গান শোনায়। এমনকি রেখার বাহু পাশ কাটিয়ে সে আহত পাগলা কুকুরের মতো মানুষের কাছে ছুটে যায়, বলতে চায় বিশ্বাস না হারানো কথা। ফলে তার বিপ্লবী চরিত্রের স্পষ্টতা, দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়। তার বিশ্বাস-

> যা হারিয়েছে সংগ্রামী মানুষের দল, যা ত্যাগ করেছে তারা, যতক্ষানি রক্ত দিয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই- এ–তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভাণ্ডারী। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৪]

উপন্যাসের প্রায় সমাপ্তিতে বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি নিজেকে আবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেন। নতুন করে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় কওে প্রভাস আবারো সামনে এগিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> –স্বপ্ন তো দেখি না রেখা। যা অনিবার্য তাকেই দেখি। বাঁধ যখন ভেঙ্গেছে তখন তাকে ঠেকাবার সাধ্য আর কারো নেই। কিন্তু কূল-ভাঙ্গা দিক-ছাড়া বন্যা নয়–তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে– তাকে পথ দেখাতে হবে। ইতিহাস আর পৃথিবী যে পথে চলছে সেই বৈজ্ঞানিক পথ তাকে অনুসরণ করতে হবে। যা স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে রূপ পেয়েছিল– যুক্তির সত্য দিয়ে তাকে ফলবান করতে হবে। এর মধ্যে স্বপ্ন নেই– সুনিশ্চিত বাস্তবতা আছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৮]

তবে বিপ্লবের সেই পথ ফুলশয্যার নয়, দীর্ঘ এবং কষ্টকর একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে চলা। ঔপন্যাসিক মন্দ্র-মুখর উপন্যাসের একবারে শেষ লাইনেও সেই আশা ব্যক্ত করেছেন–

> পীচের রাস্তা দিয়ে চলছে বাসের পর বাস। আর্মড-ফোর্সের আনাগোনা–রাজবন্দীদের নিয়ে চলেছে লরী। আসছে অফিসার–অভিজাত–শহরের বাসিন্দা। আসছে বোম্বাই-দিল্লী-কোলকাতার মানুষ; আরো দূরের জগৎ–ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বার্তা আসছে রয়টারে। মসৃণ পথ, সমতল পথ–নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত জীবন।
>
> আর রঙীর খোয়া পার হয়ে, কানাঠাকুরকে পারানির পয়সা গুণে দিয়ে ভাতারমারীর মাঠের দিকে হেঁটে চলেছে প্রভাস। পিঠে একটা ছোট থলি–হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে লাল ধূলো। পঙ্কিল অসমতল রাস্তা–জনহীন দিক-প্রান্তর, টিলার ওপওে তালগাছের মাথায় শকুনের পাল। বাতাসে যেন এখনো ভাসছে বারুদের একটা মিষ্টি আর উগ্র গন্ধ। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৮]

একটা প্রচণ্ড আশাবাদের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে প্রভাস চরিত্রের মধ্যে পরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। উপন্যাসে প্রভাসকে ঠিক পুরোপুরি কর্মতৎপর চরিত্ররূপে দেখি না। উপন্যাসের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় এসে প্রভাসের কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেটাও পরোক্ষভাবে। যে গণসংগ্রাম তথা বিপ্লবের কথা সে বলেছে তার জন্য জনগণের সঙ্গে তাকে প্রত্যক্ষভাবে কোথাও যোগাযোগ করতে দেখা যায় না। ঔপন্যাসিক তাঁর যে রূপ বা চিত্র পুরো উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তা অনেকটা ভাবাবেগ মিশ্রিত। প্রভাস যতখানি আইডিয়াল ততখানি ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। প্রধান একটি চরিত্রের উপন্যাসের সবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকাই কাম্য ছিল। কিন্তু এখানে সেটা হয়নি।

রেখা সান্যাল বা লেডি ডাক্তার উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। তার চরিত্রে যুগোচিত ব্যক্তিত্বময়ী স্বাধীন নারীসত্তার রূপ লক্ষ করা যায়। সমসাময়িক কালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জীবন সম্পর্কে সে পুরোপুরি না হলেও সচেতন বলা যায়। তবু রাজনীতির সঙ্গে সে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। বরং দেখা যায় রাজনীতির স্রোত এবং ব্যক্তিগত জীবন তার মধ্যে কিছুটা দ্বৈত মতের সৃষ্টি করেছে। প্রভাসকে নিয়ে ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা সফল না হওয়ার বেদনা ব্যক্তিত্বপরায়ণা এডিথকে কখনো কখনো বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। চেষ্টা করেও সে বিপ্লবী প্রভাসকে ধরে রাখতে পারেনি তার বাহুবন্ধনে–

> প্রভাসের সমস্ত মুখখানা জ্বলছে–দীপ শিখার মতো। উজ্জ্বল দীর্ঘদেহে অনাগত সার্থক দিনের যেন আনন্দময় প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে। কিন্তু তবুও রেখা খুশি হয়ে উঠতে পারছে না–চোখের কোণ দিয়ে তেমনি অশ্রুর বিন্দু গড়িয়ে আসছে। আর পারে না সে– আর পারে না। এই স্বাধীন জীবন–এই নিঃসঙ্গ পথ-যাত্রায় সে ক্লান্ত। কিন্তু রুদ্র সন্ন্যাসীর তপস্যা শেষ হবে কবে? কবে আসবে মিলনের মধুমাস। সে কি অনাদি আর অনন্ত কালের পরে? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,পরিচ্ছেদ : ৮, পৃ ১৫৮]

প্রভাস আর রেখা– এদের ব্যক্তিগত জীবন এবং উভয়ের একান্ত সম্পর্ক উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। প্রভাসকে ঠিক বোঝা যায়নি, কিন্তু চকিত কোনো আচরণে রেখার মানবীয় দিক ধরা পড়েছে। যেখানে রাজনীতির বাইরে মানবিক বোধের কথাই স্পষ্ট হয়েছে বেশি। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্য উপন্যাসের মতো এখানেও ঘরোয়া বা পারিবারিক জীবন চিত্র তেমন পাওয়া যায় না। মূলত সারাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারের একটা ক্ষুদ্র অংশ উপন্যাসের অবয়বে তুলে আনতেই বেশি প্রয়াসী হয়েছেন। তাই ছোট ছোট চরিত্রগুলো ক্ষুদ্র পরিসরে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। সুবিধাবাদী ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, রাজভক্ত দারোগা, কিশোর স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষিতা রাজনীতি সচেতন নারী সকলেই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত আর এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে *সূর্য-সারথি* উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এখানে ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছেন বিপ্লবী আন্দোলন এবং কংগ্রেস আন্দোলন। কলকাতা মহানগর ও ডুয়ার্সের চা বাগান- দুটি স্থানকে একত্রিত করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তিত চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সূর্য-সারথি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রণী কথাসাহিত্যিক 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়'[১৮] কে উৎসর্গ করেছেন *সূর্য-সারথি* উপন্যাস। ১৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে, বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। *সূর্য-সারথি*'র পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কলকাতা মহানগর। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেঙ্গুনে জাপানী বোমার কারণে আতঙ্কিত কলকাতার নগরবাসী নিজেদের আবাস ছেড়ে দলে দলে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে পূর্ব বাংলা'য়। অন্যদিকে ডুয়ার্সের চা বাগানে যুদ্ধের পরিবেশে মাথা তুলেছে নব যুগের বিদ্রোহী শক্তি।

মুলত সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-জনতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে *সূর্য-সারথি* উপন্যাসের মধ্যে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাংগঠনিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্য না হলেও মানুষের সংঘশক্তি উপর আজীবন তাঁর আস্থা ছিল। আর সেই সংঘ শক্তির রূপায়ণই ফুটে উঠেছে *সূর্য-সারথি* উপন্যাসে।

> 'বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্তের উপর ওর বিশ্বাসের মূলে চীন দ্বারা ভারত আক্রমণ ভয়ংকর আঘাত দেয়। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এই আঘাত ও সামলে উঠতে পারেনি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল, কিন্তু নারায়ণ কখনো মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক হয়নি।'[২০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্ম্পকে উপরের উক্তিটি করেছে এক সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিও সদস্য এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু সরোজ দত্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী থেকেও এটা আমরা জানতে পারি যে, কমিউনিস্ট পার্টির উপরে তাঁর আস্থা থাকলেও সাংগঠনিকভাবে তিনি কখনও পার্টির সঙ্গে যুক্ত হননি। সাম্যবাদের মতাদর্শ ধারণ করায় জনতার সংঘ শক্তির উপরে তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। 'সংঘবদ্ধ জনতা যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে'-এই আস্থায় মুলত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক

উপন্যাস রচনার পটভূমি পরিপ্রেক্ষিত। ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক আদর্শ আরো প্রগাঢ় রূপ ধারণ করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। সারা বিশ্বব্যাপি যুদ্ধের তাণ্ডব ভারতবর্ষেও প্রাধান্য বিস্তার করে। যুদ্ধের বাজারে ভারতবর্ষের কী অবস্থা হয়েছিল তারই পটভূমিকায় *সূর্য-সারথি* উপন্যাসের চয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ের দুটি অঞ্চলের উপর ঔপন্যাসিক গুরুত্ব দিয়েছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা কলকাতার দৃশ্যপট পাই। যেখানে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। ব্যক্তি মানুষের নিজের বিশ্বাস, সংস্কার আর দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কারে ফাটল ধরেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতায় মানুষের। মানুষ প্রাণে বাঁচার আশায় শহর ছেড়ে, ব্যস্ত জনপদ ছেড়ে–গ্রামে পাড়ি জমাচ্ছিল। যুদ্ধের আতঙ্ক, ভয়-তাঁর স্বাভাবিক জীবনকে পর্যদস্ত করে তুলেছিল। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখা যায় কলকাতার মানুষের গ্রামের অভিমুখে যাত্রার ছবি। ঔপন্যাসিক দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> পথ দিয়ে বন্যার মতো ধারায় চলেছে ভয়ার্ত মানুষের শোভাযাত্রা। ঠিক শোভাযাত্রা নয়, শবযাত্রা। ছেদহীন ট্রাফিকে পলাতকদের বহু আশার গৃহস্থালির সরঞ্জাম–অনেক শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগানের কাঁসার জিনিসপত্র থেকে শুরু করে পায়া-উঁচু-করা ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: এক, পৃ ১৭০]

সূর্য-সারথি উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক যুদ্ধ আক্রান্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। দলে দলে মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের আতংকগ্রস্ত চেহারা দেখে সুমিতার মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এটা তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন।

> পৃথিবীটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষের মন–পলায়নী ছাড়া আর শাশ্বত সমস্ত বৃত্তিগুলোই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে একসঙ্গে। তাই সুমিতাকে দেখে কেউ হাঁ করে তাকিয়ে রইল না, কেউ শিস দিলে না, আলগাভাবে কেউ একটুখানি ধাক্কাও দিয়ে গেল না ওকে। যুগান্তর ঘটেছে যেন চারদিকে–পৃথিবীতে সত্য যুগ এবারে নেমে আসবে বলেই ভরসা হচ্ছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: এক, পৃ ১৭৪]

যুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষ ভয় পেয়েছে। ঔপন্যাসিক একেবারে মানুষের ইতিহাসের মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করেছে বলেছেন–

> সেই পুরানো ভয়, পুরানো যুদ্ধেও খবর। অসুস্থ্য, অসংলগ্ন কলকাতা। সমস্ত শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার ওপরে ছেদের একটা আকস্মিক সীমারেখা নেমেছে এসে। হঠাৎ ভয় পেয়ে জ্বরে পড়লে যেমন হয়, তেমনি ভূতগ্রস্ত বিকারের রোগীর মতো দুটো ভয়াতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে কলকাতা ট্রলাপ বকছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: এক, পৃ ১৭৪]

মানুষের রক্তের মধ্যেই পূর্বের যুদ্ধের বিভিষিকার স্মৃতি রয়েছে। তাই আবার যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বিশেষত রেঙ্গুণে জাপানী বোমা পড়েছে তখন যেন 'হঠাৎ ভয় পেয়ে জ্বরে পড়লে যেমন হয় তেমনি ভূতগ্রস্থ বিকারের রোগীর মতো দুটো ভয়াতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে কলকাতা প্রলাপ বকছে।' কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন প্রায় বন্ধ হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেসময় সংঘবদ্ধ হয়েছে কতগুলো যুবক-যুবতী। এরা হলো–আদিত্য, সুমিতা, অনিমেষ, মনিকা, ইন্দু। ঔপন্যাসিক এদের নতুন যুগের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। এই পাঁচজন ছাড়া আরো কয়েকজন-সবমিলিয়ে আট-দশ জন ছেলেমেয়ের একটা দল। এরা লেখাপড়া করে, ভালো চরিত্রবান ছেলে হিসেবে সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা আছে। কিন্তু তারা নিজেদের বাজি রেখেছে অন্য প্রান্তরে। তারা নিজেদের সব সুখ-আনন্দ, ভালো লাগাকে পরিত্যাগ করেছে। দেশ স্বাধীন করার ব্রতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তারা রক্তশপথ করেছে। যতদিন পর্যন্ত না দেশ শত্রুমুক্ত হবে ততদিন তারা কোন আনন্দে-রোমান্সে নিজেদের জড়িত করবে না। ঔপন্যাসিক কাঞ্চণজঙ্ঘার সকালের রূপের সঙ্গে প্রতিরূপে রূপায়িত করে তাদের উপস্থাপন করেছেন।

> 'অরণ্যের কোনো এক প্রান্তরেখায় দেখা দেন সূর্য-সারথি, আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। এই শালবন ছাড়িয়ে আরো বহু বিস্তীর্ণ বাঙলাদেশ, সেই বাঙলাদেশের আরো সুদূর কোন এক সীমান্তে কলকাতার আকাশে অরুণরাগে রাঙিয়ে ওঠবার আগেই কাঞ্চণজঙ্ঘা তার দীপ্তিতে রঙীন হয়ে ওঠে। শাদা তুষারের ওপর দিয়ে যেন রক্তের ধারা গলে গলে পড়তে থাকে। শালবনের বনের মধ্যে সূর্যের আলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ক্রমশ উজ্জ্বল আর প্রখর হয়ে ওঠে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ১৮৬]

কলকাতার জীবনচিত্রের বাইরে আর একটি চিত্রায়ণ উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ডুয়ার্সের চা বাগান। সম্ভবত ঔপন্যাসিক দুইটি অবস্থানকে পাশাপাশি চিত্রায়ন করেছেন বিপ্লবীদের প্রয়োগের অর্থাৎ অনুশীলনকে প্রাধান্য দেবার জন্য। উপন্যাসের মূল চরিত্র অনিমেষ এর প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন–

> ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যতম চূরান্ত রূপ হচ্ছে চা-বাগান। সেখানে এখনো আফ্রিকার আদর্শে রাজ্যপাট চলছে। সেখানে শ্রমের দাম নাম মাত্র, জীবনের দামও প্রায় তাই। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর মানুষের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যেটুকু বাকি আছে, তাকে শেষ করে দিচ্ছে ম্যানেজার থেকে নিম্নতম বাবুটি পর্যন্ত। বাইরে থেকে কারো সেখানে ঢুকবার জো নেই–যে ঢুকবে তাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা হবে।
>
> [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ২০০]

Dhaka University Institutional Repository

অনিমেষসহ পুরো সংঘবদ্ধ শক্তিটি হিংসার পথে নয়, সংগ্রামের পথে বিপ্লবের ডাকে শামিল হয়েছে। তারা চা বাগানের ম্যানেজার ইংরেজ রবাটসনের বিরুদ্ধে চা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলার কাজে শামিল। যেটার অংশ হিসেবে অনিমেশ ডুয়ার্সে কাজ নেয়। পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও অনিমেশের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিমত্তা রবার্টসকে মোহিত করে। অনিমেশ কাজ পায়, কাজ পাবার তিনমাস পরেই ম্যানেজার রবার্টসকে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটে। সামন্তশ্রেণির প্রতিনিধি রবার্টসন, সে কুলিদের সঙ্গে অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন করে। একজন কুলি তাকে দেখবার পরেও সাইকেল থেকে না নামায় রবার্টস ক্ষেপে যায়। ঔপন্যাসিক রবার্টসের সেই মেজাজকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে–

> হেঁটে নয়, যেন জ্বলন্ত একটা হাউয়ের মতো বাগানে উড়ে এল রবার্টস। একটা কুলি সর্দারের এত সাহস হওয়া সম্ভব নয়–এর পেছনে কোনো ভদ্রবাবুর ইঙ্গিত নিশ্চয় আছে। এতকাল এই চায়ের বাগানের সপ্তদশ শতাব্দীর ধরণে যে রাজত্ব চলে এসেছে–সাহেবের সামনে দিয়ে কেউ ছাতা মাথায় চলতে পারেনি, ঘোড়া বা সাইকেলে করে যেতে পারেনি, সাহেবকে যারা দেবতার চাইতেও বড় করে দেখে এসেছে–তাদের এতখানি আস্পর্ধা দিল কে? কে এই শয়তান।
>
> [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ১৯০]

শ্রমিকদের শোষণ করে ভারতবর্ষের সর্বকৃষ্ট অর্থকারী ফসলের ভাগ ইংরেজরা নিজেদের গোলায় তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চায়ের বাজারে মন্দা বিরাজ করতে থাকে। এত ইংরেজদের আয় কমে যায়। উপন্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

> সে প্রায় আজ ছ'মাস আগেকার কথা। এর মধ্যে অনেকখানি বদলে গেছে পৃথিবী। ইয়োরোপে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার আগুন আস্তে আস্তে শিখা বিস্তার করতে লাগল এশিয়ার প্রান্তে প্রান্তে। খবরের কাগজ খুলে রবার্টসের চোখে পড়তে লাগল দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। চায়ের ব্যবসায় মন্দা– ইয়োরোপে শিপ্‌মেন্ট যাচ্ছে না– প্লাইউডের বাক্স ভর্তি চা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে খিদিরপুরের ডকে। বাকি ছিল আমেরিকা, জাপানী-যুদ্ধের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত জলের তলাতেও দেখা দিতে লাগল ইউবোট আর টর্পেডো– ও পথও বন্ধ হয়ে গেল।[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ১৮৮]

চা বাগানের সামন্তীয় কাঠামোর মধ্যে কেউ নিয়মপালন না করলে রবার্টস প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। ম্যানেজার বাবুকে শ্রমিকরা যেখানেই দেখুক না কেন তাকে সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়াতে হয়। ম্যানেজার চলে গেলে পড়ে সে সেখান থেকে যেতে পারে। চা বাগানে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজত্ব চলে–সাহেবের সামনে কেউ ছাতা মাথায় চলতে পারেনি, ঘোড়া বা সাইকেলে করে যেতে পারেনি, সাহেবকে তারা দেবতার চাইতেও

বড় করে দেখে–আজ সেখানে পরিবর্তন এসেছে। অনিমেষ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি ঘৃণা জাগিয়ে দেবার কারণে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। একা ইংরেজদের বিপরীতে পুরো চা বাগানের শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

> অপমানিত মানুষের রক্তে রক্তে সাড়া উঠেছে– শ্রেণী সংঘাতের সাড়া। বিপ্লবের লাল ঘোড়া দিগন্তের আকাশে ঝোড়ো মেঘের কেশর ফুলিয়েছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তি, পৃ ১৯২]

এই ঘটনার পরে এত দিনের পুরানো আগুন যেন জ্বলে ওঠে। তীর্ব হয় শাসক আর শোষিতের সংগ্রাম। অত্যাচারী ম্যানেজার রবার্টস-এর সঙ্গে চা শ্রমিকের সংঘাত বাঁধে। শোষকের প্রতিনিধি রবার্ট আর সাওতাল শ্রমিকদল, শোষনের বিরুদ্ধে প্রবল গণশক্তি। অনিমেষকে যখন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে ম্যানেজারের কাছে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর কথা বলে, তখন রবার্টস ক্ষেপে যায়। প্রচণ্ড মেরে অনিমেষকে রক্তাক্ত করে ফেলে। তার প্রতিবাদে শ্রমিকরা গিয়ে ম্যানেজারকে খুন করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়।

অন্যদিকে কলকাতায় সুমিতা সংঘবদ্ধ দলটির মূল অভিভাবক হয়ে ওঠে। যুদ্ধের বাজারে সবার থাকার সমস্যার সমাধান করে সে, পরিচিত এক জনের বাড়ি পাহারা দেবে–সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ঔপন্যাসিক এই গোষ্ঠির রাজনীতি আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেননি। কিন্তু সেটা যে বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা এবং 'যুগান্তর পার্টি'র রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করবার কাজ করছে, তা চাপা থাকে না। কারণ তাদের গোপন কাজের ধরণ, নিজেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং যৌথ জীবনযাপনের মধ্যে অনেকখানি স্পষ্ট হয়। কিন্তু তাদের এই মুহূর্তে কাজের দীশা কী, পরিকল্পনা কী-সেটা পরিষ্কার হয় না। ঔপন্যাসিকে সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতি অনুরাগ আছে, সেটা আমরা পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর আলোচনাতেও দেখেছি কিন্তু কোন কর্মসূচির আলোকে সেটা করা হচ্ছে, তা জানতে পারি না। এই একদল ছেলেমেয়ে তারা যে কাজগুলো করে যাচ্ছে- তার ফলাফল কী হচ্ছে, তাদের পরিচালনা করছে কে? যদিও পার্টিও নেতৃস্থানীয় বলে অনেক সময় তাদের কাজের সমস্যাগুলো মণিকার সঙ্গে আলাপ করছে। কিন্তু মণিকার উপরে কে আছে, তাদের কেন্দ্র কোথায়–এসব কিছুই ঔপন্যাসিক অবহিত করেন না। লেখকের সংঘবদ্ধ কিম্বা গণশক্তির প্রতি আকর্ষণ অবহিত হতে পারি কিন্তু কে তাদের পরিচালনা করছে–কর্তব্য নির্ধারণ করছে সেটা স্পষ্ট হয় না। উপন্যাসের এগারো পরিচ্ছেদে অনিমেষের হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে লেখকের অবস্থান কিছুটা স্পষ্ট হয়। কুলিরা রবার্টসকে হত্যা করেছে এটা জানার পর অনিমেষ বলে–

> এ পথ আমাদের নয়। একজন রবার্টসকে খুন করা আমাদের কাজ নয়–আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবী জুড়ে রক্তবীজ রবার্টসদের ঝাড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেওয়া কিন্তু ওরা ভুল করল–ভয়ঙ্কর ভুল করল। এক পা এগোতে গিয়ে আমরা তিন পা পেছিয়ে গেলাম।---
>
> আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। অনেক অপচয়ের ভেতর দিয়ে করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।
>
> বিপ্লবের ধর্মই যে এই শক্তি আমরা যত বেশি সঞ্চয় করব–স্থানে অস্থানে সে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেই। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটবে, আমরাও রেহাই পাব না। তারপর যেদিন শেষ বিপ্লব আসবে–সেদিন আমরা অনেকেই চূর্ণ হয়ে যাব বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তবীজেরাও একেবাওে নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে। এ তারই ভূমিকা।
>
> [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: বারো, পৃ ২৮১]

অনিমেষের এই সংলাপ থেকে মনে হয়, আদর্শ এবং অনুশীলনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তত্ত্বকে কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার সমস্যা। রাজনৈতিক ভাষায় যাকে লাইনের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দুলাইনের সংগ্রামের হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যে পদ্ধতিতে তারা কাজ করছে সেটার সঙ্গে দ্বন্দ্ব। তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের দ্বন্দ্ব। তাই অসুস্থ্য অনিমেষ যখন শুয়ে শুয়ে পার্টির কাজগুলো চিন্তা করছিল তখন তার মনে হয়েছে 'আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। অপচয়ের ভতর দিয়ে করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।' সে মহানবিপ্লবী লেনিনের কথা থেকে বলেছে–

> দরকার হলে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাও। সত্যি কথা–কোনো ভুল নেই কোনো সংশয় নেই। বিপ্লব কখনো সোজা রাস্তায় তীরের মতো উড়ে চলে না। তার লক্ষ্য নিশ্চিত, কিন্তু গতিপথ সরীসৃপের মতো আঁকা বাঁকা কুটিল। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: এগারো, পৃ ২৬৬]

কিন্তু *সূর্য–সারথি* উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সারথির রথের পথের কথা ঠিক বলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সহিংস নয়–অহিং পথে তিনি বিপ্লব চেয়েছেন। শক্তির অপব্যয় নয়, আসন্ন আগামী বিপ্লবের জন্য যৌথশক্তি সংহত করার আহবান জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু বিপ্লবের পথে কতখানি হিংসাকে বর্জন করতে পারে বা শ্রমিকের আন্দোলন কতখানি নরম পথ অবলম্বনে চলতে পারে সে সব বিষয়ে পাঠকের পূণাঙ্গ কৌতুহল এই উপন্যাসে নিবৃত্ত হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে নিজের আদর্শ সম্পকে বলেছেন–

> আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নই, কোনোদিন ছিলামও না। যতদূর জানি কম্যুনিস্ট লেখক হতে গেলে এই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হয়, সক্রিয়ভাবে তার কর্মধারার অংশীদার হতে হয়, অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। [২১]

নিজে পার্টির কাজে অংশগ্রহণ না করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর মেজ'দা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ঔপন্যাসিক হয়ত তার কাছে থেকেই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতেন। কিন্তু পার্টি কিভাবে কাজ করে, মানে একজন পার্টি সংগঠক কিভাবে জনগনের মধ্যে পার্টির লাইনকে স্থাপন করে সে সম্পর্কে উপন্যাসিকে দৃষ্টি একবারে ভাসাভাসা। তাই একই উপন্যাসে তিনি একবার গান্ধীবাদের কথা বলছেন, আবার একদিকে বিপ্লবী পার্টিও কথা বলছেন। যদিও তারা কিনা আবার একই দলের সদস্য। *সূর্য-সারথি* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই অনিমেষ'কে–যে, চা বাগানে কাজ করে-মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন করে, চা শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু তাঁর–রক্ত, হত্যা পছন্দ নয়। অহিংস পথে সে এই সমস্যার অর্থাৎ শ্রেণি সমস্যার সমাধান করতে চায়। কিন্তু 'শ্রেণি'র রাজনীতি করতে হলে পার্টিকে বিপ্লবী পথেই করতে হবে'[২১]- মার্ক্সবাদী দর্শন এমনটাই বলে। উপন্যাসে বিপরীত ভাবে দেখা যায়, কলকাতার দল তারা কিন্তু আবার বিপ্লবী পথেই কাজ করছে,-লাটি নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে মারামারি করছে মালিকের বিরুদ্ধে। সুতরাং সূর্য-সারথি উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হলেও কোথাও কোথাও দুটি রাজনৈতিক আদর্শের সমন্বয় চোখে পড়ে। তবে ঔপন্যাসিকের ইচ্ছে ছিলো মানুষের মধ্যে কল্যাণবোধ, শুভোবোধ আরোপ করা। সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

সূর্য-সারথি উপন্যাসে 'অনিমেষের সঙ্গে সুমিতার হৃদয়গত যে বন্ধন'-সেটাকে ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। পূর্ববর্তী উপন্যাস যেমন– *তিমির তীর্থ* ও *মন্দ্র-মুখর*'এ তা ব্যথ হয়েছিল, এই দুটি উপন্যাসে নায়ক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র থেকে যায় তার বাইরে। *সূর্য-সারথি*'তে ঔপন্যাসিক এই অবস্থানটির নতুন নির্মাণ করেছেন। এখানে প্রধান চরিত্র অর্থাৎ প্রধান নর ও নারী চরিত্র যারা-হৃদয়গত সম্পকে আবদ্ধ, তারা দু'জনেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কলেজ জীবন থেকেই তাদের ভালো লাগার সর্ম্পক গড়ে উঠলেও, সেটাকে অনিমেষ প্রশ্রয় দেয়নি। অনিমেষ আগে দেশের মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তার পরে ব্যক্তি মুক্তির ভাবনা–বলে মত প্রকাশ করেছে।

> যুদ্ধ থামলে নতুন যুগ আসবে আমাদের, আসবে নতুন জগৎ। সেদিন পরাধীনতা থাকবে না, সেদিন আমরা আগামীকালের মানুষের জন্যে আগামী দিনের সমাজ গড়ে তুলব। আজ তার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি চাই– প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: এগারো, পৃ ১৬৭]

উপন্যাসে সুমিতা, অনিমেষ, আদিত্য এদের মধ্যে পারিবারিক কোন জীবনাচারণের চিত্র পাওয়া যায় না। সবাই একটা বৃহত্তর ধ্যানে নিজেদের নিয়োজিত করে। ক্ষুদ্র পারিবারিক কিম্বা সাংসারিক গণ্ডির আবদ্ধতার চেয়ে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি বৃহত্তর সমাজের দিকে। তাই দেখা যায়, যুদ্ধের কারণে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব, চায়ের দোকানের আড্ডায় জার্মানি না জাপান কিম্বা ভারত সরকার কাকে সমর্থন করলো এমন সব কথাকলি। সুমিতা পার্টির কমরেডদের নিয়ে কলকাতার একটি বাড়িতে যৌথ জীবন গড়ে তোলে। এই বাড়ির জীবন আদতেই একটি পার্টির যৌথ জীবন গড়ে তোলার প্রয়াস। সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই কাজে চলে যায়। রাতে ফিরে আসলে প্রত্যেকের নিদৃষ্ট কাজ বেঁধে দেয়া হয়, যেমন– রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, তারা এসব নিজেদের তাগিদেই করে। প্রাত্যহিক এসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে সারাদিনের কাজের (রাজনৈতিক) সারসংকলন। কোনোটা কার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে, কার দৃষ্টিতে কোনোটা ভুল, এমন রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়াগত আলোচনা। এসব আলোচনায় আবার মনোমালিন্য হয়, অভিমান, রাগ হয়। কিন্তু সবাই যেহেতু বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে কাজ করতে আসে, ফলে সেসব ভুলে যায়। মুলত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার একটি প্রাথমিক আদোল সুমিতার আস্তানা। পরে মান-অভিমান, রাগ ভুলে আবার সবাই মিলে গান করে, নয় কবিতা পড়ে। তাদের পারস্পরিক তর্ক- বিতর্কের একটি চিত্র তুলে দিলেই বিষয়টি আরও দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে–

> পিপ্‌লের সামনে যে বাস্তব সমস্যাগুলো আসে, তাকেই তারা একমাত্র স্বীকার করে? ফাঁকা আদর্শের মূল্য কী, বলো? আমাদের ন্যাশনাল স্ট্রাগ্‌ল থেকে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। স্বাধীনতা আন্দোলন আমরা বারে বারেই তো করেছি। দেশের সবাইকে ডাক দিয়েছি, মধ্যবিত্তকে, শ্রমিককে, কৃষককে। কিন্তু ফল কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত ? আমরা বন্দেমাতরম্ বলে আহবান জানিয়েছি, তারাও ছুটে এসেছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: পাঁচ, পৃ ২২০]

তাদের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও বিপ্লবী রাজনীতির পার্থক্য ও সম্পর্কের প্রশ্ন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে ডুয়ার্সের চা বাগানের প্রতাপশালী ম্যানেজারকে ক্ষমতাবানদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে–

> আদর্শ ইংরেজ রবার্টস নিজের শিরাস্নায়ুতে যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে নর্ডিক রক্তের নীল-প্রবাহ। মাথার চুলগুলো উগ্র তামাটে রঙের। মোটা নাকে পরিস্ফীত রক্তাক্ত শিরার জাল-বিস্তার। হাতের রাইডারটা বড় ঘোড়াটাকে মায়া করে চলে বটে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার অনুকম্পা নেই। কুলির পিলে- ফাটানো বীর জাতির উপযুক্ত বংশধর। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ১৯২]

উপন্যাসে এমনি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। চা বাগানে শ্রমিকদের সংঘঠিত করার কাজ করে অনিমেষ। শহরে পার্টির অন্যান্যদের নিয়ে শ্রমিক এলাকায় কাজ করে সুমিতা। পাশাপাশি শ্রমিকদের বাইরেও তাদের নিজেদের লজিস্টিক সার্পোট গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পায় না কেউ। শেষে একসময় সবাই ধরা পড়ে। অনিমেষ, সুমিতা জেলে যায়। কবি ইন্দু গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। অন্যরা যে যার মতো পালিয়ে যায়। কলকাতার বাড়িতে পুলিশ তালা দিয়ে ফেলে। আর একমাত্র অনিমেষ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আকাশে তাকায়। ঔপন্যাসিকে বলেছেন–

> 'যুদ্ধ! গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতার জন্যে। ভারতের শৃক্ষলিত বুকের ওপরে ট্যাঙ্কের চাকা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে–স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র আসবে বইকি। কিন্তু এ যুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধ তার প্রস্তুতি মাত্র। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: বারো, পৃ ২৮১]

এমনই প্রস্তুতির নিশানা উড়িয়ে মৃত্যু সৈনিকের ঊষার স্বপ্ন রাঙিয়ে *সূর্য-সারথি*'র সমাপ্তি। কিন্তু শুরু নতুন স্বপ্নের, যেখানে হয়ত রাজনৈতিক বোঝা পড়ার মধ্য দিয়ে নতুন ঊষা ফুটবে।

অন্য উপন্যাসগুলোর মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *সূর্য-সারথি* উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাব্যময়তা, সংকেতময়তা ও রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ি সংলাপের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। অনিমেষ আর সুমিতার সংলাপে কাব্যময় ভাষা হৃদয়গত ভাব প্রকাশে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন–

> হঠাৎ অনিমেষের চমক লাগল।
>
> চাঁদ বেশ মাথার ওপর। তার সমস্থ আলো একরাশ সদ্যফোঁটা বকুলের মতোই যেন সে সুমিতার মুখে উজার করে ঢেলে দিয়েছে। আর তার ছোঁয়ায় সুমিতার চোখ দুটিও ফুলের মতো ফুটে উঠেছে–ফুটে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশে প্রথম জেগে-ওঠা দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এই চোখ–এই চাঁদ–কতকাল আগে ভুলে গিয়েছিল অনিমেষ?

> মুহূর্তের জন্য ঘোর লাগল অনিমেষের। রক্তে কথা কয়ে উঠল কথাকলির ছন্দ। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: তিন, পৃ ১৯৫]

এবার ব্যর্থ হলেও ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সূর্য-সরাথি'র ইতি টেনেছেন। লড়াইয়ের চেতনা যুগে যুগে থাকবে, মানুষ লড়ে যাবে-ব্যর্থ হবে-এগোবে। নতুন সূর্য ব্যর্থতাকে ঢেকে দিগন্ত আলো করে উঠবে–এটাই প্রত্যাশা ঔপন্যাসিকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিলালিপি উপন্যাসটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। মূলত তাঁর বেড়ে ওঠা সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি নায়ক রঞ্জুর মনস্তত্ত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন কিভাবে প্রভাব ফেলেছে সেই প্রসঙ্গও উপন্যাসিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন।

শিলালিপি [প্রথম অধ্যায়]

রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণসংগ্রামের পথ, সমগ্র আন্দোলনের সময় ও ক্রিয়াকলাপ– এ সবের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন *শিলালিপি* উপন্যাস। উপন্যাসটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায় 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে আর দ্বিতীয় অধ্যায় 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড'এ দ্রষ্টব্য। 'প্রথম অধ্যায়' সাজানো আটটি পরিচ্ছেদ আর 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এ এগারোটি পরিচ্ছেদে। *শিলালিপি* উপন্যাসের নায়ক রঞ্জু। দুই অধ্যায়ে নায়ক তিনি। 'প্রথম অধ্যায়'-এর আটটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে রঞ্জুর বেড়ে ওঠা, স্মৃতিকাতর, ভাবুলতা মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখানে নায়কের অবস্থান অনেকটা দর্শকের ভূমিকায়। আর 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এর এগারোটি পরিচ্ছেদের মধ্য রঞ্জুর বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের ভাঙা-গড়া প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

রঞ্জুর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত সময়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আর সময়কে তুলে ধরবার সচেতন প্রয়াস হিসেবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র তুলে এনেছেন। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় [(১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ্য সংখ্যায় প্রকাশ শেষ হয়)। *ভারতবর্ষ*-এ প্রকাশের সময়ই *শিলালিপি* পাঠকের মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। ঐ একই বছর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার কারণেই পরবর্তী বারো বছরে আরো চার বার মুদ্রিত হয়।

উপন্যাসটির ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন–

> এই বইয়ের সব চরিত্রই কাল্পনিক। নামসাম্য, স্থানসাম্য কিম্বা ঘটনাসাম্য যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়, তা হলে সে সব নিছক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে লেখকেরও কোনো দায়িত্ব নেই।[২২]

উপন্যাসের ভূমিকায় ঔপন্যাসিকে এই কথা বলবার মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন। এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেই হয়তো উপন্যাসের কোনো কোনো নাম, স্থান এবং ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রঞ্জু বা রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৈশোর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা ঔপন্যাসিকের জীবনী পাঠেই জানা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরিশালের এম.ই স্কুলে পড়বার সময় প্রথম রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা এবং মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রঞ্জু ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মিল পাওয়া যায়। যেমন, রঞ্জুর পিতার পেশা দারোগাবৃত্তি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতার পেশাও তাই ছিল। রঞ্জু অল্প বয়সে গোপনে কবিতা চর্চা করতো, ঔপন্যাসিকও তাই করতেন। এসব মিল থাকবার পরেও *শিলালিপি*কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মজীবনীমূলক' উপন্যাস বলা যাবে না তবে ঔপন্যাসিকের কৈশোর কাল এই উপন্যাসেই যে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিধৃত হয়েছে সে ধারণা পোষণ করা যায়। ঔপন্যাসিকের ছোটবেলার ডাকনাম ছিল রঞ্জু এ তথ্যও তাৎপর্যবহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীলেখক, ব্যক্তিগত বন্ধু, কথাসাহিত্যিক সরোজ দত্ত *শিলালিপি* উপন্যাস সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন–

> ১৯৭০-এর পূজোর ছুটিতে বাইরে যাবার কিছু আগে নারায়ণ লেখক হিসেবে নিজের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, প্রথম পর্বে *শিলালিপি*'র রঞ্জন, মধ্যপর্বে সত্যজিৎ, *ভস্মপুতুল*'-এর এবং শেষদিকে *নির্জন শিখর*-এর দেবনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা। আরো বলেছিলেন, রঞ্জনের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের রং লেগেছে একটু চড়া ভাবে; আর দেবনাথ তাঁরই মতো অধ্যাপক–সত্যকে চায় কিন্তু নিতে ভয় পায়, নিজের কাছে নিজে হার মানে।[২৩]

শিলালিপি উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে অতীত ঘটনার স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে। প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই ঔপন্যাসিক একটু নস্টালজিক ভঙ্গিতে স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। পদ্মা নদীর জন্য আক্ষেপ করেন। যেন কোন দূরে দেশে তিনি চলে এসেছেন নিজের পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে। চলে এসেছেন একেবারে জীবন সায়াহ্নে। যখন তাঁর আর স্মৃতি ছাড়া কোনো সম্বল নেই, নেই কোনো পিছুটান। অলস একটি সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের কর্মোদ্যম সময় ফিরে পেতে চাইছেন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা এমনভাবে এসেছে–

> আকাশে শাদা মেঘের পাল, নিচে মহাজনী নৌকোর।
>
> বড় ভালো লাগছে অলস কর্মহীন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে। মনে হচ্ছে ওই নৌকোগুলো আর কিছুই নয়–পদ্মার ঘোলাজলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অতিকায় কয়েকটা চখাচখী।

> পদ্মা। গভীর, গম্ভীর। খড়্গধার জলতরঙ্গ। নিজের রক্তের সঙ্গে তার সংযোগ আছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পদ্মার কলধ্বনি শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর ঘনিয়ে আসে চেতনায়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ২৯১]

পদ্মার এমনি বর্ণনা দিতে দিতে ঔপন্যাসিক ফ্ল্যাশব্যাকের মতো রঞ্জুর কাছে চলে গেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ননাটি এমন–

> পদ্মার উপর থেকে উঠে এল একটা হু-হু করা বাতাস। পেছনের বন্ধ দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল; আর দরজা খোলবার সেই শব্দটা হঠাৎ যেন একটা ইথারের ঢেউকে আশ্রয় করল–স্পন্দিত হতে হতে ভেসে চলল সময়ের আকাশ দিয়ে পনেরো বছর পেছনে ; যেখানে ইস্কুল-পালানো একটি দিনের দরজা খুলল–হঠাৎ শুক্তি-খুলে-যাওয়া নিটোল মুক্তের মতো উজ্জ্বল একটি দিন।[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ২৯২]

স্কুল পালানোর স্মৃতিচারণ দিয়ে উপন্যাসে রঞ্জুর কাহিনী শুরু। প্রধম পরিচ্ছেদের শেষে রঞ্জুর শিলালিপিতে প্রথম একটি আচড় পড়ে। রঞ্জুর রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, রাজনৈতিক ব্যক্তির আচরণ তাঁর মধ্যে গ্রথিত হয়। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> হেসে উঠতে গিয়েও হঠাৎ কেন যেন থেমে গেলেন অবিনাশবাবু। শান্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জুর দিকে। বললেন, তুমি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ–এসব কথা এখন বুঝতে পারবে না। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো। আজ যাঁর ছবি তোমাকে দেখালাম, তিনি স্বদেশী বটে, কিন্তু এ দলের নন। তিনি বলেন, বোমা কামান দিয়ে কখনো অন্যায়কে জয় করা যায় না, তাকে জয় করা চলে ত্যাগে, জয় করা যায় অহিংসায়। আমি সেই মন্ত্রের সাধক। ক্ষুদিরামের কারখানা যদি কোথাও থাকে, তার সন্ধান নেওয়ার অধিকার আমার নেই ভাই।
>
> রঞ্জুর চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট হয়ে আসে–কথাটা বোঝেওনি, গ্রহণও করতে পারেনি। মৃদু হেসে অবিনাশবাবু বললেন, চলো, এবার বাড়িতে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে আসি।
>
> শিলালিপিতে আঁচড় পড়ল সেই প্রথম। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ২৯৯]

এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষপ্রান্তে এসে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকাতর মন উপলব্ধি করে, জীবনের অনেক শিক্ষা তাঁর তখনও হয়নি। যার জীবনের শিলাতে কোথাও কোনো লিপি অঙ্কিত হয়নি, ঠিক সেখান থেকে স্মৃতিচারণা শুরু করেছে। সেই স্মৃতিচারণা কাব্যময় এবং অনুভূতিপ্রবণ। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর বয়ান *শিলালিপি* উপন্যাসটিতে অনিবার্যতার টানে সম্মুখ প্রসারী গতি লাভ করেছে।

> কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে রঞ্জু–দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, জানা থেকে কতদূরে কোন অজানা অচেনার আশ্চর্য জগতে। গল্প শুনেছে, ভেলায় চড়ে লোকে সাত সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে যায়, আচ্ছা, ঠাকুরমার খাটটায় চড়ে ও কি তেম্‌নি অনেক নদী, অনেক সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারে না কোনো শঙ্খমালার দেশে? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ৩১০]

একটি বালকের বিস্ময়বোধ ধীরে ধীরে এই জীবন, এই বিশ্বপ্রকৃতি, দেশ, সমাজ, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে জানা এবং সর্বোপরি সেই বালক রঞ্জুর সঙ্গে কোথাও ঔপন্যাসিকের একাত্ম হয়ে যাওয়া উপন্যাসটির মধ্যে একটি বাড়তি আকর্ষণ বয়ে এনেছে।

গ্রাম বাংলার, বিশেষ করে উত্তর বাংলার গ্রাম্য জীবন, শিক্ষা, পথঘাট, মাঠ, নদী-নালা, ভূ-প্রকৃতি সব কিছুই রঞ্জুর অভিজ্ঞতার আলোকে *শিলালিপি*তে চিত্রিত হয়েছে। রঞ্জুর অনুভূতিপ্রবণ মন অনেক সময় *পথের পাঁচা*লীর অপুর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*র মতো করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *শিলালিপি*'তে পরিচিত রঙ ফলিয়েছেন। আবার কখনো কখনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে শ্রীকান্তের সঙ্গে রঞ্জুর সাদৃশ্যে কথাও মনে আসে। রঞ্জুর স্কুল পালানো, হাতের কাছে জগৎ ও বিশ্বপ্রকৃতি ঘিরে বিস্ময়, স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা এ সব বাংলা উপন্যাসের একজাতীয় রচনার মতো। শিলালিপি উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রঞ্জু ছেলেবেলাকে তেমনি একটা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন–

> রঞ্জু যেন কিশোর অপু ও কিশোর শ্রীকান্তের গোত্রভূক্ত, তবু রঞ্জু শেষ পর্যন্ত তাদের থেকে ভিন্ন-সেই ভিন্নতা ধরা পড়েছে মুলত তার রাজনৈতিক চেতনায়।[২৪]

'প্রথম অধ্যায়'এ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রঞ্জুর রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট রঞ্জু যখন পাড়ার অবিনাশবাবুর কাছে স্বদেশী শব্দটা শোনে তখনই তার মনের অভিব্যক্তি লেখক বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে–

> মনে আছে, সারাটা রাত একটা অশ্রান্ত আশ্চর্য উত্তেজনায় ঘুম আসেনি তার। সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল স্বদেশী 'নিখিলিস্ট'দের কথা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল কাঁচের জানালার ওপারে থরে থরে অন্ধকার; আর বাইরে আত্রাইয়ের বাতাসে দোলালাগা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ানৃত্য। মাটির তলায় বোমা আর কামানের কারখানা। যেখানে মখমলের মতো সবুজ আর নরম ঘাস গুচ্ছে গুচ্ছে মাথা তুলেছে, যেখানে ছায়ায় ঘেরা বকুল বনের ভেতরে টুপটাপ করে শিশির পড়বার মতো শব্দ করে ফুল ঝরে পড়েছে–সেইখানে, সেই নিশ্চিন্ত মাটির তলায় কামান আর বোমা তৈরি হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড,প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ৩০৫]

প্রথম থেকেই স্বদেশী, মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম বসু, নিহিলিস্ট ইত্যাদি নাম ও প্রসঙ্গ রঞ্জুর চোখের সামনে অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে গান্ধীবাদী নেতা অবিনাশবাবুর দ্বারা রঞ্জুর জীবনরূপ শিলাতে প্রথম রাজনৈতিক চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অনেকটা অস্পষ্টভাবে। রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ছাড়া জীবনের আর একটি দিক কিশোর রঞ্জুর মনে উঁকি দিয়েছিলো, তা হলো নারী। চেতনার সেই প্রথম উন্মেষ পর্বে আগামী আকাশের প্রথম অরুণোদয়ের মতো পৃথিবীর দাবির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় সত্যাগ্রাহী, মানবদরদী অবিনাশবাবু এবং খেলাচ্ছলে গার্ন্ধব–মতে বিবাহ করা বালিকা ঊষী। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত*'র জীবনেও ছিল রাজলক্ষ্মী। ছাত্নাতলায় অশ্বিনী বাবুর সেই পাগলামো কাণ্ডের কথা মনে পড়লে এখনও রঞ্জুর হাসি পায়। ঔপন্যাসিক দৃশ্যটি বর্ননা করেছেন এভাবে–

> দু-তিনজন ছেলে মিলে রঞ্জুকে চ্যাংদোলা করে নিয়েছে, আর অশ্বিনী ঊষিকে তুলেছে কাঁধের উপরে। সগৌরবে শোভাযাত্রা চলেছে। একজন মুখে মুখে ঢোলের বোল্ বাজাচ্ছে : টাক ডুম্ টাক ডুম্ টাক ডুম্ ডুমাডুম্ । আর একজন একটা আমের আঁটির ভেঁপুতে প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ করে সানাইয়ের আওয়াজ তুলছে। ঝড়লণ্ঠন নেই, তার অভাব পূরণ করতে একজন আগে আগে নিয়ে চলেছে একটা পাকুড় গাছের ঝাঁকড়া ডাল। দৃশ্যটি একাধারে মনোরম এবং রোমাঞ্চকর। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : চার, পৃ ৩২৪]

ঊষী ছাড়াও রঞ্জুর পথ চলাতে আরো কয়েকটি নারী বিশেষ প্রভাব ফেলে– তারা হলো সংঘমিতা (মিতা), সীতা এবং করূণাদি ও সুতপাদি।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে ১৯৩০ সাল ও গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর। সমস্ত দেশের সব মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিলেন গান্ধীজী। সেদিন তাঁর নেতৃত্বে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়। স্বাধীনতা আনতে হবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়– সেই মতের সঙ্গেও সবার সহমত ছিল। বিদেশী সামগ্রী বয়কট, আত্মঘাতী মাদক দ্রব্য বর্জন, অন্যায় লবণ করকে অস্বীকার এবং স্বহস্তে লবণ তৈরি ইত্যাদির সঙ্কল্পে পরাধীন দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। দাবানল জ্বলল, পাঞ্জাব, সিন্ধু থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরত ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। সারা হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুড়তে লাগল বিলিতি কাপড়ের স্তূপ। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকাড়ে জড়ো করে আগুন ধরানো হচ্ছে, দিশি- বিলিতি মদের বোতল

চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়। সে এক অপূর্ব উন্মাদনার দিন। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল-মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগ-সঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে শুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত কিছু আর অবশিষ্ট নেই–কেউ বাদ নেই আর। বন্দে মাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে? [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : সাত, পৃ ৩৫৭]

কিন্তু সব উত্তেজনা, উন্মাদনা, আবেগ, গান্ধী নামের মোহ সব যেন থেমে গেল- ১৯৩০' এর সত্যাগ্রহ রঞ্জুর চোখে এক ব্যর্থ আন্দোলন মাত্র। স্বদেশী আন্দোলন মরে গেছে আজ, আবার ফিরে এসেছে সেই পুরোনো স্বাভাবিক দিনযাত্রা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আন্দোলন ব্যর্থতার সেই পরিবর্তিত অবস্থা বর্ণনা করছেন এভাবে–

> মাহাত্মা গান্ধীর আদর্শ মেনে তারাও চলেছে দেশকে স্বাধীন করতে, শৃঙ্খলমুক্ত করতে ভারতবর্ষকে। কিন্তু কত জোলো তাদের কাজ, কেমন ফিকে–শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া কিছু যেন করবার নেই তাদের। আর ওদিকে চট্টগ্রামে ঈশানের রক্তমেঘ, আগামী দিগন্তের অগ্নিরাগ। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : সাত, পৃ ৩৭০]

ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের শুরু থেকেই রঞ্জুর মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছেন। বাল্যকালে রঞ্জু অবিনাশবাবুর কাছে শোনা গান্ধীর গল্প- আরো পরিণত হলো তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ বাস্তব রাজনীতির মধ্যে থেকে সে রাজনীতি শিখেছে। প্রথম পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে, পরে বাবার কাছে। এবং আরও পড়ে বন্ধুদের মাধ্যমে। লেখক ১৯৩০– এর আন্দোলনের ব্যর্থতাকে সুস্পষ্টরূপেই মেনে নিয়েছেন। সে-পথ স্বাধীনতার পথ নয়, মানুষের মুক্তির পথ নয়-এ বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে। নায়ক রঞ্জুর উপলব্ধি শিল্পীর অনুভূতিতে আবেগে বেশ স্পষ্ট করে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ধরা পড়েছে। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> মিটে গেছে অহিংস লবণ আন্দোলন। উনিশশো ত্রিশ সালের ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডী অভিযানকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, একত্রিশ সালের ৪ঠা মে তার অকালমৃত্যু ঘোষিত হয়ে গেল। স্বাক্ষরিত হলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

> প্রতিবাদ আসে মনে-কিন্তু জোর করে বলতে পারে না কেউ। মহাত্মা গান্ধী-নামটাই যাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধই হয়ে থাকে মানুষ-ঝিমোতে থাকে নেশাখোর টিয়াপাখির মতো। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় পরিচ্ছেদ : আট, পৃ ৩৭৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রঞ্জুর চরিত্র বয়ান করেছেন আত্মজৈবনিক উপন্যাসের মতো, যেন স্মৃতি কথা বলছে। তাই মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ঘটনাবলির পাশাপাশি রঞ্জুর ব্যক্তিগত অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। মাঝে মাঝে যেন ঔপন্যাসিক নিজেই নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন–

> সত্যিই স্মৃতির পাতার হিসেবটা এলোমেলো। কত বড় বড় ঘটনা, কত বিস্ময়কর ব্যাপার সে অবলীলাক্রমে জলের লেখার মতো মুছে ফেলে–সাধারণ চোখে যাকে পৃথিবীর একটা অসাধারণ অঘটন বলে মনে হয়, তার কাছে তার একটুকু দাম থাকে না হয়তো। একটা অতি তুচ্ছ মুহূর্ত, রাশীকৃত ঘটনার আকার–অবয়নহীন কালো পটভূমির ওপরে শীতল কঠিন একটা নক্ষত্রের দীপ্তি পায়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : পাঁচ, পৃ ৩২৭]

রঞ্জুর ছেলেবেলার অনেক ঘটনা, কাহিনীর মধ্যে তার স্কুলের বন্ধু নিশিকান্ত খুবই আকর্ষণীয়। রঞ্জুর ক্লাসের বন্ধু নিশিকান্ত। যে কখনও পড়া জিজ্ঞেস করলে পারে না, আর পণ্ডিত মশাই তাকে তেল চিটচিটে বেত দিয়ে মারতে মারতে নিজে ক্লান্ত হয়ে গেলেও নিশিকান্তের কোনো ভাবান্তর হয় না। প্রতিদিন প্রতিটি ক্লাসে বেতের আঘাত খায় নিশিকান্ত একদিন প্রতিবাদ করে। সারা স্কুলের দেয়ালে সে পণ্ডিত মশাইয়ের নামে নানা রকম কটুক্তি লিখে রাখে। পরদিন স্বয়ং হেডমাস্টার এর বিচার করতে বসেন। জোড়া বেত দিয়ে আপাদমস্তক জর্জরিত করে ইস্কুলের মাঠে গাধার টুপি মাথায় পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় নিশিকান্তকে। আর ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত প্রত্যেকে তার কান মলে দিতে বলা হয়। ঔপন্যাসিক সেই দৃশ্যেও বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> রঞ্জু নিশিকান্তকে কানমলা দিতে গেলে তার চোখের যে বর্ননা দেয়া হয়েছে, এটা সত্যিই অভিনব–
> আশ্চর্য সেই চোখ। মানুষের চোখ এমন করে যে ভাষা ফুটতে পারে, এমন করে জেগে উঠতে পারে অপমানিত মনুষ্যত্বেও মর্মান্তিক লাঞ্ছনাবোধ–এ সত্য বোধ হয় অর্থহীন একটা অস্বস্তির মতো রঞ্জুর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই প্রথম। নিশিকান্তের চোখ দুটো শুকনো, তাতে এক বিন্দু অশ্রুর আভাস পর্যন্ত নেই।
> একটা মশালের মতো জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে অতি তীব্র অতি প্রখর অগ্নিশিখার মতো। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় পরিচ্ছেদ : পাঁচ, পৃ ৩৩২]

রঞ্জু পরে বুঝতে পেরেছিল কেন নিশিকান্তের চোখ এমন হয়েছিল। তার বর্ণনায় পাওয়া যায়–

> নিশিকান্তদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখায়, চারদিকের কোটি কোটি মানুষ আজ আর মানুষ নেই–তারা অগ্নিপুত্তলি। সেই অগ্নিপুত্তলিকার দল অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে–একদিন সমস্ত পৃথিবীতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সমস্থ–কেউ বাঁচবে না, কিছুই না– [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : পাঁচ, পৃ ৩৩৩]

রঞ্জুর ব্যক্তিজীবনের আর একটি পরিবর্তন আসে বাবার চাকুরি গেলে। ঠিক কী কারণে আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করবার পরে দারোগা বাবার চাকুরি গেল সেটা রঞ্জুর ভালো মনে নেই। তবে তিনি বড় অপমানিত হয়েছিলেন। বাড়ির যত বিলিতী কাগড়, পুলিশী ইউনিফর্মের অবশেষ, এক গাদা টুপি, দু'তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট সব স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন জীবনের লিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ল। সন্ধ্যার পর বাবা তাদের তিনভাইকে ডেকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন–

> প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকুরি করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাদের কাছে ন্যায় নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : ছয়, পৃ ৩৩৯]

রঞ্জুর জীবনের নানা ঘটনা, স্বদেশী আন্দোলন, তিরিশের আন্দোলনের ব্যর্থতা– সব মিলিয়ে রঞ্জুর শিলালিপির আঁচর দীর্ঘায়িত হয়। রঞ্জু রাজনীতিকে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ করতে শেখে। আমৃত্যু জনশক্তির উপর বিশ্বাস-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনা তাঁকে ঠিক আস্থা দিতে পারেনি। অবশ্য জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি তাঁর আগের রাজনৈতিক মত বা আদর্শকে আর স্বীকার করেননি। তবু জনশক্তির প্রতি তাঁর আস্থা সব সময়ই অক্ষুণ্ন ছিল।

শিলালিপি [দ্বিতীয় অধ্যায়]

শিলালিপি উপন্যাসের 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এর অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কথা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন রূপে পরিলক্ষিত হয়। 'প্রথম অধ্যায়'-এ রঞ্জু ছিল দর্শকের ভূমিকায় আর অনেক বেশি আবেগী, দুঃখ বিলাসী। কিন্তু এই পর্বে রঞ্জু যেন আর দর্শক নয়, সে এখন ঘটনার অংশীদার। আবার কোথাও কোথাও ঘটনার নিয়ন্ত্রকও বটে।

রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড-এর ভূমিকায় *শিলালিপি* প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন–

> 'শিলালিপি'র প্রসঙ্গ তৃতীয় খণ্ডে আছে–তবে সেটা আংশিক। তাই চতুর্থ খণ্ডেও যখন এর অধাংশ গেল তখন ভূমিকায় সংক্ষেপে এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি।
>
> 'শিলালিপি'র কাহিনী রঞ্জুর কাহিনী–রঞ্জনের কাহিনী। প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে–আকাশে শাদা মেঘের পাল, নিচে মহাজনী নৌকো।.....পদ্মা গভীর, গম্ভীর। খড়্গধার জলতরঙ্গ..
>
> তার পর তার জীবনে এসেছে নারী। মেয়েদের সম্পর্কে এমনিতেই তার সংকোচ বেশি, আর মিতার স্পর্শে সে সংকোচ আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছে আজকাল। কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারে না মেয়েদের দিকে, ভয় করে। জাতটাকে সে বুঝতে পারে না, এদের সম্পর্কে রয়েছে তার একটা জিজ্ঞাসা।
>
> সুতপা, করুণাদিকে সে চেনে, সংঘমিত্রা তার মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া জাগায়। সীতা –? হ্যাঁ, তারও ছাপ রয়েছে তার জীবনে।
>
> কিন্তু তারপর?
>
> এরপর তো একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। এতক্ষণে রঙীন বুদ্বুদটা এইবারে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিগন্ত খরপ্রবাহে। এরপর সে সকলের।[২৫]

ঔপন্যাসিক শিলালিপি উপন্যাসকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন, যা পরবর্তীকালে রচনাবলীর ভিন্ন দুই খণ্ডে স্থান পায়। উপনিবেশ উপন্যাসে যেমন তিনটি খণ্ডই ভিন্ন, এবং প্রতিটি খণ্ড আবার ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। *শিলালিপি*র কাঠামোটা তেমন নয়। এটি দুটি ভিন্ন অধ্যায় হলেও পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় আট পরিচ্ছেদে শেষ নয়, আর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় নয় থেকে। সুতরাং স্বতন্ত্র খণ্ড নয় উপন্যাসটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা তিরিশের ব্যর্থ আন্দোলন– যা রঞ্জুর মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক এই ব্যর্থতাই নতুন রাজনৈতিক পার্টির জন্ম দেয়। গোপন বিপ্লবী আন্দোলন আরো বিকশিত হতে থাকে। আগের 'অনুশীলন সমিতি' থাকবার পরেও 'যুগান্তর পার্টি/দল' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অনেকে যুগান্তর পার্টি গড়ে উঠবার পেছনে তিরিশের আন্দোলনের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন।'[২৫] সে-সময়ের অনুশীলন সমিতি ও তার বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজেদের মধ্যে কলহ, যুগান্তর পার্টির কথা উপন্যাসটিতে আছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সশস্ত্র আন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের নাম অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, মাস্টার দা, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘাযতীন, টেগরা, বীরেন গুপ্ত, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য। এই সব ব্যক্তি ও তাঁদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা না দেখালেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই পথকে বৃহত্তর মুক্তির পথ বলে মনে করতে পারেননি। উপন্যাসের একটি চরিত্র করুণাদি যখন রঞ্জনকে বলে-

> সব পথ সকলের জন্য নয়। পারো তো বেরিয়ে চলে এসো এই আগুনের ভেতর থেকে, বাঁচতে চেষ্টা করো গুণীর মতো, শিল্পীর মতো। মরতে পারা সব চেয়ে সহজ কিন্তু মহৎ হয়ে বাঁচতে জানা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : ষোল, পৃ ১২৭]

রঞ্জুকে এই কথা বলার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যে অবস্থানটিকে সমর্থন করছেন, করুণাদি'র এই মতের পক্ষে। সে কথা পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই নতুন রঞ্জুকে পাওয়া যায়। যে বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী, বিষয়টাকে বুঝতে চায়। বন্ধু পরিমলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রঞ্জু তাদের বইপত্র পড়তে শুরু করে। রঞ্জুর পরিবর্তিত অবস্থা উপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> রক্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সেও যদি এই মুহূর্তে একটা রিভালবার হাতে পায় তাহলে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বীরেন গুপ্তের, গোপীনাথ সাহা কিম্বা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো সেও বেরিয়ে পড়তে পারে হত্যার অভিযানে। একটা রিভলবারে কটা গুলি থাকে– পাঁচটা, ছয়টা? যদি ছটা গুলি থাকে তা হলে তার পাঁচটা দিয়ে সে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করবে, আর বাকিটা–বাকি বুলেটটা সে খরচ করবে নিজের বুকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে বীর প্রফুল্ল চাকীর মতো। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ৬]

রঞ্জন নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে থাকে। বিপ্লবী বইপত্র পড়ে নিজেকে তেমনভাবে প্রকাশের স্বপ্নে বিভোর হয়–

> দেশের জন্য মরা। সে কি আশ্চর্য গৌরব–সে কি অপূর্ব সার্থকতা। ফাঁসির দড়ি হোক গলার মণিহার, পিস্তলের গুলি হোক দেশমায়ের আশীবাদ। নতুন দিনের স্বাধীন ভাবতবর্ষের যে ইতিহাস লেখা হবে অক্ষয় অক্ষরে, সে ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করতে থাকবে আরো অগণিত শহীদের সঙ্গে তারও নাম। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ৬]

জীবনের পথ চলায়, ক্রম-পরিবর্তনের পথ ধরে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অনুভব করে গান্ধীর পথে নয়, রক্তাক্ত সশস্ত্র আন্দোলনের পথেও নয়, গণ-সংগ্রামের পথই মুক্তির পথ। অপমানিত, শোষিত মানুষের মধ্যেই ঔপন্যাসিক খুঁজে পেয়েছেন যথার্থ শক্তি। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে সেই সত্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অপমানিত ফৈয়জ মোল্লা, নিশিকান্ত, নিকারীরা এবং নমঃশুদ্রের দল আজ একত্রিত–তাদের মনেও আজ

নানান জিজ্ঞাসা। সমষ্টির দাবিকে আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদী শক্তিকে দেখানো হয়েছে এক অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণায়।

বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্ম হলেও রঞ্জু উপলব্ধি করে তাদের সঙ্গে জনতা নেই। বিপ্লবীরা যখন শুধু ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর শপথ নেয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন দেখা দেয় ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু তখন তো জমিদার তাদের পাইক পেয়াদা আমাদের শোষন করবে। ঔপন্যাসিক এখানে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ নিয়ে সময়ের একটি প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপন্যাসে দীর্ঘ জায়গা নিলেও শেষ অংশে এসে ঔপন্যাসিক আর সেই স্বাধীনতার কথা বলেন নি। সেই প্রশ্নটির মীমাংসা না করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের শোষকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়াকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

বিপ্লবী রঞ্জুকে ঔপন্যাসিক আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন। রঞ্জুর মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে–

> মরে যাওয়া নদীর মতো মন্থর–গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা–বৃহত্তর ভারত–কারুর রূপই মনের সামনে দেখা দেয় না বিশ্বরূপ হয়ে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নেই, আছে খানিকটা গভীর বেদনা আর নিবিড় সহানুভুতি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : উনিশ, পৃ ১৬৩]

ঔপন্যাসিক এবার সব ছাড়িয়ে রঞ্জুকে আর ব্যক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন নি–তাকে সমগ্রের মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার সামনে এখন তমসাবৃত বিস্তীর্ণ বিপুল ভারতবর্ষ এবং সেখানেই তার নতুন কর্মক্ষেত্র। সেখান থেকে আসছে গণ-সমুদ্রের ডাক। এই গণশক্তির আহ্বানে তার বিপ্লবী সাথী মিতা। মিতার হাতে অনিবার্ণ বিপ্লবের রঙ মশাল।

মিতাকে শিল্পী অনেকটা প্রতীকী তাৎপর্য দিয়েছেন। আবার রঞ্জন যখন ব্যক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে সমষ্টির হয়ে ওঠে তখনই সে পায় প্রতীকী মর্যাদা। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> এরপর তো একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। একক্ষণে রঙীন বুদ্বুদটা এইবাওে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিগন্ত খরপ্রবাহে। এরপর সে সকলের। তার ইতিহাস সাড়া দেবে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে, তার পরিচয় সর্বজনীন প্রাণ বিক্ষোভে, তার পথের আহ্বান পাঠাচ্ছে ওই রক্তপিঙ্গল শিখালোলুপ আগ্নেয়-দিগন্ত। সীতা আজ মৃত অতীত হয়ে পড়ে রইল কবি রঞ্জুর গীতি-কবিতার খাতায়। আর ওই আগুনের পর্বে

> মিতা তাকে ডাক দিয়েছে, তার হাতে অনির্বাণ বিপ্লবের রক্তমশাল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : উনিশ, পৃ ১৭১]

এভাবেই যুগের সত্যের কাছে ঔপন্যাসিক রঞ্জনকে বিসর্জন দিয়েছেন। সামষ্টিকবোধের রঞ্জু একক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, যদিও স্বপ্ন দেখছে অন্যরা আসছে, প্রস্তুত হচ্ছে রক্তের ফুলকির আগুন। কিন্তু রঞ্জুর জীবনে বিপ্লব শুধুমাত্র শিলালিপির দাগ/ আচড়ই থেকে গেল, পুরোটা পরিবর্তন করতে পারলো না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহানন্দা উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক রচনা করেছেন মহানন্দা নামের নদীতে কেন্দ্র করে। নদীকে কেন্দ্র করে এর অববাহিকায় গড়ে ওঠা মানুষের জীবনযাপন এখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ঔপন্যাসিক বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষয়িষ্ণু সময়ের চিত্রকে অঙ্কন করেছেন।

মহানন্দা

প্রকৃতির সৃষ্টি হিসেবে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষত নদীর সঙ্গে অভেদ কল্পনার রূপকার্থ অতি প্রাচীন। 'প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট– যাই হোক না কেন অনেক নদীই হয়ে গেছে ধর্মসংস্কার ও দর্শন ভাবনার অন্তর্ভুক্ত, এমনকি মৃত্যুধারণারও অবিচ্ছেদ্য পটভূমি। আবার কখনও বা জনপদের আর্থ-সাংস্কৃতিক পুরাণ প্রত্যয়ে কালাতীত, কখনো বা নিজের ভূগোল ইতিহাস চিহ্ন নিয়ে সভ্যতার পরম্পরায় নিত্য বহমান।'[২৬] উপন্যাস আধুনিক পুঁজিবাদী শ্রেণির হাতে সৃষ্টি হলেও এর অবয়বে থাকে ব্যক্তি মানুষের অন্তঃবয়ান, যা কখনও অতি সুক্ষ্মভাবে আবার কখনও অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে বিরাজ করে অরণ্য, নদী, দ্বীপের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি*, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের *কালিন্দী*, হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী*, অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) ছাড়াও সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭), দেবেশ রায়ের *তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮) উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *মহানন্দা* (১৯৫৫) উপন্যাসটি মহানন্দা নদীকে কেন্দ্র করে পরিবৃত্ত।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক মহানন্দা নদীর মৃত্যুপ্রায় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন-

> 'আত্মহত্যা করছে মহানন্দা–পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে নিজেকেই রক্তাক্ত করে ফেলছে–নিশ্ছেদ নিয়মে বছরের পর বছর লিখে চলেছে অবক্ষয়ের ইতিহাস।
>
> আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে সেই সব মানুষের জীবন– মহানন্দাকে কেন্দ্র করে যারা ঘর বেঁধেছিল, যারা ভালবেসেছিল, ভালোয় মন্দে নানা সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে যারা আলোড়িত হয়েছিল। উৎসবে ব্যসনে যারা নিত্যসঙ্গী ছিল, শশ্মানের পথে আজ তারা সহযাত্রী। মাঝে মাঝে বনঝাউয়ের দীর্ঘ নিঃশ্বসিত আকুলতায় কিসের

> একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়–স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় না। মহানন্দা মরে যাচ্ছে–আর মরে যাচ্ছে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি। আত্মহত্যা আর অবক্ষয়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ:১, পৃ ১৬২]

মহানন্দার এই পরিস্থিতির সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক নীতীশকে তুলে ধরছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ীর পাশের মহানন্দা নদীর সঙ্গে তার মনের যোগ। বর্ষায় নদীতে বান ডাকলে তার মনেও বান ডাকে। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যখন পানির স্রোতধারা চারপাশকে প্লাবিত করে তখন নীতীশের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেতু তৈরি আবার সেই সেতুর উপর দিয়ে যখন রেল চলে তখন রেলের ঝঙ্কারে যেন মহানন্দার হৃদয় আকুলি বিকুলি করে। গ্রীষ্মের খরায় যখন নদীর দৈর্ঘ্য কমে যায় স্রোত স্তিমিত হয় তখনও নীতীশের নদীর জন্য হৃদয় শুষ্ক হয়ে ওঠে। এমনইভাবে বারো মাসেই নদীর চলাচলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতীশকে তুলে ধরেছেন। নদীর সঙ্গে এক মননে বাঁধা নীতীশের জীবন।

তার শৈশব, বেড়ে ওঠা, বিপ্লবী জীবন আবার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন-সবটার সাক্ষি যেন মহানন্দা। তাঁর সবটাই যেন নদীর সঙ্গে বাঁধা। প্রকৃতির অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠা নীতীশ বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পার্টির অর্থ সংগ্রহের জন্য নীতীশ ও তার দল ডাকাতি করতে গেলে ঘটনা চক্রে একজন খুন হয়। ডাকাতি আর খুনের অপরাধে পনের বছরের জেল হয়ে যায় তার। বিপ্লবী নীতীশের সেই অনভিপ্রেত কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে–

> শান্ত, ঘুমন্ত গ্রাম যোধপুর। সেই দুর্যোগের রাতে সেই ডাকাতির গল্প এখানে স্বপ্নের মতো অবাস্তব–অবসর মুহূর্তের নিছক কল্পবিলাসের মতো। বারো বছর আগে, সেই বিশেষ রাত্রিতে যোধপুর গ্রামের মানুষগুলো চিরাচরিত নিয়মে তলিয়ে ছিল নিশ্চিন্ত ঘুমের গভীরে, শীতের হাল্‌কা আমেজে একটা পাতলা চাদর কেউ কেউ জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে, কেউ বা বৃষ্টির ছাট রোখবার জন্যে হয়তো শক্ত করে এঁটে দিয়েছিল দরজা-জানলাগুলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘটে যাচ্ছিল কতকগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা, খুন-ডাকাতি–মানুষের রক্তে হাত রাঙা হয়েছিল নীতীশের। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ:২, পৃ ১৬৭]

অপরাধের সাজা হলে নীতীশ তা মাথা পেতে নেয়। পনেরো বছরের মধ্যে সব মিলিয়ে বারো বছর জেলে থাকতে হয়েছে। সেখানকার দশ বছর কেটেছে আন্দামানের জেলে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায় এমনভাবে–

> বঙ্গোপসাগরের সেই উতরোল কালীদহ, মর্মরিত নারিকেল গাছের আড়ালে সেই দ্বীপের কারাগার। অতিকায় তেতলা বাড়িটা, যার প্রতিটি অনুপরমাণুতে হাহাকার, অভিশাপ, চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস আর বজ্র-শপথ মিশে

> আছে শত সহস্র অপমানিত মনুষ্যত্বের। কতদিন সেখানে কেটে গেল–কতগুলো বৎসর। পাহাড়ী-কূলে প্রতিহত কালো ঢেউয়ের মতো কালো রঙের নির্ভুল, নিয়ন্ত্রিত সময়। সেই কালো ঢেউ আর কালো সময় পেরিয়ে আবার কোনোদিন সে ফিরে আসবে যোধপুরে, ফিরে আসবে তার নিত্য-পরিচিত মহানন্দার পটভূমিতে– জন্মান্তর না ঘটলে এমন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও মনে হয়নি সেদিন। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: ৩, পৃ ১৭৩]

দুবছর যখন নীতীশ বক্সার জেলে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বন্দি ছিল সে সময় পূর্বের রাজনীতির সারসংকলন করে সে। অন্যান্য বিপ্লবী মতের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। নানা মতের, নানা মানুষের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শ পাল্টে যায়। পুরানো চিন্তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে নতুন নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক মত গড়ে তোলে। বন্দিদের সঙ্গে স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে নীতীশের পরিচয় ঘটে লেনিনিজমের সঙ্গে–

> শচীন বললে, চোখ দুটো এবারে খোলো। এ যুগেও নিহিলিজ্‌ম চলবে না। ওই ফল্‌স হিরো ডি-ভ্যালেরা আর সিন্‌ফিন্‌ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ো না। দ্যাখো পৃথিবী কোনদিকে এগোচ্ছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: ৬, পৃ ২০৬]

এমনই তর্ক চলতে থাকে নীতীশ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে। রুশবিপ্লবের চেতনাকে তারা জালালাবাদের সঙ্গে একাত্ম কওে দেখতে চায়, ধারণ করতে চায় বাস্তবাদী দর্শনকে, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে। কিন্তু নীতীশের বারবার মনে হয়–

> অত প্রলিটারিয়েটপ্রীতি তার নেই ; যুক্তি তর্ক আর তথ্যের ভারে আকীর্ণ ওই নিরামিষ বিপ্লব তার পছন্দ হয় না। বোমার ফিউজের মতো তার রক্ত বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করে আছে– পলাশীর মাঠে যে ভাবে ইংরেজ প্রথম পা বাড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে দিতে হবে। সোশ্যালিজম? হাঁ –ও কথাটায় আপত্তি নেই, ওটা সেও চায়। কিন্তু ক্লাইভের উত্তরাধিকারীদের আগে বিদায় করো, ওসব ভালো ভালো কথা তারপরে বিচার করা যাবে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: ৬, পৃ ২০৫]

তারা নীতীশকে বোঝাতে চেয়েছিল–

> ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, বলেছিল বিপ্লবের এই ধর্ম– বুর্জোয়া বিক্ষোভের চরম পরিণতি প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশনে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: , পৃ ২০৫]

নীতীশ তাদের বইপত্র পড়েছিল, তর্কে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু মানতে পারেনি।

ঔপন্যাসিক এখানে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদী আন্দোলনের সম্পর্ক এবং পার্থক্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেটা পরবর্তীতে নীতীশের মনস্তত্ত্বে আরো প্রগাঢ়ভাবে পাওয়া যায়। নীতীশ জেল থেকে বেরিয়ে তার নিজের গ্রামে ফিরে আসলে, অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাটা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যেন নীতীশের চেতনাটাও গাঢ় হতে থাকে। নীতীশ জেলে গেলেও সেই সময়ের তার অন্য সহযোগীরা অনেকেই রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে ঔপন্যাসিক নীতীশের সহযোগীদের কথা বলেছেন–

> যেমন খগেন– এ পথ খগেনের ছিল না, এর সংস্কার স্বাভাবিক ছিল না, ওর রক্তের ভেতর সেই বিশেষ বয়সে কৈশোরের একটা উন্মাদনা, প্রতিদিনের পরিচয়ে আকীর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল পথটার সীমা ছাড়িয়ে একটা অনিশ্চিতের রহস্য রোমাঞ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার নেশা খগেনকে সেদিন ডাক দিয়েছিল। ছেলেবেলার অনেক মোহ, অনেক মানসিক বিলাসের মতো এটাও যথানিয়মে একদিন খগেনকে মুক্তি দিয়েছে–বিশেষ করে তিন বছরের জেল খেটে আসাটা ভালো করেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছে ওকে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ: ৭, পৃ ২০৭]

নীতীশের বিপ্লবী জীবনের অন্য সহযোদ্ধারা ঔপন্যাসিক তাদের সম্পর্কেও বলেছেন। এখানে একজন ব্যক্তির চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরো একটি দলের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে আনতে চেয়েছে। যেমন–

> যেমন: প্রকাশ দত্ত 'রাজবন্দী প্রকাশ দত্ত নয়, ব্যাঙ্কের কেরানি, নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা প্রকাশ দত্ত, যে আজ 'লাল-বিপ্লবীদের উৎপাতে প্রায় ঝালাপাল হয়ে উঠেছে– এটাই যেন স্বাভাবিক পরিণাম। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ১, পৃ ২৯২]

এখানে শুধুমাত্র নীতীশ নয়, বিপ্লবী পন্থার রাজনীতি নিয়ে সব বিপ্লবীদের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু *মহানন্দা* উপন্যাস নয় অন্যান্য উপন্যাসেও এদিকটি আলোকপাত করেছেন। বিপ্লবীরা নিজেদের আত্মসমালোচনা করেছে, *মহানন্দা* উপন্যাসে নীতীশ যেমন বুঝতে পেরেছে–

> জেলে বসে যা পড়াশুনা করেছে তাতে অবশ্য এটা বুঝেছে যে, আগেকার মতো চলে আর এখন লাভ নেই। তিনটে সাহেবকে সাবার করে আরো তেত্রিশটাকে ডেকে আনা হবে মাত্র। তাতে না মেলে দেশের লোকের সহানুভূতি না পাওয়া যায় সহায়তা। সুতরাং বেশ বড় করে আরম্ভ করা দরকার। সমস্থ মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দেয়া চাই, তিনটে রিভালভার আর দুটো পিস্তলের কাজ নয়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ৩, পৃ ৩০৭]

এক যুগ পর গ্রামে ফিরে এসে নীতীশ নিজের পরিবার, গ্রামের অবস্থা সব কিছু দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার কী করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পুরোনো বিপ্লবী বন্ধুরাও কেউ নেই। মহানন্দার পাড়ে জেলে পাড়ায় মারামারি হলে সেটা সমাধানের উদ্যোগ নেয় নীতীশ। কিন্তু জেলেরা তাকে গ্রহণ করে না। নিজের স্ত্রী মল্লিকা সেও বদলে গেছে। নীতীশের বাবা রাধা-কৃষ্ণের ভক্ত। মল্লিকা বাড়িতে বউ হয়ে আসবার পর থেকে শ্বশুরকে এই পূজা করতে দেখছে। কিন্তু তখন তার তেমন আগ্রহ ছিল না। পরে নীতীশ জেলে গেলে একা মল্লিকা প্রথমে শ্বশুরের পজার থালা সেজে দিতো। পরে ধীরে ধীরে সেু ভক্ত হয়ে যায়। এখন শ্বশুরের সঙ্গে মিলিয়ে মল্লিকা রাধা-কৃষ্ণের পূজায় সারাটা দিন নিজেকে ব্যস্ত রাখে। নীতীশের দিকে চেয়েও দেখে না। মানসিক এমন বিপর্যয়কর অবস্থায় দীশাহীন নীতীশ মহানন্দার তীরেই একমাত্র শান্তি খুঁজে পায়।

ঔপন্যাসিক নীতীশের এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও নতুন আলোর সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। জেলে পাড়ায় কাজ করতে গেলে নীতীশ প্রথমে এটা উপলব্দি করে। পরে পাড়ার কয়েকজন ছেলে তাঁকে তাদের একটি মিটিং-এ বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানায়। নীতীশ প্রথমে পুলিশের কথা ভেবে তা প্রত্যাখান করে। কারণ পুলিশ এখনো তাকে নজরে রেখেছে, সে কি করছে, কোথায় যাচ্ছে সবই তারা নজরদারি করছে। কিন্তু পরে নীতীশ মনে সাহস সঞ্চার করে যায়-এই প্রজন্মের তরুণদের সভায়। সেখান গিয়ে নীতীশের মনে হয়েছে–

> এরা আলাদা, এরা নতুন শক্তি! নীতীশের চমক লাগল। এ শক্তিতে তো এর আগে তার চোখে পড়েনি। শোনা কথা ওপর থেকে আউড়ে যাচ্ছে না, একটা অগ্নিগর্ভ স্টিম এঞ্জিনের মতো ভেতরের উত্তাপ কেঁপে উঠেছে থর থর করে। আরো চারশো নির্বাক নিঃশব্দ মানুষের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ। দাঁড়িয়ে রইল সেই আবর্জনাভরা পোড়ো মাঠটার মধ্যে–প্রখর রৌদ্রের ধারালো আঘাতের নীচে। ভদ্রলোক বলে তাদের কেউ আলাদা করে অভ্যর্থনা করল না, সমাদরে চেয়ার পেতে দিল না বসবার জন্যে। সংগ্রামী মানুষর কাছে ভদ্রতার মূল্য ধরে দেবার বিলাসিতা আর নেই–নিজেদের প্রশ্ন আজ তাদেও কাছে সব চেয়ে বড়। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ৬, পৃ ৩২৮]

স্থানীয় গ্রামের স্কুলের ছাত্র ফেডারেশেনের সেক্রেটারি অলকার মধ্য দিয়ে তার বিপ্লবী রাজনীতির সমালোচনা শোনে। সেই বক্তব্যের মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সচেতন রাজনৈতিক দর্শনের ছাপ লক্ষ্য করি–

> ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে যোধপুর স্বাধীন হতে পারবে না। চল্লিশ কোটি মানুষের হিসাব না রেখে তিন হাজার মানুষের ভেতরে বিপ্লব অসম্ভব। যে কাজের ভেতর দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন আপনারা তার পরিণতিও তো

> চোখেই দেখছেন। বিপ্লবের পেছনে অনেকখানে সংগঠন চাই, অনেক বড়ো আয়োজন চাই। সব সমস্যার মূল সেইখানেই আছে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ৮, পৃ ৩৩৬]

শিলালিপি উপন্যাসের মতো *মহানন্দা* উপন্যাসেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও বিপ্লবী রাজনীতির পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। *মহানন্দা* উপন্যাস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে একই সঙ্গে তিনি তিনটি রাজনৈতিক পর্বের কথা তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবী রাজনীতির ধারার বাইরেও এখানে কংগ্রেসের দুটি ধারার পার্থক্যও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কংগ্রেসের নরম পন্থী ও চরম পন্থী ধারা যেটা ১৯৪৬ এর আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে- ঔপন্যাসিক সেটা সচেতনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন নায়ক নীতীশের রাজনৈতিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে।

পরে নীতীশ গ্রামের আবহ, মহানন্দা, তাঁর বাড়ী সব ছেড়ে কলকাতায় চলে যায়। কারণ সে চায় কিছু করতে। এভাবে একক ব্যক্তি হয়ে নীতীশ বেঁচে থাকতে পারবে না। জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার নতুন জীবন পেয়েছে। এই নতুন জীবনকে সে হেলায় হারাতে চায় না। তাই শ্যামনগর বোমা কেসের হিমাংশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে নীতীশকে যখন তাদের দলে যোগ দিতে আহবান জানান জানায়, তখন প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও সে সামিল হয় শ্রমিক আন্দোলনে। শহরে শ্রমিকেদের মিছিল শুরু হলে সেখানে লাঠি চালায় পুলিশ, ফলে নীতীশ আহত হয়। নীতীশের মুখে শোনা যায়–

> তোমাদের দলে চলে এলাম। কতদূর চলতে পারবো জানি না, হয়তো পার্থক্যও থেকে যাবে দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু সেটা বড়ো নয়। লড়াই যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভবিষ্যৎ ভারতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা না করে পথে নেমে লড়াই সবচেয়ে বেশি দরকারি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ১০, পৃ ৩৪৫]

কিন্তু এই নেমে আসার প্রশ্ন ওঠে কেন? কারণ নীতীশ জানে পার্থক্য থেকে গেছে দৃষ্টিভঙ্গির, দর্শনের। আর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকার পরেও কম্যুনিস্ট পার্টিতে নীতীশ নিজেকে সমর্পণ করেছে। তার নিজের ভেতরের দ্বন্দ্ব, মানসিক প্রশান্তি এখানে কাজ করেছে, কারণ এখানে সে অলকাকে পেয়েছে। অলকাও তাকে গ্রহণ করেছে–

> অলকার প্রবল আগ্রহ জাগছে নীতীশের মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিতে– কপালের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে পরম যত্ন আর একাগ্রতায় তার সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ১০, পৃ ৩৪৫]

পরিচিত মল্লিকার সঙ্গে নীতীশ নিজেকে মেলাতে পারেনি। মেলাতে পারেনি বিপ্লবী মতের বিকশিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে কারণ এক সময় সেটা তার অসম্পূর্ণ এবং আংশিক বলে মনে হয়েছে। যেখানে প্রথম প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তি গোষ্টির নয়। সেটা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যই প্রয়োজন। সকল শ্রেণি-পেশা অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় জনগণের জন্য। তাই তাদের সবাইকে সংগঠিত করতে হবে। এই বৃহত্তর প্রয়োজনের কাছে তার বিপ্লবী মতাদর্শ ক্ষুদ্র হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ পর্যায়ে লিখিত *নির্জন শিখর* উপন্যাসটি মূলত অবসর প্রাপ্ত এক অধ্যপকের ট্রাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে লিখিত। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দর্শনের অধ্যপক দেবনাথ হিসেব-নিকেশ মেলানোর চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ঔপন্যাসিক এখানে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি গোপান বিপ্লবী আন্দোলনে ক্ষয়িষ্ণু চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

নির্জন শিখর

অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের এক অধ্যাপকের ট্রাজিক জীবনকে উপজীব্য করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *নির্জন শিখর* উপন্যাসটি রচনা করেছেন। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলীর* দশম খণ্ড-এর ভূমিকায় আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন-

> *নির্জন শিখর* উপন্যাসটি যেন এক অধ্যাপকের জীবনকথা। অধ্যাপকের কর্মজীবন শেষ হয়েছে। কাল থেকে আর ক্লাস থাকবে না। ছেলেমেয়েদের ভিড় থাকবে না। রুটিন নিয়ে গণ্ডগোল থাকবে না–দেবনাথ ভট্টাচার্যের ছুটি–। একেবারে বিশ্রাম। দেবনাথ ভট্টাচার্য-এর হিসেবের খাতা শেষ হয়ে গেল। বেলা বাড়ছে দিনগুলো ঝরে পড়ছে নিমের পাতার সঙ্গে। মাধুরী চলে গেছে আজ চার বছর। একমাত্র ছেলে বারীন সাউথ ইন্ডিয়ায়। পুত্রবধূ শিপ্রা চিঠি দেয় : বাবা রিটায়ার করে আর ওখানে পড়ে থাকা কেন? বিদ্যুৎও চিঠি দেয়। ও একটা বাড়ী করেছে গঙ্গার ধারে। সে-ও ডাকে।
>
> দেবনাথের একবার মনে হয়, বারীনের কাছে যাবেন? না, নিজের কালো দর্পণটার দিকে আর তাঁর তাকাবার সাহস নেই। তার ভেতরে যে এতবড় আত্মপরাজয়ের ছবিটা তাঁকে আড়াল করে লুকিয়ে রেখেছে তাকে তিনি সইতে পারবেন না। এই এখানেই যথেষ্ট।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এমন কিছু উপন্যাস লিখেছিলেন যেখানে গল্পের নায়কেরা ভাবালুতা, আবেগ বর্জন করে যুগের জটিলতার মধ্যে পড়ে স্বীকারোক্তি ও আত্মকথন করেছেন।

> আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তারা আধুনিক কালের ভণ্ডামি নীচুতা ও চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শভঙ্গের নির্মম ব্যাখ্যা দিয়েছে। এই নৈরাশ্য ও যুগ সমালোচনাও এই পর্বের সাহিত্যের লক্ষণ। প্রায়শই চরিত্রের অন্তঙ্গরূপের উদঘাটনে ভাষা পেয়েছে এই নৈরাশ্য।[২৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের শেষ দিকের উপন্যাসগুলোতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মূল উপজীব্য হিসেবে লক্ষ করা যায়। শেষ দিকের উপন্যাসগুলোতে বিশাল কোনো প্রেক্ষাপট কিংবা উপনিবেশের মতো কোনো বৃহত্তর অঞ্চলকে ঘিরে সামগ্রিক জীবন রূপায়ণের চিত্র উঠে আসেনি। এসব উপন্যাসের চরিত্রের সংখ্যাও কম কিন্তু চরিত্রগুলো নিজের অন্তর্গত বেদনায় দ্বন্দ্বমুখর। আত্মপ্রত্যয় কিংবা মনস্তত্ত্বনির্ভর। ব্যক্তির আত্মমুখীনতা নিয়ে লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস *সন্ধ্যার সুর*। এটা প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় *নির্জন শিখর*। ১৯৬৯ এর ডিসেম্বরে *তৃতীয় নয়ন*, ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে *কাচের দরজা*। এছাড়া আরো কিছু উপন্যাস আছে – *পাতাল কন্যা* (১৩৭৩), *পদ্ম পাতার দিন* (১৩৭৩), *নতুন তোরণ* (১৩৭৫), *আলোকপর্ণা* (১৩৭৭) ইত্যাদি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশাল উপন্যাস সম্ভারের মধ্যে নানান বিষয়কে উপজীব্য করেছেন। শুধুমাত্র বিষয় বৈচিত্র্যেই নয়, উপন্যাসগুলো নানা আঙ্গিকেও সমৃদ্ধ। তবে সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির কারণ থেকেই যেহেতু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ, সেহেতু উপন্যাসগুলোর বেশিরভাগই সামাজ ও রাজনীতিভিত্তিক। কোথাও তিনি বেশি রাজনীতিকে প্রধান্য দিয়েছেন আবার কোথায় প্রাধান্য দিয়েছেন সামাজিকতাকে। সামজ ও রাজনীতির বাইরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো কিছু উপন্যাস আছে যেখানে রয়েছে শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীর স্বীকারোক্তি। ব্যক্তি মনের গভীরে অবতরণ করে এই উপন্যাসগুলোতে তিনি শুধুমাত্র আত্ম-সমীক্ষাকে মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই জাতীয় উপন্যাসে একই সঙ্গে মানুষের নৈতিক দিকটাকে তুলে ধরা হয়। বিশ্ব সাহিত্যে এমন উপন্যাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যের অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেগুলোর বাইরে নন। তিনি বিশ্ব সাহিত্যের রস আস্বাদন করেছেন নির্মোহভাবে। সেখানকার উপাদান, আঙ্গিক তিনি নিজের লেখাতেও ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন- দস্তয়েভস্কির *ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট* এই ধারার উপন্যাসের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া বাংলা উপন্যাসে সমরেশ বসুর *মানুষ* (১৯৭০)-এ এমন আত্ম-সমীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব পদ্ধতির অনুসরণ লক্ষ করা যায়। মনস্তত্ত্বকে অনুসরণ করে লিখিত এই উপন্যাসগুলো নিছক কাহিনী নয়, স্বীকারোক্তির ভেতর দিয়ে পাপবোধ অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্তের উপস্থাপন। বুদ্ধদেব বসুর [পাতাল থেকে আলাপ, গোপাল কেন কালো] সমরেশ বসুর [বিবর পাতক, প্রজাপতি] এই রীতি বা ধারার উপন্যাস। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষদিকের উপন্যাস, গল্পে এই ধারা অধিক পরিলক্ষিত হয়- সমালোচকরাও এমন মন্তব্য করেছেন–

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষদিকের উপন্যাস আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের রীতিতে লেখা– চরিত্রের আত্মানুসন্ধানই মুখ্য।[৩০]

১৯৬৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত *নির্জন শিখর* উপন্যাসটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উৎসর্গ করেছেন তারই সমসাময়িক আর এক কথাশিল্পী বনফুলকে। নির্জন শিখর উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক আদর্শও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আগস্টের ছাত্র আন্দোলন, যুগান্তর পার্টি প্রসঙ্গে, ১৯৩০ এর লবন আন্দোলন ও অসহযোগিতা আন্দোলন। ঘটনাবলীর বাইরে সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছায়াও উপন্যাসে এসেছে কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে এসেছে সেই সময়ের বিখ্যাত অধ্যাপক রামন্দ্রেসুন্দর ত্রিবেদীর প্রসঙ্গে।

নির্জন শিখর উপন্যাসের কাহিনী দর্শনের অধ্যাপক পণ্ডিত দেবনাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে। যিনি তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসে নিজের স্মৃতিচারণ করেছেন। উপন্যাসের শুরুটা এমন-

> কাল থেকে আমার ছুটি। কাল থেকে আর দেবনাথ ভট্টাচার্যেও নাম কলেজের রুটিনে থাকবে না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ১৫৩]

কাল থেকে তাঁর অবসর জীবনের শুরু। অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক দেবনাথ তাঁর জীবনের পদপ্রান্তে এসে অতীত থেকে আবার জীবনখাতার হিসেব-নিকেশের শেষে নিঃসঙ্গ। তাঁর একটা আশ্রয় দরকার–কিন্তু কোথায় তিনি আশ্রয় নেবেন? এই জিজ্ঞাসা ও তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েই সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী।

> ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখনীতে একজন অধ্যাপকের জীবনের ইতিবৃত্ত কলেজের আবহাওয়া ও আনুষঙ্গিক পরিবেশ মূর্ত হয়ে রচনাটিতে অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষ রঙ করতে পেরেছে।[৩১]

কর্মজীবনের শেষ দিন বসে অধ্যাপক, পণ্ডিত দেবনাথ ভট্টাচার্য হিসেব নিকেশ করেছেন। ঔপন্যাসিক দেবনাথের মানসিক অবস্থার চিত্রায়ন করেছেন এভাবে–

> কেউ থাকে নি, আমিও থাকব না–এমন কি এই যে থাকা- না- থাকার কথা আজ বসে বসে ভাবছি, এও তো আমার মধ্যে বহুদিন ধরে নিশ্চিত হয়ে ছিল। আর ব্যার্গসঁর কথাই যদি মানি–তাহলে এই চলে আসা, এই নিঃস্মৃতি হয়ে যাওয়া–এও তো আমার মুক্তি, আর এক চক্রবালের দিকে আর এক সীমান্ত পার হয়ে। আমার কোনো স্থির-স্থবিরতার বিন্দু নেই, আরো অনেক বিকাশ আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে–পঁয়ষট্টি বছরই তার

> ওপর শেষ অঙ্কেও শেষ পর্দাটা টেনে দেয় নি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : এক, পৃ ১৫৪]

কাল থেকে দেবনাথ ভট্টাচার্যের ছুটি, কলেজের রুটিনে আর তার নাম থাকবে না। আটত্রিশ বছর ধরে যে পরিচিত গণ্ডিতে তার চলাফেরা সেসব একসময় ইতিহাস হয়ে যাবে। এই বিশ্রাম কালে মুহূর্তের মধ্যে দেবনাথের মনে পড়ে ছোটবেলার, অতীতের অনেক কথা। শৈশব, নিজের কষ্ট করে বেড়ে ওঠা, কলেজ সবই আজ ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে। যদিও এগুলো আজ স্মৃতি কিন্তু একসময় এগুলো ছিল জ্বলজ্বলে, কখনও নির্মম, রূঢ় বাস্তব।

জীবনের নানা অসুবিধার মধ্যে দেবনাথ ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। বাবা গোমস্তাগিরির কাজ করতেন। ছোট বোনটা পানিতে ডুবে মারা যাবার পরে মা সারাক্ষণ কাঁদত। ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে যেমন ছিলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তেমনি ছিল দেবনাথের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। স্কুলের হেডমাস্টারের সহযোগিতায় দেবনাথ নতুন করে পড়াশুনা করতে থাকেন। হেডমাস্টর সম্পর্কে দেবনাথ বলেছেন–

> হেড্মাস্টার মশাই ছিলেন ব্যাচেলর, সেকালেই সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা শিক্ষাকেই জীবনের শেষ ব্রত করে নিয়েছিলেন, তার বাইরে যাঁরা কিছু ভাবতে পারতেন না, ভাবনে চাইতেনও না। আমাকে নিয়ে আরম্ভ করলেন আর এক সাধনা। নিজের বই দিলেন, স্কুলের লাইব্রেরী খুলে দিলেন, বসে গেলেন তপস্যায়। বললেন, 'তুই পাস না করলে আমারই কথা থাকবে না–সে আমি হতে দেব না। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : দুই, পৃ ১৫৭]

হেডমাস্টারের সহযোগিতায় ইতিহাস, বাংলা আর সংস্কৃতে লেটার নিয়ে মেট্রিক পাশ করেন দেবনাথ। এরপরে কলেজ জীবন, কিন্তু বাবা কোনোভাবেই পাঠাতে রাজি হননি। একমাত্র হেডমাস্টারের সাহসেই, সাহায্যেই বহরমপুরে দেবনাথ কলেজে ভর্তি হন। আই.এ পাশ করেন স্কলারশীপ নিয়ে। কিন্তু এর পরে বাঁধ সাধলেন বাবা, বিয়ে করতে হবে তাঁকে, না হলে তিনি কলেজে পড়াবেন না। জোর করে মাধুরীর সঙ্গে বিয়ে দেন দেবনাথকে। বাবার মুখে না বলতে পারলেও দেবনাথ এই বিয়ে মানতে পারেননি। বাসর রাতেই তিনি জানতে পারেন, তাঁকে ঘর জামাই থাকতে হবে। ছেলেকে ঘর জামাই রাখার সত্বেই বাবা তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন, এমনটা মানতে পারেনি দেবনাথ। দেবনাথের মনের অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়–

> নিজের গলাটা দু-হাতে আমার টিপে ধরতে ইচ্ছে করল। তা হলে শুধু এই বিয়েটাই নয়–তার সঙ্গে আমি চিরকালের মতো দাসখত লিখে দিয়েছি। আমার পৌরুষ, আমার পরিচয়, আমার মর্যাদা–বাবার একটা কুৎসিত লোভের কালো আবর্তের ভেতরে হারিয়ে গেছি। জানালার বাইরে একমুঠো গুমোট অন্ধকারের ভেতরে সাপে-ধরা ব্যাঙের গোঙানি উঠছিল, আমার নিজের ভেতর থেকে–এই রাতে সেই গোঙানির আওয়াজ আমি শুনতে পেলুম। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : চার, পৃ ১৭৪]

উপায়ান্ত না দেখে সেই রাতেই দেবনাথ শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পরে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে দেখে দেবনাথ বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেন যে, তিনিও শিক্ষক হবেন–

> কোন্ অ্যাম্বিশন নিয়ে আমি কলেজে পড়তে এসছিলুম, নিজেও তা কখনো ভেবে দেখি নি। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের সামনে আসবার পর আমার লক্ষ্য ঠিক হয়ে গেল। আমি হেডমাস্টার মশাইকে দেখেছি, বহরমপুরে প্রতাপবাবুকে দেখেছি এইবার দেখলুম রামেন্দ্রসুন্দও ত্রিবেদীকে। দেখলুম–শিক্ষকতা মানুষকে কত মহৎ করে, সব তুচ্ছতাকে পার হয়ে কোন্ আশ্চর্য সমুন্নতিতে তাকে পৌঁছে দেয়। এই কলেজে ভর্তি হয়েই জানলুম, দেবনাথ ভট্টাচার্যকে অধ্যাপক হতে হবে, এর চাইকে বড়ো গৌরব আর কিছুই নেই। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : পাঁচ, পৃ ১৭৯]

দেবনাথের রাজনীতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে কলেজে, সিদ্ধার্থের মাধ্যমে। সিদ্ধার্থ যদিও তার সহপাঠী নয়, কলেজের বন্ধুও নয়। আই.এ পড়ার কালে রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়িতে থাকার সময় সিদ্ধার্থের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যদিও দেবনাথের চরিত্রের সঙ্গে সিদ্ধার্থের চরিত্রের কোনো মিল নেই। সিদ্ধার্থর ভেতরে 'একটা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল' আর দেবনাথ নিজের মধ্যে চুপ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে তার রাজনৈতিক যোগাযোগ না থাকলেও দেবনাথ সিদ্ধার্থের মধ্যে দিয়ে নিজের পরিচয় চিনতে পেরেছিলেন। দেবনাথ বলেছেন–

> মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝি এমনি করেই তার চোখেমুখে আঁকা হয়ে যায়। কিন্তু না–অহঙ্কার করব না, আমি ফিলসফার হতে পারি নি, জীবনের কোনো পরম রহস্যকে আবিষ্কার করতে পারি নি, মানুষ আর পৃথিবী, মানুষ আর ঈশ্বর, ঈশ্বর আর পৃথিবী–এদের মধ্যে গুহা-নিহিত কোনো রহস্যই আমার কাছে ধরা পড়ে নি। সারাটা জীবন শুধু দর্শনের ছাত্র হিসেবেই কাটিয়েছি আর সেই যে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন–'বিশ্বদর্শনের প্রথম পাতাটা কোন অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আর শেষ পাতাটা তার লেখাই হয়নি'– এই কথাটি বার বার স্মরণ করতে চেয়েছি। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : তিন, পৃ ১৬৬]

সিদ্ধার্থ এবং তার বন্ধুরা ছিল যুগান্তর পার্টির আদর্শে দীক্ষিত। সিদ্ধার্থ একবার পুলিশ ধরতে এলে তাকে না পেয়ে দেবনাথকে থানায় যেতে হয়। পরে অবশ্য পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। দেবনাথের মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং একটা নির্ধারিত গণ্ডি তাকে আজীবন বাইরে বের করে আনতে পারেনি। তিনি নিজেকে জেনে গিয়েছিলেন, সিদ্ধার্থের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে এই সত্য আরও প্রাঞ্জল হয়–

> 'তুই বিপ্লববাদে বিশ্বাস করিস্ নে?
>
> 'না।'
>
> 'তবে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে কী করে? গান গেয়ে?'
>
> সেই পুরানো সিদ্ধার্থ! সেই সাত বছর আগেকার।
>
> বললুম, 'গান গেয়ে কি তবলা বাজিয়ে জানি না, কিন্তু ক'টা বোমা ফাটিয়েও যে সেটা সম্ভব হবে– এমন আমার মনে হয় না।'
>
> 'তবে তুই কি চাস নে যে দেশ স্বাধীন হোক?
>
> বললুম, সিদ্ধার্থ, কী হবে কথা বাড়িয়ে? আমি ও নিয়ে কিছুই ভাবতে পারি না। দেশ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে, কিন্তু কিভাবে হবে– সে ভাবনা নেবার শক্তি আমার নেই। একদিন কেউ না কেউ হয়তো আমাকে পথ দেখাবে– সেদিনও আমি তৈরি হয়ে যাব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মত, কোনো আলোচনাই আমার মনে সাড়া জাগাতে পারল না [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : ছয়, পৃ ১৮৮]

দেবনাথ সিদ্ধার্থকে দেখে নিজের শ্রেণি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি কোন টাইপের, কতদূর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব আর কতদূর সম্ভব নয়-এও বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের মনের অবস্থা স্বগোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন–

> আসলে এই হল আমার চরিত্র। আজ পয়ঁষট্টি বছর রয়েসেও দেখছি–সেই একই জায়গায় আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। বারে বারে মনকে জাগাতে চেয়েছি, বারে বারে আকঁড়ে ধরতে চেয়েছি একটা যে-কোনো প্রবল সত্যকে, আর তার ওপর নিজের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছি। কিন্তু কখনো পারি নি। তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছি ডিটারমিনিজমে–আর অপেক্ষা করেছি আমার আরো পূর্ণ বিবর্তিত ব্যক্তিত্বের–যে কোথাও দাঁড়ি টেনে দেবে না, এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে, এক দিগ্বলয় থেকে আর এক দিগ্বলয়ে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : ছয়, পৃ ১৮৯]

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বরাবরই বিপ্লবী কাজে যোগ দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের তাৎক্ষণিক ভাবোত্তেজনা, রোমান্টিক আদর্শবাদ কাজ করেছিল। যেখানে যুক্তির চেয়ে আবেগের পরিমাণ ছিলো বেশি। বিপ্লবী উত্তেজনায় ত্রিশ, চল্লিশের দশকে হাজার হাজার তরুণ স্কুল-

কলেজ ছেড়ে মাঠে নেমেছে। জেলাখানাকে বিদ্যাপিঠ ভেবেছে। সেই সময়ের চিত্রই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্জন শিখর উপন্যাসে ধারণ করতে চেয়েছেন। যারা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যায়নি, তাদেরও সেই সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে-কেন সে ঐ আদর্শকে গ্রহণ করতে পারছে না। যৌক্তিকভাবে নিজের চিন্তাকে অনুভাবন করতে হয়েছে, শ্রেণি প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছে–

> পরবর্তীকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার মধ্যে কি সেই একই ধরণের আদর্শবাদ কাজ করেছিল? অবশ্য যেখানে বুদ্ধি-বিচার কাজ করে, মার্কর্সবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পথের সন্ধান মেলে, সেখানেও স্ববিরোধীতা আছে, মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটান অনেক সময়েই ভাববাদী দর্শনের মধ্যে নৈতিক সমর্থন খোঁজে। [৩৩]

দেবনাথের সিদ্ধার্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মত ও পথের মিল নেই বলে তিনি দূরে সরে গেছেন। জীবনের একটা পর্যায়ে দেবনাথ বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেনি। তিরিশ সালের সত্যাগ্রহের ডাকও অগ্রাহ্য তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, তার পরে মাকর্সবাদকেও গ্রহণ করতে পারেননি।

> তাই ছেলে বারীন যখন বলে, 'বাবা তোমার মার্কস পড়া উচিত' তখন দেবনাথের মনে হয়, মার্কস? ফয়েরবাখ-হেগেল পর্যন্ত আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মাকর্স? দর্শন কি শুধু অর্থনীতির সূত্রেই বাঁধা? তার বিস্তার নেই–প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে কোথাও জ্যোর্তিময় যুক্তি নেই তার। তাহলে তো মিল– হিউমকে আমি দার্শনিক বলে স্বীকার করতুল ।[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ২১২]

দার্শনিক, পণ্ডিত দেবনাথের আপত্তি অবশ্য মার্কসবাদে নয়। এটা বোঝা যায়– 'ছেলে বারীন যখন রাজনীতি ছেড়ে দেয়, নিজেকে আরো প্রতিষ্ঠা করার জন্য উচ্চ বেতনের চাকুরি গ্রহণ করে, তখন তিনি আহত হন'। পুত্রের মুখে 'ম্যানেজ' শব্দটা শুনেই দেবনাথের হৃদয় ভেঙে যায়। তিনি নিজেদের কাপুরুষের ছায়া বারীনের মধ্যে আবিষ্কার করেন। হিম রক্তে দেবনাথ উপলব্ধি করেছেন–

> আমি ওদের রাজনীতি মানিনা। আমি বারীনের মতো মার্ক্সিজ্মকেই মানুষের শেষ আদর্শ বলে বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যেই কি আমি দেখিনি– কাকে বলে ত্যাগ–কার নাম দুঃখবরণ? কেমন করে ভুলব তার কথা–পুলিসের রাইফেলের সামনে যে বুক তুলে ধরে কলকাতার পথে রক্তের স্বাক্ষর রেখে গেল? কেমন করে তাকে ভুলব–ফিল্ডওয়ার্ক করে করে যে আজ যক্ষ্মায় ভুগছে– হয়তো বাঁচবে, হয়তো বাঁচবে না? কেমন করে তাদের আমি অস্বীকার করব–যারা ক্যারিয়ারের সব স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলে তিল-তিল আয়ু দিয়ে গড়ে তুলছে আন্দোলন–ঘুরছে গ্রামের কাদাভরা দুর্গম পথে পথে, কারখানা আর বস্তীর আটকানো আবহাওয়ায়–যাদের চোখে আর এক ভবিষ্যৎ নতুন অরুণোদয়ের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে?

> – তাদের বিট্রে করল বারীন? শান্তি অন্দোলন করতে গিয়ে নিজের যে রক্ত ঝরিয়েছিল একদিন, তারও দাম সে দিতে পারল না? দুর্বল দেবনাথ ভট্টাচার্যও কোনোদিন এতখানি ভাবতে পারত না। এখানেও সে আমাকে ছাড়িয়ে গেল। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : এগার, পৃ ২৩২]

দেবনাথ নিজে রাজনৈতিক কর্মী না হলেও রাজনৈতিক লোকদের উপরে তার আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে, তাদরে ত্যাগকে তিনি অস্বীকার করেন না। তার নিজের মুখেই শোনা যায়–

> পলিটিক্যাল লোকদের-সেটা বিপ্লবী কিম্বা মার্কসবাদী, কারও মতোই তিনি বলতে পারেনা–'ওগুলো সব পোলিটিক্যাল অ্যাডভেঞ্চারিজম তিরিশের সত্যাগ্রহ বা বিয়াল্লিশের রক্তঝরা পথে যদিও তিনি তার সহকর্মীদের সঙ্গে মাঠে নামতে পারেনি। কিন্তু এদের সমালোচনা নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারেন না।[*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ২১১]

মধ্যবিত্তের এই আত্মসংকট দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়ণ করেছেন ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *নির্জন শিখর* উপন্যাসে। ব্যক্তি জীবনে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বে মাধুরিকে বিয়ে করলেও, তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলেন কিন্তু অস্বীকার করেননি। দর্শনের ছাত্রী বিদ্যুতের সঙ্গে মাঝে দের বছর তার মনের বোঝা পড়া তৈরি হয়। কিন্তু এক যুগ পর মাধুরী আবার ফিরে এলে তিনি তাকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাকে নিয়ে ঘর করেছেন। নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন যদিও জীবনের শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ তার অন্তরে জায়গা দখল করেছিল। দেবনাথের এই মধ্যবিত্তসুলভ মানিয়ে নেবার প্রবণতার মধ্যে যেন আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের জীবনদর্শনের ভিত্তি পাই। কারণ তিনি সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও কখনো পার্টিতে যোগ দেননি। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন এমন কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না।্ওপন্যাসিক দেবনাথের মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> আমি রাজনীতির কাছাকাছি অনেকবার এসেছি।..(কিন্তু) আমি রাজনীতি করতে পারিনি, আমার চরিত্রের মধ্যে তা ছিল না। ভীরুতা? হতে পারে'....আমার যেখানে শান্ত- মৌন, তার [অর্থনীতির ছাত্র বারীনের] সেখানে উদ্ধত কোলাহল– কলকারখানার আওয়াজ–মিছিলের শ্লোগান। দর্শনের জন্য নির্জন শিখর, পলিটিক্যাল ইকনমির জন্য মন্দ্রিত সমুদ্র। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ২১৮]

দেবনাথের অবস্থান নির্জন শিখরে। সেজন্য সেটা তীব্র যন্ত্রণার। যে যন্ত্রণা কারও কাছে বলা যায় না। একমাত্র দার্শনিকদের মধ্যেই মুখ বুজে থাকলে তা থেকে পরিত্রাণ মেলে।

'মাধুরীর সঙ্গে ত্রিশ বছর একসঙ্গে থেকেও সে চিরকাল দূরেই রয়ে গেল'– নিজের স্ত্রীকে নিয়ে দেবনাথ এটাও অনুভব করেছেন। পুত্র বারীন আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিন্তু 'দর্শন কি তার ধ্যান ধারণা পাল্টাতে পেরেছে?' দেবনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন, 'তিনি কাউকেই সুখী করতে পারেন নি– বাবাকে নয়, স্ত্রীকে নয়, নিজের সন্তানকে নয়। এমনকি নিজেকেও নয়।' নিজেই বলেছেন আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে–

> আমরা সেই ফরাসী লেখক গুস্তাভ ফ্লোব্যারের মতো–যখন সমস্ত দেশটা যুদ্ধের আগুন আর পরাজয়ের অপমানে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজের থিয়োরীর জগতে– অনাবশ্যক ভাবনার গজদন্ত-মিনারে স্থির-স্থবির হয়ে বসে থাকি। ভূষণ্ডী কাকই পৃথিবীর সর্বকালের সেরা দার্শনিক। [*নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পরিচ্ছেদ : নয়, পৃ ২২০]

কিন্তু দেবনাথ ফ্লোবের গোত্রের লেখক নন। তিনি তো শুরু করেছিলেন মিখেইল শোলোকভকে সামনে রেখে ব্যক্তি সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবজাতিকে স্পর্শ করতে। আর তাই সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে পেছনে রেখে অন্তর্মুখী আত্মবিশ্লেষণের, আত্মরতির অবলম্বন সহজ ছিল না তার পক্ষে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান প্রাধান রাজনৈতিক উপন্যাস আলোচনায় দেখা গেল ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি মূলত রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে বা আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম, স্বদেশের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম ও অধিকারবোধ, গ্রাম-বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া কখনো কখনো সময়ের প্ররিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতও তাঁর উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। সামাগ্রিকভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সময়কে ধরবার ব্যাপারে অনেকখানি সার্থক। উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে প্রধাণত গ্রাম-বাংলা। এছাড়া কলকাতা মহানগর, ডুয়ার্সের চা বাগান ইত্যাদিও পটভূমি হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনের কয়েকটি আদর্শে বিশ্বাসী। তার মধ্যে প্রধান হলো মানবসমাজের সাম্য ও শোষণের অবসান। এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি সাম্যবাদী আদশের দিকে কিছুটা ঝুঁকেছিলেন। সেই সঙ্গে ইতিহাসের প্রতি, অতীতের প্রতি ছিল তাঁর মোহময় মনন-অভিসার। ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পরেছেন মূলত তাঁর কল্পনা ও অধ্যায়নের সংমিশ্রণে। নিসর্গ মুগ্ধতা আর প্রেম উপলব্ধির মূল্যবোধের গভীর প্রত্যয় তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাতন্ত্র্যতা কখনো ম্লান হবার নয়। *উপনিবেশ*, *তিমির-তীর্থ*, *মন্দ্র-মুখর*, *সূর্য-*

সারথি, *মহানন্দা*, *শিলালিপি* কিংবা *নির্জন শিখর*-এর মতো উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকতার সমন্বয়, নিজস্ব স্বাক্ষর বহন করে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১২

২. প্রাগুক্ত, পৃ ১১২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩

৪. ভূমিকা, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ ২১২ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটিড। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৮৮

৫. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১২১

৬. ভূমিকা, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ ২১৩ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটিড। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৮৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৩

৯. ভূমিক, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০. *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৩৪৫

১১. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১২

১২. ভারত ছাড়ো আন্দোলন: দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ইংরেজ সরকারের আশু ভারত পরিত্যাগ ও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন।

১৩. প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন : ইংরেজ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় করার জন্য যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন হত, তেমনি নানা সংস্কৃতি আন্দোলন পরিচলিত হয়েছিল। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন মুলত ত্রিশের কবি-সাহিত্যিকদের পরিচালনায় গড়ে ওঠে।

১৪. শ্রীশেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেজ দা। বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তিনি।

১৫. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১৪

১৬. হিরন্ময় মুখোপাধ্যায় : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন।

১৭. *জাগরী*, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। একবিংশ মুদ্রণ- ১৪০৪ শ্রাবণ

১৮. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় [১৮৯৮-১৯৭১], নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক। তার উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- গণদেবতা (১৩৪৯ ব), পঞ্চগ্রাম (১৩৫০ ব), চৈতালী ঘূর্ণি ইত্যাদি।

১৯. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১৮

২০. *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, সরোজ দত্ত, পৃ ১৬ রত্নাবলী ১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

২১. *শিল্পীর স্বাধীনতা* - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দেশ- ২০শে পৌষ, ১৯৯৬, পৃ ৮৯৫

২২. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৭। পৃ ২৯০

২৩. *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, সরোজ দত্ত, পৃ ৫৪, রত্নাবলী ১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

২৪. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ৮৪

২৫. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা-২০০৩ পৃ ৫৯

২৬. মহানন্দা (আশা দেবীর অনুমান ১৯৫৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ড, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, দ্বিতয়ি মুদ্রণ, মাঘ-১৩৮৮, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ ১৬২

২৭. নির্জন শিখর, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দশম খণ্ড। পৃ ১৫৩

২৮. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১৩

২৯. *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* , অলোক রায়। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা। পৃ ১৯

৩০. *নির্জন শিখর*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দশম খণ্ড। ভূমিকা

৩১. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*। প্রভাস রায়চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৪, পুস্তক বিপণি। পৃ ১১৩

৩২. *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* , অলোক রায়। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা। পৃ ১৯

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০

উপসংহার

যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের নিজ সময়-দেশকাল-শ্রেণির সঙ্গে, নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া। তেমনি উপন্যাস পাঠও। একটা উপন্যাস রাজনৈতিক হয়ে ওঠবে কিনা, তা অনেকটা নির্ভর করে সেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রামের চরিত্রের ওপর। মোটামুটিভাবে এখনও আমাদের দেশের উপন্যাস পাঠ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যকর চালিকা শক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই। এটা গ্রাম ও শহর দুইখানেই। গত একশ বছরে নিরক্ষরতা যেটুকু কমেছে তাতে নিম্ন বর্গের অনেক মানুষই এই শ্রেণি কাঠামোর মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তাদের চৈতন্য-ভাবনায়-চিন্তায় শ্রেণি-বিচ্যুত হয়েই এসেছে। ফলে কোন উপন্যাস রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত হবে, তা এই শ্রেণির রাজনৈতিক ভাবনায়, বোঝাপড়ার ধরনে, ডায়ালগেও অনেকটা স্থির হয়েছে। আবার অন্যদিকে উপন্যাস যেহেতু একটি বিশেষ ব্যক্তির, নিজ সময় ও সত্তার সামঞ্জস্য–অসামঞ্জস্যর আততিকে সংহত করার শৈল্পিক সমাধান চেষ্টা, সেহেতু উপন্যাসে কাঠামো ও চুরান্তভাবে নির্মিত হয়েও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বর্তমানের সাহিত্য-ভাবনায় শিল্পের পুনৎপাদনের ধারণায়, ঐ কাঠামোই নতুন আবিষ্কার বা পুনরুজ্জীবন যুগে যুগে, বিভিন্ন পাঠকের নিজ সত্তা ও সময়ের আততির চাপে, বৃহত্তর প্রয়োজনে ঘটে।

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের শুরু থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বিচরণ শুরু করেন। চারের দশকের শুরুতেই তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল-এছাড়া অব্যবহিত পরেই (১৩৪২, ২৫ শ্রাবণ) 'দেশ' পত্রিকাতে 'নিশীথের মায়া' গল্পও প্রকাশিত হয়। এই সময় 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেও গল্প কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এই পর্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কোন প্রতিষ্ঠিত লেখক নন। তাঁর প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ পাঁচের দশকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে বেশ কিছু তরুণ কথাশিল্পী তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিভা ও মননশীলতার দীপ্তিতে তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তখন বাতাসে অস্ত্র ও বারুদের গন্ধ। পাশাপাশি ছিল নিরন্নের আর্তনাদ। মোটকথা, মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন জাতীয় জীবনে প্রবল বিপর্যয় ডেকে এনছিল। তার উপরে ছিল জাতি-দাঙ্গার করুণ ইতিহাস। এই সময়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাই সে সময়ের একটি আলেখ্য তাঁর রচনায় উন্মোচিত হয়েছে বলা যায়। তিনি ছিলেন যুগ সচেতন শিল্পী। তিনি ছিলেন সময়ের রূপকার।

একটু পিছিয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী চলছে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা। রাজনৈতিক পরিবর্তন ও পরিস্থিতি দ্রুত নতুন রূপ নিচ্ছে। মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে, অসম সমাজব্যবস্থার অসম ধননবণ্টনের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের ডাক ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসে এবার ফটল বেশ প্রকট এবং ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব মানুষের চেতনার মূলে নাড়া দিতে থাকায় এবং সেই সঙ্গে যন্ত্র সভ্যতা তথা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক বিস্তারে মানুষের পরম্পরাবাহিত নৈতিক মূল্যবোধ কমাতে শুরু করেছিল। ভারতবর্ষে এসব ব্যাপার তো ছিলই এবং আরো ছিল বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনা– অপরদিকে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে রক্তঝরা মুক্তিসংগ্রামও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে এই সব অর্থনৈতিক, সামজিক, রাজনৈতিক এবং আরো বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কট তীব্র রূপ নিতে থাকে। একদিকে ফুলে ফেঁপে চলছে দেশি-বিদেশি মুনাফাখোর মজুতদারের দল। কালোবাজারী আর ফটকাবাজির দল– পাশাপাশি দেশব্যাপী অন্নবস্ত্রের অভাব– অনটন এবং মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ আর্তনাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে দেশব্যাপী নবতর সমস্যা ও পরিস্থিতি দেখা দিল। দেশ শুধু স্বাধীন হয়েই থেমে থাকল না, সেই সঙ্গে দেশ বিভাগ জনিত বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলো এবং উদ্বাস্ত সমস্যা ও জাতিগত নানান সমস্যা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে দিল। দেখা দিল গণবিক্ষোভ, নানা ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। জনজীবনের এই সমস্থ ঘটনাবর্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল আমাদের দেশের সাহিত্য- শিল্প- সংস্কৃতি। এই সমস্থ ঘটনা ও পরিবেশ-পটভূমিকা লেখকের জীবনদর্শনকেও প্রভাবিত করল।

বঙ্কিমচন্দ্র- রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার যে-পন্থা ও কলাকৌশল আবিষ্কার করলেন, পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিকগণ সেই পথ বর্জন করে নতুন আঙ্গিক-রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা শুরু করেন। বিশেষ করে বিশের ও ত্রিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিতভাবে বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক – দুইই বদলে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ের উপন্যাসের বিষয়ও বদলে গেল– কঠিন-কঠোর বাস্তব সমাজের নানা সমস্যা ও সঙ্কট, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, নরনানীর যৌনসমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলন বিবিধ অভিঘাত সেখানে দেখা গেল। ঘটনা, পরিস্থিতি এবং চরিত্রের বিচার ও বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্পীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ল, চোখে পড়ল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। বলা যায়, এই সময় থেকেই উপন্যাস

সাহিত্যের নবদিগন্তের সূচনা হল। পূর্বোক্ত চারজন ছাড়া এই নবযুগে যে সমস্থ লেখক সক্রিয় ছিলেন তাঁরা হলেন– ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার এবং কিছুটা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল প্রমুখ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ যুগেরই এক তরুণ লেখক। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্ম্পকে একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক কারণে স্মরণ করা যেতে পারে– 'তিরিশের ঔপন্যাসিকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বাহন করার কর্তব্য-বোধ চারের ও পাঁচের দশকে একমাত্র নারায়ণ বাবুরই ছিল। সে উত্তরাধিকারের মূলকথা হল জীবনপ্রেম।

যদিও আমরা জানি তাঁর জীবনপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা। সেই রোমান্টিক স্বপ্ন অবশ্যই জীবনবিমুখ নয়। 'উপনিবেশ' উপন্যাসে লেখক সেই রোমান্টিক স্বপ্নময়তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সীমান্ত প্রদেশের আরণ্য–আদিম জীবনে ভৌগোলিক পটভূমিকায় লেখক পোর্তুগীজ জলদস্যুদের বংশোদ্ভূত উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশের মধ্য থেকে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে নিমগ্ন হয়েছেন– সেই পটভূমিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে গণবিক্ষোভের নেতা জমির। সমগ্র মানব জীবন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় আমরা পেয়েছি, বৃহত্তর ভারতবর্ষ এবং বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, নাগরিক জীবনের নানান কথা। আবার সে সব কিছুর পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য অনেক পরিমাণে যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে অগাস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সম্প্রীতিতে এবং মানুষের সামগ্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে। মানুষের দীর্ঘদিনের অধিকারকে মানুষের হাতে সম্পূর্ণ করবার, তাকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার, তার প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মনকে গড়ে তোলবার ও সচেতন করে তোলবার যে ব্যাপক প্রয়াস পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে অবশ্যই তার অন্যতম সূচনা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যকে দুটি পটভূমিতে রেখে বিচার করা যেতে পারে– এক, তাঁর অব্যবহিত এক দশক আগে থেকে যাঁরা লিখতে শুরু করেছেন– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা এই পর্যায়ে আছেন। দুই, যে সব লেখকেরা সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সময়ে লিখতে শুরু করেছেন- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, গোপাল হালদার, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদি।

বোধহয় যথেষ্ট দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় একেবারেই সমকালীন লেখক যাঁরা তাঁদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস বীক্ষার তেমন কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না। অবশ্য তাঁরা প্রতেকেই স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী বলে আপন প্রতিভার কারণে একে অপরের থেকে ভিন্ন।

এই পর্যায়ের লেখকরা মূলত লিখেছিলেন নগর কলকাতাকে নিয়ে। কলকাতার সমসাময়িক সমাজ, নাগরিক চেতনা, মানুষের টিকে থাকার জন্য লড়াই এবং নাগরিক সঙ্কট ও নাগরিক লীলাচঞ্চল দিক এসবই সমসাময়িক কালের লেখকদের রচনায় পাই। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানত প্রকৃতি বা নিসর্গ সংলগ্ন জীবনকে বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসে। প্রকৃতি মানুষকে আনন্দ দেয়–একথা আবার বললেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি যেন চিরকাল। তাই উত্তরবাংলার চা বাগান, ডুয়ার্স ও তার প্রকৃতি, সমগ্রভাবে বরেন্দ্রভূমির প্রকৃতি এবং মানবজীবন তাঁর লেখায় বারবার এসেছে। অবশ্য কলকাতার নগরজীবন সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন একথা বলা যায় না– অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাসে নাগরিক জীবন এসেছে প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে।

সমসাময়িক উত্তাল সময়ের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি বিশেষ কারণে ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভা। এর অন্যতম কারণ তার নিজের রাজনৈতিক সচেতনতা। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ এবং সারা বিশ্বের উত্তাল পরিস্থিতিতে তিনি কোন মানুষের জন্য লিখবেন এটা নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। সেই উত্তাল সময়ে অনেকেই সময়কে উপজীব্য করে উপন্যাস লিখলেও নারায়ণ ছিলেন তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। কারণ তার লেখায় ভারতীয় সমাজ বৃহত্তর পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। নারায়ণের রচনায় দেখা যায়, মধ্যযুগীয় সমাজতন্ত্র বদলে যাচ্ছে, সেখানে উপস্থিত হচ্ছে ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে অবশ্য তার সঙ্গে তারাশঙ্করের বিশেষ মিল পাওয়া যায়। কিন্তু নারায়ণের উপন্যাসে একটি বাড়তি কথা আছে– সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীকে পরাস্ত করে জেগে ওঠে শ্রমিকশ্রেণি, যাদের নেতৃত্ব দেয় কমিউনিজমের বিশ্বাসী এমন মানুষ। তাঁর উপন্যাসে এসেছে সমাজবাদের প্রসঙ্গ, জয়যুক্ত হয়েছে মানুষের সংগ্রাম এবং সেই সূত্রে এসেছে সমাজবাদ। সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল, যা অন্যত্র তেমন একটা পাওয়া যায় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কিন্তু তাঁর দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নয়।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রোমান্টিকতা বা কাব্যময়তার স্বাদ খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না। রীতিমতো বাস্তববাদী, কাল সচেতন ও সমাজ সচেতন লেখক হলেও নারায়ণের মধ্যে কল্পনার জাদু স্পর্শ আছে। সমসাময়িক কালের লেখকদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পার্থক্য উপন্যাসে ও গল্পে সংগ্রামী

চেতনার প্রকাশে। সমরেশ মজুমদার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে বারংবার সংগ্রামী মানুষের প্রতি অনুরক্তি দেখিয়েছেন, শত সহস্র যন্ত্রণায় দগ্ধ মানুষ একদিন ঐক্যবদ্ধ হবে তাদের সমস্ত দৈন্যের অবসান সেদিন হবে বলে লেখক বিশ্বাস করেছেন। সংগ্রামী মানুষের জীবনের চিত্রণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যতখানি নিবিষ্ট ছিলেন, সমকালে একটা আর কেউ খুব বেশি তৎপর ছিলেন না। *উপনিবেশ*, *তিমির-তীর্থ*, *স্বর্ণসীতা*, *সূর্য-সারথি*, *বৈতালিক*, *শিলালিপি*, *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী* প্রভৃতি উপন্যাসে সংগ্রামী মানুষের জীবনচেতনাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ইচ্ছে ও তাদের সংগ্রামী মনোভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় মূল ব্যাপার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বদেশ প্রেম ও সাম্যচেতনা তাঁর মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন পুরো মাত্রায় কমিউনিস্ট বা বামপন্থী লেখক নন। তাঁর লেখায়– কোনো ইজমই শেষ কথা নয়, চিরন্তন মানবজীবনই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সংকল্প, বাসনা ও কর্মোদ্যোম নবতর কোন পৃথিবীর আশ্বাস বহন করে এনেছে। সেইসব পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে লেখক নিজেও যেন বিশ্বাস করেন শোষকের অত্যাচার দুর্বিনীতের উদ্ধতমুঠি একদিন মাটিকে লুটিয়ে পড়বে এবং নতুন সূর্যের আলোর স্পর্শে সব ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যাবে। *উপনিবেশ*, *তিমির তীর্থ*, *স্বর্ণসীতা*, *সূর্য-সারথি* ইত্যাদি উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে জীবনের জয়গান। আর রাজনীতিকে উর্দ্ধে রেখে তাই নারায়ণের উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে মানুষের মুক্তি।

লেখক সচেতন রাজনীতির ধারক বলেই গান্ধীবাদী রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ দেখে একদা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই রাজনীতিকে তিনি সীমিত এবং ক্ষুদ্র গণ্ডি আবদ্ধ সমালোচনা করে আবার বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী স্বার্থের কথা বিবেচনা করে গান্ধীবাদী রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যদিও সেখানে তার স্থিরতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তবে তিনি বরাবরই সময়কে ধারণ করতে চেয়েছেন। মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছেন। তার গল্প, উপন্যাসগুলোর সেসব চিন্তারই প্রতিধ্বনি। তবে এককথায় বলা যায়, আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেটাতে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছি তা হলো শ্রেণি প্রশ্ন। তিনি বারবারই শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতিকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। যদিও সেটা সচেতন এবং পরীক্ষিত কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন বা অসমর্থম কোনো সূত্রেই আবদ্ধ করা যায় না। এই মুক্তি যে সাম্যবাদী রাজনীতিতেই সম্ভব সেটার একটা সুপ্ত আশা তার মধ্যে ছিল। তবে তার স্থিরতা মানুষ, সমাজ, ইতিহাস এখানেই মূল হয়ে উপস্থাপিত। আর সেখানেই তিনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭৩। প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৮৬। ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৭। তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৭।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ্য ১৩৯৪। দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থ/প্রবন্ধ

সেরা রম্যরচনা : আবদুশ শাকুর (সম্পাদনা), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৪৭, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১২, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০১১

বাংলা গল্প বিচিত্রা : প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা–৭৩। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৪

সাহিত্য ও সাহিত্যিক : বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১০

অগ্রন্থিত রচনা : কথাসত্য, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), প্রকাশ ভবন। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। ষোড়শ মুদ্রণ : কার্ত্তিক, ১৪১৯

সুনন্দর জার্নাল [অখণ্ড সংস্করণ] : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৩

সহায়ক গ্রন্থাবলি

সরোজ দত্ত, *কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, রত্নাবলী, ১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী* । ভারবি ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯১

সৈয়দ আকরম হোসেন, সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত) *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন* : । জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৮। পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৪

অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৭। অষ্টম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৭

এ.আর দেশাই, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*। কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি। কলিকাতা, প্রথম অনুবাদ সংস্করণ-১৯৮৭

সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০- ১৯৯০)*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৭৫।

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*। বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা-১৯৭০

শিপ্রা সরকার, *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*। অনমিত্র দাশ সংকলিত, আনন্দ পাবলিশার্স। বসুন্ধরা প্রকাশনী কলিকাতা, ১৩৬৭

দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৪। প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ : কলকাতা পুস্তকমেলা। জানুয়ারি ২০০৬ মাঘ ১৪১২।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*। অনুষ্টুপ। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ বৈশাখ ১৩৮১। তৃতীয় সংস্করণ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, মাঘ ১৪০৫

নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮০। তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*। প্রতিভাস, কলিকাতা। প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ : আগস্ট ২০০৬। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯

সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৭, আশ্বিন ১৪০৪।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১)। ১ম খণ্ড : রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড : অর্থনৈতিক ইতিহাস, ৩য় খণ্ড : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০০/ ডিসেম্বর ১৯৯৩। তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪১৩/ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*। গবেষণা, সংকলন, ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী। প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০০, জুন ১৯৯৩।

ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, *মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা-২০০৩।

রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ জুন ১৯৯৭। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৫/ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-২০০০

স্মৃতিমূলক/পত্রিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃত, কলিকাতা-১৯৭০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত। *কালি ও কলম*, কলিকাতা-১৩৭৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, *কালি ও কলম*, কলিকাত-১৩৭৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *কালি ও কলম*। কলিকাতা-১৩৭৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *কালি ও কলম*, কলিকাতা-১৩৭৭।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। *কালি ও কলম*, কলিকাতা-১৩৭৭

সমীক্ষামূলক পত্রিকা

সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা-১৯৭০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা-১৩৯৮

বাংলা সাহিত্য ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা-১৩৭৭

উপনিবেশ থেকে সন্দেহের অবকাশে, দক্ষিণারঞ্জন বসু। *কালি ও কলম*, কলিকাতা-১৩৭৭

সহায়ক ইংরেজিগ্রন্থ

The Art of Fiction, David Lodge, Penguin-1992

The Art of the Novel, Milan Kundera, Rupa & Co, Calcutta-1992